# ক বি তা স ম গ্র
২

# কবিতাসমগ্র

## ২

বিষ্ণু দে

পরিবেষক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

## সম্পাদকীয় নিবেদন

'কবিতাসমগ্র' দু খণ্ডে প্রকাশ করার আদি প্রকল্প আমাদের বাতিল করতে হয়েছে, বিষ্ণু দে-র রচনার বিস্তার সেই বিন্যাসে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্বিতীয় খণ্ডে প্রত্যাশিত সূচি ছাড়াও থাকছে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিষ্ণু দে-র স্বকথিত জীবনী 'ছড়ানো এই জীবন'। যদিও তা তাঁর জীবনের একটি খণ্ডাংশ মাত্রকেই উপস্থিত করে, কবির ব্যক্তিত্বের উন্মেষকালের ছবি হিসেবে তার মূল্য কম নয়।

এ খণ্ডেও আমরা প্রচলিত সংস্করণগুলির কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদেব জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সংশোধন করেছি। বিষ্ণু দে-র কিছু কবিতা একটি সমগ্র কবিতা না একাধিক কবিতার গ্রন্থনা—এই নিয়ে কিছু সমস্যা আছে। ছন্দ ও কথনভঙ্গির পার্থক্য দেখে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলিকে আলাদা আলাদা কবিতা হিসেবে ধরেছি, এবং সেই অনুযায়ী প্রথম ছত্রের সূচি প্রস্তুত করেছি। আমাদের সিদ্ধান্ত কোথাও কোথাও ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হলেও, যদি তা পাঠকদের উদ্দিষ্ট অংশ খুঁজতে একটু বেশি সহায়তা করে, আমরা খুশি হব।

শ্রীশোভন বসুর সযত্ন পর্যবেক্ষণ এ খণ্ডটি নিখুঁত করে তোলার জন্য বিশেষ ভাবে সক্রিয় ছিল, যেমন ছিল প্রথম খণ্ডের জন্য। তাঁর কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

**নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার**

## গ্র ন্থ সূ চি

# কবিতাসমগ্র
২
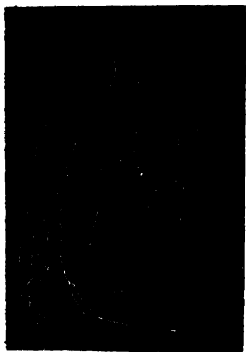
# নাম রেখেছি কোমলগান্ধার

সূচিপত্র

## ২২শে শ্রাবণ

আনন্দে নিঃশ্বাস টানি, হৃৎস্পন্দে আশার আশ্বাস
শুনে আসা দীর্ঘকাল অভ্যাস, তবুও
হঠাৎ হাওয়ায় আসে উপবাসী মানুষের রোদনের দুযো,
কেটে যায় বীটোফেনি সিম্‌ফনির গন্ধর্ব বাতাস।

মৃত্যুকে দূরেই রাখি, জীবনের পঞ্চাগ্নি-আলোয
চোখে রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবি-কে,
অলখ সংগীতে মন সুকুমার, দাঙ্গার কালোয
হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে।

নিসর্গ বেসেছি ভালো নীল ঢেউ-এ পাহাড়ে তুষারে
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেলো আমার শহর,
নিদ্রাহীন তাই আজ আমার সে স্বপ্নের প্রহর
মুষ্টি হানে কীটদষ্ট কূটরাষ্ট্র বাণিজ্যভূষারে।

আমার আনন্দে আজ আকাল ও বন্যা প্রতিরোধ,
আমার প্রেমের গানে দিকে দিকে দুস্থের মিছিল,
আমার মুক্তির স্বাদ জানে না কো গৃধ্নুরা নির্বোধ—
তাদেরই অন্তিমে বাঁধি জীবনের উচ্চকিত মিল।

নেকড়ের হন্যেয় দেশ ছিন্নভিন্ন, সন্দেহ ও ভয়
কলুষ ছড়ায় দুই হাতে, গায় শৃগালে বাহবা।
তবুও আকাশ ছায় আমাদের মুক্তি উচ্চৈঃশ্রবা,
মানুষ দুর্জয়॥

## আশ্বিনে

(নীরু ও শানু মজুমদারকে)

আশ্বিন বুঝি! আশ্বিনে কাঁপে ঘর
আকাশে মুখর চাঁদের স্বচ্ছ স্বর
হালকা আকাশে আশ্বিন থরথর।

ভেঙে যায় ঘুম। ক্লান্ত কালের ঘুমে
সদা অতীত মৃত, নেই ভয় ডব।
বাল্যের স্মৃতি যৌবন মবসুমে
বাড়িতে বাড়িতে ছাতে ছাতে থবথব।
জেগেছে আমাব এই তো সেই শহব।

স্বপ্নেব দিন রাতের জীবনে মেশে
সেকালে একালে অবাক বাংলাদেশে
আশ্বিন আসে সচ্ছল নির্ভবে
শহবে শহরে লক্ষ গ্রামেব ঘবে
আকাশে হাওযায আলোয উন্মুখর
হালকা মেঘেব শত কিন্নর হেসে
শ্বেত উত্তবী ওডায কিশোব বেশে
হাসে পার্বতী, দেখে পবমেশ্বর।

সোনাব কাঠিতে এই তো সেই শহর
পূজাব ছুটির পাহাড়ে পাহাড়ে ছোটে,
খেতেব সোনাব লালমাটি ফুলে ফোটে
আকাশেব নীলে, মেঘের আঁজিতে লোটে
চোখেব আবাম প্রাণের আবাম তাব
স্বচ্ছ আকাশে, দু বাহুব বিস্তাব
কাঁকবেব দেশে বালিনদী শালবনে
নিটোল পাহাড়ে আকাশ প্রতীক বোনে
উত্তবাই আব খাড়াইতে দুস্তব।

আশ্বিন আসে চোখেব মুক্তি নীলে,
হৃদয় ছড়ায় ঢলেব জলেব মিলে,
প্রাণেব মুক্তি, মুক্তিব নিঃশ্বাস
মাঠে-মাঠে মেলে, শবতেব ঘাসে, কাশে,
উদার পৃথিবী তাবই মাঝে দিলদাব
ঘব বেঁধেছিল শিল্পী প্রেমেব তাব
আশ্বিনে বাঁধা ঘর।
এদিকে পাহাড ওদিকে চূড়ার সাব—
এই পার্বতী এই পবমেশ্বর।

ভেঙে যায় ঘুম, চাঁদের আলোর ডাকে।
এই তো জীবন নাজেহাল হিমশিম
চাল নেই চুলো হিন্দু ও মুস্‌লিম
শুনি শুধু আছে, দেখি শুধু উন্মাদ।

আশ্বিন আসে নির্বাক প্রতিবাদ
মুকুরিত হাসি তার
সোনালি ধানের হালকা হাওয়ায় আলোকিত প্রতিকার
নির্বিরোধের সহজ অঙ্গীকার
হাওয়ায় ছড়ায় শালের চূড়ায় গোলাপবনের বাঁকে—

স্মৃতির মুক্তি, চলে যায় পশ্চিম।
বহু আশ্বিনে কাঁপে দীপালির হিম,
আগুন নেভায় চাঁদের আলোর চর।
পশ্চিমে যাই, চলে যাই উত্তর
চলে যাই। আহা বাংলোর সেই ঘর!

ঘুম ভেঙে যায়, জানলায় আশ্বিন,
বর্তমানের পাক খুলে যায় চাঁদ,
ইতি ও নেতির অতীত সে প্রতিবাদ
গত আগামীর দুহাতে ছড়ায়
আলোঢালা স্রোতে রাতে মিশে যায়
কালো কালো কটা দিন।
কান্নায় কানায় আলোয় হৃদয় ভরে
আকাশে মিলাই ছাতে ছাতে সুন্দর
এই আশ্বিন এই তো সেই শহর।
শিরশিরে হাওয়া সংগীত মর্মরে
আমার হৃদয়ে ঢেলে দিলে আশ্বিন ॥

## বহুবড়বা

পশ্চিমে ছাড়ে চিত্রকরেবা তুলি,
অস্তসূর্য নাজেহাল বঙে রঙে,
প্রাণহন্তারা হাব মানে এই জঙে।
আকাশ ছেয়েছি হৃদয়ের সাত রঙে—
আকাশে তোমাবই চম্পক অঙ্গুলি,
প্রত্যহ দিই তোমাকেই দিনগুলি।

মিতালি ছড়াও দুই হাতে ডাকো পাশে
সহৃদযজনে, কাটে দিন শত কাজে।
কর্মিষ্ঠা যে তুমি শর্মিষ্ঠা যে।
তোমাব নযনে প্রাণের প্রতিমা বাজে,
দেবযানী তুমি, প্রত্যহ-প্রত্যাশে
তোমাকেই দেখি তীব্র সন্ধ্যাকাশে।

সন্ধ্যা ঘনায, শহবেব ঘুলঘুলি
বঙে বঙে ভেঙে প্রান্তব একাকাব,
উদাব বিবাট অনাবৃত গ্লেসিযাব
আকাশে আলোয হিমালয়ে একাকার,
তারই মাঝে তুমি মুদ্রিত অঙ্গুলি
ববাভয়ে, আনি কৈলাস দিনগুলি।

অন্ধকার চেনা ছিল অনেক শ্মশান
আমাব হৃদযে বহু অন্ধকার চেনাশোনা বহুকাল
অন্ধকারে বহু দিনরাত শুনেছি শূন্যের গান।
করেছে তুষাব কালো রুদ্ধ হৃৎস্পন্দে আনাগোনা
নরকের হিম অন্ধকারে
বিবর্ণ তুষার এই হৃদয়ের বহু পদপাতে
করেছে নিঃশেষ বহুকাল বহুবার—
প্রচ্ছন্ন তুষারদেশ প্রশান্তির শুভ্র আমন্ত্রণে বা কখনো
উজ্জ্বল কৈলাসে কোনো পার্বত্য আবেগে
কখনো বা মানসহ্রদের এক মোহমুক্ত মাঘে—

হঠাৎ বিদীর্ণ বক্ষ, হিমশিলা চূর্ণ চূর্ণ স্রোতে,
হঠাৎ তুষারচোরা ভেঙে যায় আবর্তে গভীর,
হঠাৎ তুষারদ্বীপ ওঠে জেগে, অসীম শূন্যতা
ওঠে জেগে, নরকের অপমানে লেগে
উচ্চারিত শান্ত দেখি গুপ্তচর হৃদয়ের অঙ্গার নিদাঘে।

তবু একা অন্ধকার ! (এ কোন কটাহ
মাস্তোভানি ! বলো তুমি) প্রাণের প্রবাহ
স্রোতস্বিনী, সবুজ, শ্যামল
প্রান্তর, পাহাড়, দেওদারবন তিমিরমগন সব পুড়ে অন্ধকার
অসহ্য অঙ্গার সব আসমুদ্র হিমাচল
একমুঠি ক্ষার নীল যমুনার জল দগ্ধ শমী অন্ধকার
অস্থির সিন্ধুর তীর, গঙ্গা বিড়ম্বিত আজ
কর্ণফুলি ভিক্ষাঝুলি কলকাতার আদিগঙ্গা ভিখারির হাড়
কোন্ রক্তরাগে আঁকা ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার মরণে স্তম্ভিত আজ
নির্বেরাগ মিলিত পাপের
এ শ্মশানে সীমা নেই, এতো নয় দাহদীপ্ত ঘাটের মশান
এ আকাশ নীরন্ধ্র আকাশ
পাপের মিলনে ভয়ংকর মত্ত অন্ধকার চলে জাঠা
অন্ধ নেকড়ের পাল
চিনে না কবাল এই মহাকাশ দগ্ধ অন্ধকার।

উপমায় খুঁজেছি সান্ত্বনা
ও উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ
গান্ধীজির অস্পষ্ট উষায়
সামন্তের সন্তের শেঠের নাটকীয় উষসীর বর্ণ সমারোহে
তোমার নির্মোহ ডাকে বিলম্বিত তানে
পেয়েছি উপমা সন্ধ্যে
উপমার স্রোতে দেখেছি তো অন্তঃশীলা
ঘূর্ণাবর্তে মাতে, মাতে হাজার খাঁড়িতে
মোহানার শত মোহ স্রোতে আসন্ন মুক্তিতে দিশাহারা—
স্বপ্ন বাঁচে কর্মে
কর্ম দুঃস্বপ্নে অস্থির।

মিলাক আমারও সত্তা শত ঘূর্ণিপাকে, একাকার
টলোমলো সমুদ্রের একরাশি জলধারা হাজার হৃদয়

হোক হোক শত আত্মম্ভরিতায় কানা নদী মজাখাল
সবাই সবাই আজ খুঁজে পাক কপিলের গুহা,
মহিমায় মিলাক অণিমা, কমলে কামিনী কিম্বা
কালীয়দমনে।
সমষ্টির গুরুভারে অহল্যার স্বকীয় মর্যাদা
ধাব দিক সবাকেই বিপ্লবীর লঘিমা দুর্বার
লাখো লাখো ঘোড়সওয়ার সমুদ্রের ঢেউ—
সফেন চঞ্চল নৃত্যে সমুদ্র ছাড়া কি কিছু কেউ?
তাই তো তুলনা খুঁজি অদ্বৈত সাধনে তাই সমুদ্রেই ধাই
এদিকে হৃদয় চিরদ্বৈতাদ্বৈতে গায় নীল যমুনার তীরে অণুর সংগীতে
বিজন তমালতলে অসংখ্যের বংশীরবে প্রাণের বৈভবে
মিলন-বিরহে চিরবাহুবদ্ধ রাধা।

কিম্বা উৎপ্রেক্ষা খুঁজি সুরে গানে
কোমল গান্ধার যথা আপন অস্তিত্ব উৎসর্গে
সপ্তকের বিন্যাসে বিন্যাসে গোষ্ঠীচক্রে প্রাণ পায়
কানাড়া কিম্বা মেঘমল্লারে বা মালকোশের লম্বিত বাহুতে
যমুনা! সমুদ্রে দাও ছায়া দাও
মুরলীমায়ায় দাও নীল তমালের বনছায়া
চিরবিরহীর বাহুবদ্ধ চিরমিলনের সাধা
কোমল গান্ধার! জাগো বহুর বাড়বে
ব্যাপ্ত দেয়ালিতে মেলো সত্তার অগম অন্ধকার
অন্ধকারে আনো কোজাগরী।
ব্যক্তিস্বরূপের দীপে দীপে জ্বালো তারায় তারায় রূপের আরোপে
বিরহে মিলন আর দুর্ভিক্ষে বসুধা
সূর্যে চন্দ্রে মানুষে মানুষে গোষ্ঠীর আসব।

স্বরে স্বরে আর ফাঁক নেই
স্বপ্ন আমার মেলালুম
তোমার অন্ধ বাহুতেই
বন্ধু, এতে দেমাক নেই
মিলে প্রাণ পাবে বেমালুম।

তুমি ছাড়া আমি অগোচর
তুমি কর্মের কারবন্
তুমি বিনা আমি ফাঁকা ঘর
আকালের গ্রামে পার্বণ
নীরন্ধ্র সুব, ফাঁকা স্বব ।

আমি ছাড়া তুমি উত্তাল
নিশি পাওয়া নেশা, দুর্বার
ম্যামথ ছুটেছে চারিদিক
ঝড যেন এক, বেগ তার
প্রাকৃতিক, ও অমানুষিক ।

তোমাতে আমাতে নেই মিল
তবু তুমি আমি একাকার
তোমাব বাহুতে তোলো খিল
আমাব হৃদয়ে খোলা দ্বাব
দিনে বাতে গড়ি এ নিখিল ।

প্রকৃতিতে মিলে থাকে আলো অন্ধকাব
চক্রে এক অনাদ্যন্ত, বোধ্যদুর্বোধ্যের অতীত
স্ত্রী পুরুষ থাকে যথা, উভযত সম্বন্ধে একক
জৈববিশ্বে অপঘাত ও স্বভাবে নিয়ত, আদি অন্তহীন,
সমষ্টি ব্যষ্টির শত শত আপতিক জৈব সমাধানে ।

আমারও জীবন করে হৃদয়ের দ্বারে করাঘাত
অহর্নিশি বিপ্রলব্ধা, সদা করে নামসংকীর্তন
জীবনের, জীবনের আশা
অন্বিষ্টের দীক্ষা আনে কানের কিনারে, প্রাণে
স্থিতি ও গতির
সংগতে গম্ভীর এক ধ্রুপদ বন্দনা যেন জীবনেরই পাখোয়াজে
জীবিকাব আসরে আসরে !
তবুও অন্বিষ্ট কেন
অন্বেষার পথে পথে, লালদিঘিতে বিকেল পাঁচটার ভিড়ে
দিশাহারা, সপ্রতীক্ষ, ক্লান্ত, উদাসীন ?

জানি না কোথায় শেষ এ প্রচণ্ড জোয়ার-ভাঁটার
ঘাটে ভাঙা ট্রাফিকের, কিম্বা বুঝি শোভাযাত্রী ঢেউ।
এতো নয় সমুদ্র বা নদী কোনো প্রাকৃত উপমা
এই ব্যক্তিসমাজের সীমা পার থেকে অগোচর
শোথমত্ত জলেরই গভীরে এই সাঁতারু হাতেই
সীমা বুঝি পরিমেয়
রুদ্ধশ্বাস জীবনের প্রচণ্ড আশায়
স্বপ্ন আর কর্ম যেথা একাকার ভ্রূণস্থ মাতৃত্ব যেন
জীবনমৃত্যুর ব্যষ্টি-সমষ্টির ঘূর্ণি কিম্বা বন্যা উন্মুখর স্রোতে
জীবনেরই আশা, শুধু আশাবাদ নয়,
জীব জগতের সুস্থ নিয়মে যা স্বাভাবিক
যেন কাঠে খড় কুটা কিম্বা উপড়ানো বট কিম্বা অশথের চারা
শূন্য আশাবাদে কিম্বা দুঃখের সন্ত্রাসে ভাসে তরল দ্বন্দ্বের ছন্দে
প্রাকৃতিক আত্মদানে যেন কোনো দামোদর অজয়ের বানে
সমষ্টির বৃত্তে ব্যক্তিহীন অনর্থক খাণ্ডবে নিঃশেষ—
নয় সে বড়বা,
এক হোক এককের বহু বহু বহুধায় এক
সো'কাময়ত দ্বিতীয়ো মে আত্মা জায়েতেতি
সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে—
অক্ষয় সে দিন।
বলেছিলে সেই যে কথা কানে কানে
অনেক তারার গানে গানে
ধলভূমে সেই পলাশবনের স্তব্ধদিঘির নিদ্রাবিহীন তারার নিচে—
নিচেও তারা,
চোখের তারায় আকাশ এনে
লাল মাটিতে আকাশ হেনে

সেদিন জীবন হারিয়েছিল স্থির সীমানা
জীবনমরণ বক্তেজানা কথায় জানা কথার পাকে
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে জানা
হাতে-হাতের মুখর ডানা সব সীমানা উড়িয়ে দিয়ে
তারার গানে
পলাশবনের মাটির টানে তোমার আমার দুইটি পাখি—
একটি পাখিই একটি সদসৎ
ডাইনে বামে এক তালাতেই পেয়েছিল যতি।

সো'বিভেত্তস্মাৎ
স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ

তোমার আমার মিলন হবে ব'লে

একাকী বিভেতি

সেদিন তুমি যে কথা বলেছিলে
সেই একতায় নিঃশেষ হোক এক ও বহুর নেতি ॥

## সন্ধ্যা রাত্রি ভোর

ছোটো ছোটো মেঘ দলে দলে
হাজার ধবলী স্থির, চলে নাকো. কার বাঁশি শোনে
কার নীলজলে কিবা তরল সংগীত এই সবে স্নান সেরে ।
হৃদয় রাঙালে তুমি, হে প্রকৃতি, অপ্রাকৃত কিবা কৌতূহলে
বলো কার প্রতীক্ষায় হে অভিসারিকা
আগমনী রাত্রির আভায় ।

মুছে গেল মরীচিকা
কালো ইতিহাসে বলরামপুরের জঙ্গলে
বিদেশী প্রহরী রূঢ় কঠিন পাহাড় ।
আকাশে উঠল এক পঞ্চমীর হাড় আর হাওয়া,
আর ছোটে দঙ্গলে দঙ্গলে অন্ধ ও অসাড় মৃত্যুভয়ে ঘেরা
অসহায় গোপিনীর মতো ছোটে পাণ্ডুর মেঘেরা
যেন কোনো লঙরের খাওয়ার সন্ধানে
কলকাতাব পথে পথে অনাহারী ভিড়ে
ভিখারি স্বামীর পিছে চলে পতিব্রতা
কিম্বা কোনো কাঁদুনে-বোমায় ডালহাউসির ফেরারি জনতা

প্রেয়সী ! দুর্লভ তুমি, হে প্রকৃতি দূর !
তোমার পুরুষ আজ দঙ্গলে দঙ্গলে বর্বর ক্ষুধায়
মরে দলে দলে দেখ শূন্য সাম্পরায়ে ছাই মাটি ধুলা
ছোটো ছোটো মেঘ দলে দলে
কোথায় মমতা !
কিম্বা তারা কি তারা
সূর্যাবর্তে ইতিহাসে জ্যোতিষ্ক অধ্যায়ে
গ্রহকক্ষ, নক্ষত্র, নেবুলা—
পঞ্চমীর সতর্ক আকাশে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রেরা জ্বলে

অতন্দ্র প্রতীক্ষারত নিশিভোর নক্ষত্রসঙ্ঘেরা
জ্বেলে রাখে পঞ্চমীকে হাড়ের মশালে
পার ক'রে দেয় রাত্রি চুপি চুপি হাতে হাতে ঊষসী-ঊষায়
প্রভাতের স্বপ্নে লাল কৃষ্ণপক্ষশেষে এক আশ্চর্য সকালে ॥

## আমার স্বপ্ন

কতো দুর্যোগ, কতো দুর্ভোগ যায় !
বিরাট কালের বিপুল তেপান্তরে
হাতছানি দেখি তোমারই বটের ছায়ে,
তোমার হাজার ঝুরির প্রাণের বরে
প্রাণ পায় মৃত আমাদের যৌবন ।

মোহিনী নয়কো, মানুষেরই নির্মাণ
মাটির মানুষ, একাগ্র দিনমান
শিক্ষিত চোখ সদাসতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মনপ্রাণ
হাজার বাহুতে এনে দিলে যৌবন ।

কতো দুর্যোগ, কতো দুর্ভোগ যায় !
গঙ্গা কে কবে মেশাযরে ভলগায়—
আমাদের রাত আমাদেরই দিন জানি,
মানি না কুহক, শুধু দুই হাতে আনি
তোমার হাতে এ অনুজের যৌবন।

জ্যৈষ্ঠ ! তোমার নির্মাণ প্রতিভাস,
আমার স্বপ্ন গঙ্গার চবে চবে
মেঘনার স্রোতে গড়ে তুলি ইতিহাস
উজ্জীবনের বিরাট তেপান্তরে—
সন্তত দেখ পবিণত যৌবন ॥

## বিল্ আর্চর-কে

পাহাড়েব পাঁচ মাথায় খুলল চুল, নাকি ভ্রমব ?
উন্মনা ওড়ে তেপান্তরের তৃষা—
বাতাসে কি তার হৃদয় উন্মুখর ?
উজ্জয়িনীর বাসা খোঁজে, নাকি খুঁজছে সে বিদিশাই ?

পশ্চিমে ওড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি,
পোড়া মহুয়ায় মধু খুঁজে খুঁজে ওড়ে,
হৃদয় উদাস অনেক হৃদয় মৌমাছি
করুণ আকাশে ওড়ে আর ওড়ে শেষের সোনায় পোড়ে

বাতাস মুখব, কীর্তনীয়াব কলি
মধুব আখর অনেক হৃদয় হল
মেঘে মেঘে হল বৃন্দাবনের গলি
কাংস্য আকাশ মেঘে যায় উচ্ছলি

বিদ্রোহ আজ বৃদ্ধ স্মৃতির বলি ।

গোপীকন্দরে বৃষ্টি নামল বুঝি
দামিনের জমি ভিজে প্রাণ ভরপুব
কাটিকুণ্ডের মেঘমালা মেয়ে যতো
ফসলফলানো ঢেউদোলানিয়া হাওয়া
মেদুর ঘাসে ও ঋজু শালে করে ধাওয়া
নাচবে এবাব বাহু বেঁধে ধ্যানরত
ধানেব স্বপ্নে. আকাল পালায় বুঝি,
ঘরোয়ায় ঘেবে গন্ধর্বেরা দূব ।

সিদো চুপ আর স্তব্ধ হয়েছে সে আওয়াজ কান্থুব ॥

## কালের রাখাল শিশু : ২১শে ডিসেম্বর

তোমাকেই দেখি আমি,
নিত্য দেখি. শুনি প্রত্যহের বিকাশে খেলায়
দেখায় শেখায় একাকার তোমার বিভোল নৃত্য,
গানেব চিৎকাব. কান্নার বৈশাখী
আব আশ্বিনের হাসি. কাকলিকথার ঝরনা ।

প্রতিদিন প্রতিক্ষণ আবিষ্কাব নূতন তোমার
প্রতিদিন বিশ্বজয খেলা বা সক্রিয় জ্ঞানে, হে বালকবীর,
দূর থেকে শুনি তোমার আমার ভেদ, স্মৃতির সাযুজ্যে ভুলি.
চতুর প্রৌঢ়ত্ব আর চপল প্রজ্ঞার মধ্যে
দুস্তব বছুব--
কাল যেন মহানদী সাঁতরায় উদ্‌ভ্রান্ত অস্থির---

কিম্বা যেন বনের কিনারে কাঠের কাটরায়
জ্বালানিব তক্তা সব, আমরা, প্রৌঢ়েবা.
বাল্যের প্রান্তর পারে যাবা,

আর তুমি তুমি বাছা সবস সতেজ কচি
শ্রাবণের সদ্য বট—শাল বা পিয়াল।

তুমি মুক্ত, প্রাণময়, নিঃসংশয়, কর্তৃত্বের অধিকাব শুধুই খেলায়,
তোমার ইন্দ্রিয় আব মানস নির্দ্বন্দ্ব
বাধাবন্ধহাবা তোমাব বিচার আব কল্পনাব
স্বচ্ছন্দবিহাব এহাতে ওহাতে যেন নির্মাণে খেলায়
তোমাব বাস্তব সারা বিশ্ব, চোখ কান ঘ্রাণে এক
চর্বচোষ্যে ধ্যানধারণায়, সচল কর্মঠ বিশ্ব।
তাই সম্ভবে ও অসম্ভবে নামে
তোমার সমান পদক্ষেপ
ব্যক্তি আর সমাজেব দক্ষিণে ও বামে
তোমার অভ্রান্ত ছন্দ
দুহাতে ও আশেপাশে ছড়ানো খেলেনা
আব বর্ণমালা ধারাপাত

তুমিই কি কালের রাখাল
মহাস্থানে বিশ্বের প্রান্তরে
মানুষেব পায়ে পায়ে পথের ধাবের বটেব ছায়ায় ?

আমবাও এপাব ওপাব সেতু বাঁধি, বাঁশি শুনি
স্মৃতি দিযে, আমাদের মানবিক একাত্মবোধেব
দ্বন্দ্বময় রোমন্থ স্মৃতিতে বাঁশি শুনি সাযুজ্যের
দেখি তুমি নিরাসক্ত আকাঙ্ক্ষায
মেলাও ত্রিকাল প্রত্যক্ষের একটি কলিতে
সঞ্চয়ী কাববারে নয়, ঐতিহ্যের নিত্যনব সাক্ষাৎ নির্মাণে।

তোমার অতীত আর ভবিষ্যৎ বর্তমানে অবিচ্ছিন্ন
অথচ মুহূর্ত প্রতি মুহূর্তেই অতিক্রান্ত
কখনো জোয়ারে আর কখনো বা বন্যাবেগে
আপন বিকাশে আর মুহুর্মুহু বিশ্বপরিচয়ে
নৈর্ব্যক্তিক খেলার বিজ্ঞানে কল্পনায় রচনায়
তোমার অখণ্ড সত্তা চঞ্চল সংহত

শোনো শিশু শোনো
মিলাও প্রসাদ তার অসত্যে ভঙ্গুর স্থাবরের।এই পাড়ে—

না, না, তুমি দূরে থাকো, আমাদের ক্লান্তকাল
অতিক্রান্ত করে যাও আমাদের পিছে রেখে
চলে যাও পাহাড়ের পরপারে
ঐ সচ্ছল সংহত দেশে যেখানে জ্বালানি নয়
যেখানে পিয়াল কিম্বা শাল বা বটের চারা
বর্ষে বর্ষে বনস্পতি কোনো
প্রাজ্ঞ, প্রৌঢ় ও গম্ভীর, দিউগাশভিলির মতো,
ছায়াময়, হাওযায় হাওয়ায় প্রসন্ন, সম্পূর্ণ শাখায় পাতায়
ফুলেফলে দীপ্ত, দান্ত ॥

## শিশির

কতো কাল ধরে করে যায এরা কতো না আত্মদান
কতো বিদ্রোহ, কতো ফাঁসি, কতো আন্দোলনের গান
মবণেব কানে ক'বে গেছে এই অমর্ত্য ছেলেবা যে
কতো বীব বেশে জীবনকে এরা কবেছে মাল্যদান
সে কী নির্ভয় বাঁশিতে মেলানো বাজে ।

গুলিব সামনে বুক পেতে রাখে মুখ
দ্বীপান্তরের ব্যথায জীযায এবা যে স্বপ্নসুখ
সেই স্বপ্নেই তুমিও আজ কি দিলে এ আত্মাহুতি ?
এদিকে আকাল উদ্যত, এক হিন্দু ও মুসলিম
দেখে যে ঈশানে ঘনায ভুখ মিছিল
ঘনায আকাশে সেবাব ডাকেব মিল

আজও সেই ভয, আজও শৃঙ্খল, আজও সেই তাঞ্জাম
কোথায মুক্তি, কোথায মুক্ত আকাশের অনুভূতি
তাই তুমি দিলে নূতন যুগেব প্রারম্ভে প্রাণ বলি
দেশের আর্তত্রাণ
সেবাব্রতেব অমোঘ মূল্যে মদমত্তের মুখে দিলে তাই হিম
সত্যের অঞ্জলি
ছিটালে তাই কি কৈলাসখর উমার অশ্রুজলে
তুষারে জ্বালালে দেশেব মানুষ, মানুষেব সম্মান ?

# কাসান্দ্রা

ভোরের সূর্যে রক্তের স্বাদ লাগে
সে কার রক্ত
বীরের রক্তস্রোতে কেন জাগে মাতার অশ্রুজলে
মাতার রক্তে পথের ধুলায় জাগে
সূর্যোদয়ের রাঙা !
শক্ত আলোয় পাঙাশ দিনের চুরমার হাহাকার
হে নবজীবন আনো যৌবন নীলাকাশ জ্বলজ্বলে ।

কাসান্দ্রা ঘুরি অতন্দ্র পথে পথে
অলিতে গলিতে পিতা প্রিয়ানন্‌ ছায়াময় চোখ ঢাকে
পাথরে পাথরে পায়ে পায়ে হাহাকার
হাড়ে হাড়ে জাগে পায়ে পায়ে চোখ পাথরে পাথরে হাজার
হাজার হাজার ট্রয়ের দগ্ধ চোখ ।
হেকটর বুঝি ঐ বুঝি বাঁধা রথে
ঘুরে ঘুরে গেছে রথের চাকার পাকে
মৃত হেকটর হতাহত হেকটর !
তবু কাসান্দ্রা তবু কাসান্দ্রা আমি
মানিনি তো আমি সূর্যের রাঙা রোখ ।

কোথায় তোমার গেল দেখি বলো লীলায়িত যৌবন ?—
কোথায় তোমার প্রজ্ঞাপ্রবীণ বলি ?—
পথের ধুলায় পড়ে ও কার ও হায়াসিন্‌থ যৌবন ?—
কার কালো মাথা লাল ক'রে দিল গলি ?—
ও কার শিশুর অনাথ কান্না নামায় পার্থেনন ?—
কাসান্দ্রা ঘুরি পথে পথে ; কূট চতুর
কাঠের ঘোড়ায় ট্রয়ের ঈগল নত
নীলাকাশ ছেড়ে পথের ধূলায় হত !
একেবারে বুঝি দেউলিয়া আজ ফতুর
আমার অস্ত সূর্য আমার অরুণাশ্বের রথী
তাই কাসান্দ্রা ঘর ভাঙা উদ্‌ভ্রান্ত,
লুব্ধ সূর্য, তাই ট্রয় জুড়ে চলে
গুপ্তঘাতক, মৃত্যু রুষ্ট ক্লান্ত

'অমর প্রাণের মর জীবনের
ফসল ফলানো আলোর গানের
অমর সূর্য ভুলে গেছে আজ
জীবনে মরণ হেনে কতোটুকু কতোদিন কার ক্ষতি

কাসান্দ্রা ঘুরি অতন্দ্র চোখ পথে পথে বন্ধুর,
ঈনিয়স যাক লোভন ভবিষ্যতে !
অজেয় আমার আলুলিত বেণী, যুগান্তে সংহতি ॥

## অন্ধকারে আর

অন্ধকারে আর রেখো না ভয়,
আমার হাতে রেখো তোমার মুখ,
দুচোখে দিয়ে দাও দুঃখে সুখ
দুবাহু ঘিরে গড়ো তোমার জয়,
আমার তালে গাঁথো তোমার লয় ।

অসহ আলো আজ ঘৃণায় দগ্ধ,
দূষিত দিনে আর নেইকো রুচি,
অন্ধকারই একমাত্র শুচি,
প্রেমের নহবত ঘৃণায় স্তব্ধ ।
আমার হাতে ঢাকো তোমার মুখ ॥

## প্রচ্ছন্ন স্বদেশ

চেয়েছি অনেকদিন
আজো তাকে খুজি সাবাক্ষণ
কখনো বা পাশ দিয়ে কখনো আড়ালে
কখনো বা দেশান্তবে কখনো বা চোখোচোখি
কখনো বা ডাকে কানে কানে কাছাকাছি
নিঃশ্বাসেব তাপেএকান্ত আপন ছন্দময
বুঝিবা অলক তার কাঁপে আমাব কপালে
কখনো হাওযায লাগে হাওয়া

তবু তাকে পাওয়া আজো হল না নিঃশেষ
বাহুব নাগালে নেই অস্পষ্ট অথবা
অথচ সূর্যেব মতো সত্য মাটি যেন ফসলেব কাছে
পূর্ণিমাব চাঁদেব মতো প্রত্যক্ষ অথচ
অতনু প্রবাহ তাব
বক্তে তাব পদধ্বনি জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে
স্বপ্নে তাব হৃদয সদাই শ্রাবণেব তালদিঘি
উত্তবাধিকাবে তার দীর্ঘ অঙ্গীকাব প্রেরণা পৌরুষে

তবু তাকে খুঁজি সারাক্ষণ
খুঁজি সাধারণ্যে তাকে সাধাবণে জনতায় চকিতে নিবিড়ে
দুর্গতিব ব্যাপ্ত দায়ভাগে নিশ্চিত আশ্বাসে
জনগণের জনসাধাবণে দেশেব মানুষে
যে যাব আপন কাজে বচনায় রচনায
মনে হয় দেখা বুঝি মেলে
সমুদ্রে সমুদ্রে দেখি আবেগকল্লোলে
এই বুঝি আবির্ভাব
সাগবউত্থিতা উল্লাসে উল্লাসে শপথে শপথে
দীপ্ত মিলিত ভাষায
লবণাম্বুবাশিরাশিনিবদ্ধধারায় মেলে বনরাজিনীলা
সভায় মিছিলে তোমাদেব আমাদেব ভিড়ে
সমুদ্র সে সমুদ্রই নয বুঝি আকস্মিক বান বুঝি
গান শুধু হঠাৎ জোয়ার
উল্লাস উদভ্রান্ত মরু ঠেলাঠেলি অন্ধ অহংকার
ক্ষমতার পাতাল সন্ধান প্রায় আত্মঅচেতন

পালায় সে মেঘে-মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাটায় ভাটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালীতমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে
বারবার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—

প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ।।

## ত্রিপদী

আমি তো যাইনি বঙ্গিলা কারো নায়ে,
আমি এ মাটিতে, তোমাকে দেখেছি প্রভাতে পিয়াল ছায়ে
জীবন যেখানে আকাশে জমাট একটি নিকষ পাহাড় ।

বহু ব্যর্থতা বহু বেদনার বাহুল্যে বর্বর
প্রাণের পাতাল শহরে জীবন অচল অনড় অসহ,
তার মাঝে তুমি সংকল্পের দিগন্ত প্রান্তর ।

যেন বা প্রকৃতি । স্থিতির গতির অনন্ত দ্বন্দ্বের
তোমার বিজয়ী সংগঠনের ঐশ্বর্যের পাশে
আমার গ্রীষ্ম পাক শরতের সংগতি ।

দুইদিকে আজ আমার শারদ জীবনের প্রান্তর,
প্রান্তিক উষা চোখ মেলে চায়, একটি নিকষ পাহাড়.
প্রান্তর চিরে একটি সোনালি নদী ।

উপোসির চোখ মেলাও এখানে কাস্তের কাঁপা সবুজে,
তৃষ্ণার দিশা মিলুক কাঁঠালছায়ায় গভীর ইঁদারায়.
অনাচার হোক দূর স্মৃতি, কাজ মুক্তির খোলা প্রত্যহে !

নদীর বাঁকের চড়াই পাড়ের ছায়ে
একটি অমব করবীশাখায় শাখায় ধরেছে ফুল,
সেই ফুলে দাও ত্রিপদী ছন্দে আমার মনের উপমা ।

পরিবর্তনে ভয় নেই তুমি পৃথিবীব মতো উন্মুখ
ক্ষয়ে প্রগতিতে অক্ষয় এক সচ্ছল একতান,
তোমাব দুচোখে দেখেছি আমার উত্তব

জীবন যেখানে স্বচ্ছ আকাশ, মানুষেরা সব পাহাড়,
মুক্ত শহরে কেউবা সুস্থ গাঁয়ে ॥

## শান্তির শরতে এসো

অরণ্য এ মন, ঘনসবুজের বন্য অন্ধকাবে
উদ্যত পেশল লাফ, অগ্নিকণা জ্বেলে দুই চোখে
স্তব্ধ অপেক্ষায় বসে হিংস্র থাবা পিপাসিত নখে
প্রস্তুতিতে থরোথরো, যেন রুদ্রবীণা তাবে তারে
মোচড়ে মোচড়ে বাঁধা, প্রায়াসন্ন যুগান্তের শব্দ ।
অরণ্য এ মন, বর্ণে বর্ণে প্রকৃতির ছদ্মবেশে
উদাত্ত ঘৃণায় তীক্ষ্ণ আক্রমণ বসে ছায়া ঘেঁষে.
স্থির বসে, যেন ক্ষিপ্র বজ্রের সংগীত স্তব্ধ—
চতুর শিকারি ! তুমি সাবধান তুমি সাবধান ।

বরঞ্চ অরণ্য ফেলে মাঠে এসো সমান আকাশে,
শান্তির শরতে এসো, শাদা মেঘে এসো নম্র নীলে,
এসো কৃষ্ণসারের গতিতে, বনতিত্তিরের গান
কান ভরে দিক, এসো আমনের সচ্ছল বাতাসে
সংহত মধুর এই মুক্ত স্বচ্ছ সবার নিখিলে ॥

## তিনটি কান্না

(শান্তি বসুকে)

১

শীতের আকাশে অকাল দখিনা এই মেঘ এই রৌদ্র !

বাসে উঠে এল দুটি ভিখারির ছেলে ।
আমরা হলুম মানিকতলার রাস্তা দেখায় রত—
আমরাও ওগো ভিখারিই—আজো না হয় মাগিনি ভিখ-
পেল কি পেল না একটি কি দুটি পয়সাই ।

মিলে গেল ঘড়ি, ফিরল পেপস্‌ হুংকারে।
লাফাল বড়োটা, ছোটোটাকে একা ফেলে,
আড়ামোড়া ভেঙে কবন্ধ বাস কেঁপে উঠে উধাও ।

ছোটোটা তাকায় অসহায় চারিদিক—
আমরাও বড়ো অসহায় ওগো, ভয় তাই—
দয়া মায়া সাধে আর না !
সহজে চূর্ণ হয় কি জীর্ণ সংস্কার ?
সহজে কি দূর করা যায় যতো অনাচার ?

ছেলেটা অন্ধ, ঘোলা দুই চোখে নোনা জল,
রুগ্ণ বিকল উপবাসী ক্ষত হাতে,
কে নামাবে তাকে জীবনমরণ করে পণ ?

নামাই ক্লান্ত চোখ, যেন ঘুমে, ঢাকি হাত।
শুনেছি মানুষ একদিন হবে একজাত
থাকবে না ক্ষত হৃদয়ে সারবে চোখ হাত
সেই দিন, সেই দিন—
সারা দিন দেখি অন্ধ চোখের আয়নায় দেখি রৌদ্র
সাবা দিন রাত শুনেছি আকাশ ক্ষত বিক্ষত কান্নায়

২

আপিসের পাকা ইমারত কাঁপে থরো থরো—
ও কে গান করে নাকি কান্না ?
সূর্যে সূর্যে স্বর পৌঁছায় থরো থরো,
পথের ভিখারি গান করে নাকি কান্না ?

আয়ের খাতায় আঁকে আঁকে ভুল হয়ে যায়—
ও কি গান করে নাকি বিধবার অভিশাপ ?
জিপিও-র ঘড়ি কলের ঘোড়ায় চড়ে—
ও কি উপোসির শাপ ও কি ক্ষমাহীন কান্না ?

ফসলফলানো হাওয়ায় সেধেছে সুর
সবুজ স্মৃতির একি দুর্বার অভিযান
স্বামীর বুকের গুলিতে বেঁধেছে সুর
জয়পবাজয়ে ঘরভাঙা একী জয়গান।

মীড় তোলে, জাগো, জাগায় নিঃস্ব উপবাসী,
ও কে গান করে একি অশ্রুশুকানো কান্না,
ফুকারে ওকি ও ন্যায়বিদ্রোহে বাঁশি।
সূর্যে সূর্যে স্বর পৌঁছায় থরো থরো

ওর গলায় ভেঙেছে অভাবের যত শৃঙ্খল
ওর সুরে সুরে ছেঁড়ে যুগযুগান্তব্যাপী ছল—
লালদিঘি ম্লান আনমনা ওর কান্নায়
আয়ের ব্যয়ের আঁকে আঁকে ভুল হয়ে যায়।

৩

দেখেছি তাকে পথের মোড়ে, ভিখারি, শুনি, দুর্ভোগ,-
পাগল নাকি ? পাগল নয় মোটেই !
প্রবল বেগে দু হাত নাড়ে ঝড়ে ঝাউয়ের ঝাপটানি
কিম্বা যেন ঈগল দুটি বৈশাখীতে ছোটে ।
শহুরে পথে যেন সে এক প্রাকৃত দুর্যোগ—
পাগল বুঝি ? পাগল নয় মোটেই ?
প্রবল বেগে নাড়ায় মাথা ঝড়ে তালের কাতরানি
কিম্বা যেন লিয়র মাথা কোটে,
লিয়র যেন বুড়ো লিয়র তেপান্তরে ঝড়ো
পাগল রাজা—পাগল নয় মোটেই ?
কতো রিগান্‌/গনেরিল,যে দু পাশে হল জড়ো
কতো না এডমণ্ড কানাচে জোটে ।
লিয়র যেন, রাজ্য নেই, দেয়নি শঠে শাঠ্য,
পাগল, নাকি পাগল নয় মোটেই,
বিলিয়ে দিলে হৃদয়টাই এই কি তার নাট্য—
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে !
দেখেছি তাকে পথের মোড়ে ঝড় নামায় হাওয়ায়
এমনি তার ঝাঁকড়া মাথা কোটে,
ঝোড়ো হাতের ঝাপট হানে আর্তনাদের বন্যায়
পাগল ? নাকি পাগল নয় মোটেই ?
কান্না তার বিদ্যুৎ বা আগুনজ্বালা চিৎকার,
রাজ্য তার দুপাশে কারা লোটে
ভিখারি নাচে যেন-বা সারা দেশেরই কোনো লিয়র,
কান্না তার দু চোখে বাজ ছোটে ॥

## টাইরেসিয়স

গৃহিণী বেয়াড়া বড়ো, এতোদিনে সেই একরোখা
স্বভাব যায়নি দেখ ? অথচ শাসন এ বয়সে
খারাপ দেখায় জান, চিরকাল দিয়েছ তো ধোঁকা,

এবারেও ভেবে দেখ, যাহোক আনতে হবে বশে—
মেয়ের বিবাহ যদি দিতে হয়, হবে সে এখানে।
সৎপাত্র সন্দেহ নেই নামাবলি বাঁড়ুজ্যের ছেলে
ধার পায় হেসে খেলে ছয় অঙ্কও যেখানে সেখানে,
রাত্রে বাড়িই ফেরে, গাড়ি থেকে নামে অবহেলে,
যতোদূর জানি আজো ভোগেনিকো পারা বা গর্মিতে
কাবারে-তে হাসুক না, সিনেমায় রোজ বুঝি যায় ?
দিনে যে বেজায় কাজ, শেষটা কি ভুগবে ভিরমিতে
লালদিঘি চষে খেয়ে বড়োবাজারের ধাক্কায় ?
বাঁড়ুজ্যে. স্বনামধন্য আজ হিন্দু কাল কংগ্রেসি
আজ মন্ত্রী শালা তার, কাল মন্ত্রীবদলের চাঁই,
তারই ভাই, নাহয়তো ভায়রাভাই, ত্যাগী, সং-বেশী,
এজেন্সি অনেক হাতে, শুনলে তুলতে হবে হাই,
কলেমিলে চর্বচোষ্য মুঠি মুঠি শুষে নেয় সোনা.
পিসে তার বাংলার প্রাচীন বিখ্যাত জমিদার.
মেসো তার দিল্লীশ্বর অর্থাৎ দিল্লির মসনদে
দক্ষিণে আসন তার আসমুদ্র বাহুর বিস্তার—
তারই ছেলে আহা. আহা! ' গৃহিণী বলেন, বাছা মদে
প্রায়ই ডোবে, রঙ নাকি তার কিছু কালো নাকি মোটা,
কলেজে পড়েছে তবু পরীক্ষায় হয়নি প্রথম
(বিশ্ববিদ্যালয় অনুসন্ধিৎসুরা মিছে দেয় খোঁটা)
এই পাত্র---নথ নেড়ে (নথ খোলা) করেন খতম
প্রায় বুঝি গৃহিণী : তা দিন রেগে দিতে চান খিল
এ বয়সে. কবে নাও বাঁড়ুজ্যের বৈবাহিক উঁন।

সত্যিই ও ধনী নয় ধনী যদি বল
রথসচাইল্ড কিম্বা মরগন
নুন পাট দেওয়ানি আবগারি
তেজারতি দেবত্তর ফৌজদারি চুরি বা চামারি
চাকরি দালালি
এ হাতে হারামি আর ও হাতে হালালি—

ও নয় সমুদ্রযাত্রী সপ্ত সমুদ্রের পারে
বাণিজ্য-চণ্ডীর দীর্ঘ আরাধনা
খালের পুঁটি কি দেখে কমলে কামিনী
দাস পায় প্রভুর সাধনা ?

কোথায চর্চিল কোথা সেসিল্ রসেল
মাউণ্টবাটেন হেস্ অভিজাত ইংরেজেব ফরাসির
কোথায তুলনা এই সোনার বাংলায় ?
কোথায় নর্মান্ ক্ষিপ্র লুটেরার বংশধর সুজলা সুফলা
ভাবতের নরম পলিতে হারুণআল্‌রসিদও স্বপ্ন—
এখানে কিছুই নেই সামন্তবিলাস শুধু ধোঁয়া
আবুহোসেনের স্বপ্ন এখানে কাহিনী শুধু ফাঁকি
বহরের স্ফীতি আব পানাহার নারীর দেহেব শুধু নির্লজ্জ সন্ধান
এখানে বুর্জোযা বাবু নববাবু ব্যাবসা চালাকি
সাম্রাজ্য বুদ্‌বুদ সার্থক জনম মাগো
হুতোমের খেয়াল অদ্ভুত, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া।
আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু দেখি ইতিহাসে
আকর্ণ বিস্তৃত তিক্ত নাট্য পরিহাস এই সধবাব একাদশী
ভাদ্রেব গুমোট শুধু
বৃষ্টি নেই, বৌদ্র নিরুদ্দেশ।

তাহলে চুক্তিই ভালো, সত্য যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে
তাহলে দাঙ্গায় আর কাজ নেই ? ঝঞ্ঝাটও অনেক
তাছাড়া দেখায়ও বিশ্রী, বিশ্বযুদ্ধ চাও আর সাধে ?
দপ্তরি পালায় দরজি মিস্ত্রি যায়, ভদ্রতার ভেক
জীযানো কঠিন হল, মুরগি ডিম দুর্লভ পাড়ায়।
তার চেয়ে যুদ্ধ ভালো মিলে মিশে দুই সরকার
কলকাতায় কনট্রোল্ দিক চীন বর্মা ঐ পা বাড়ায়
ওদিকে মালয় মাতে, ভিৎমিনের ব্যবস্থা দরকার ?
কলকাতাই আস্তানা হোক, তৃতীয় দফায় নেবে ক'রে
দ্বিতীয়ে যা পারনিকো, ইতিমধ্যে হয়েছ লায়েক
পয়সাও শুরুতে যদি লাগে তবে ঢালবে নির্ঝরে
চাল ডাল কয়লা মাছ ধুতি শাড়ি কাঠ লোহা—চেক্
সবেতো এবার পাবে সত্য যদি বিশ্বযুদ্ধ বাধে।
বিশ্বযুদ্ধ ! এদিকে ছেলেরা সব বয়ে গেছে খরচ অনেক
মেয়ে চায় শাড়ি, গাড়ি, দাঙ্গা যাক যুদ্ধ চাও সাধে—
তোমাকে কে শিবা বলে তোমরাই তো মাথার ইলেক
দেশের মাথায় দশ, মনুষ্যত্ব থলি কার বাঁধে ?

আমার দুচোখ অন্ধ অতীত ও ভবিষ্যৎ স্মৃতি শ্রুতি
তোমার উলঙ্গ রূপ তাই দেখি রোজ

তুমি তো দেখনি দেশ অনাহার কাকে বলে
দেখনি তো সারাদিন ঘুরে ঘুরে
লঙরখানার পাশে সন্ধ্যার নৈরাশে
নিজের শিশুর মুখ
অনাগত আহারে উন্মুখ
দেখনি সঙ্গিনী স্ত্রীর বিবস্ত্র ব্যর্থতা
অসহায় রোগের লড়াই
তুমি তো দেখনি দেশ, এই দেশ
বিরাট, উদার, উর্বর, প্রাচীন, রঙিন, উজ্জ্বল আসমুদ্র হিমাচল
তুমি জান শেয়ার-বাজার বোর্ডের মিটিং
তুমি তো দেখনি কারো শৈশব কৈশোর
প্রাণের গৌরব কারো যৌবন এড়িয়ে
তুমি ভাব প্রৌঢ়ে দেবে পা হে শূন্য শ্রদ্ধেয় পুরুষ
বার্ধক্যও ভাগ্যে নেই, তুমি নেই—
তুমি দশ নেই
শুধু দেশজোড়া এই রয়েছে মানুষ
বেঁচে আর মরে এক ও অনেক।

কেন বলি নিন্দনীয় ? দুর্বোধ তোমাকে বলি সাধে !
নিয়মিত দিনরাত্রি, সচ্চরিত্র ভদ্রলোক তুমি,
ফৌজদারি করনিকো, ধরেনি তোমাকে ফরিয়াদে,
নির্বিঘ্নে সংসার করো, সৌভাগ্য সুন্দরী স্ত্রীর স্বামী,
সৌভাগ্য বাজার দরে আজো তুমি হওনিকো কাবু।
অথচ বণিক যদি বলি তবে সেও সত্য নয়,
মন্ত্রিত্বে কামনা নেই, আপাতত দেশভক্ত বাবু
কারণ তোমার পক্ষে সরকারে তদ্‌বির শক্ত নয়—
আপাতত দিন যায় পরিমিত সংস্কৃতিসম্ভোগে
আনন্দ অমৃত পড় নিত্য পড় নেশন স্টেটসম্যানও !
ফুটবল ক্রিকেট দেখ, ধরোনিকো আজও ঘোড়ারোগে
সিনেমায় সপ্তাহ যাও চারবার কেবল, এহেন
সাত্ত্বিক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সিগারেট একমাত্র নেশা
কদাচিৎ মদ্যপান সময় কাটানো যার পেশা—
তুমি কি দেখেছ ক্রিট ; সাততলার ঐশ্বর্যে আদিম
ভাসতে পেরেছ
গিয়েছ কি মহেনজোদারোর ভিতে
কঙ্কালে সমৃদ্ধ সেই নালায় সিঁড়িতে

কুবলাই খানের সোনা প্রাসাদের তক্তের পিঁড়িতে
সেঁদিয়েছি সম্ভারে তুমি স্বপ্নেও কি হাসতে পেরেছ
পায়াভারি শাতোয় কাসলে কিম্বা কোম্পানি কার্টেল ট্রাস্টে
পেয়েছ আপন নাম ?
প্রাদেশিক, গ্রাম্য, তুমি নেহাত মাঝারি
তুমি তো কিছুই নও ধনা নও এমন কি নও তার ছবি
নও তুমি ভিখারি পথিকও।

তুমি নও সাধারণ জনসাধারণ দেশের জনতা
দশ তুমি, মুষ্টিমেয়, টানাটানি, তবুও ধনীই ?
নেতৃস্থান তোমাদেরই ? মন্ত্রিত্বের কানাকানি হাতেরই ক্ষমতা
যখন যে খেল্ চাও, তুলে ধরো রাহু বা শনিই।
ভারতের মাথা, সেই মাথাই কি আজ টলোমলো
বাংলা বিহার থেকে দিল্লি চলো সুদূর পঞ্জাব—
তবে এত ট্যাক্সো কেন, কীইবা নগদ আর বলো।
দিন আন দিন খাও, তিনদফা ফেঁদেছ হিসাব—
চলেছ যে কোন্ স্বার্থে, বেঁচে আছ কিসের পিয়াসে
আমি জানি ইতিহাস টাইরেসিয়স

আমার দুচোখ অন্ধ, আমি শুধু অন্ধকারে দেখি
অতীতের কাদা আর ভবিষ্যৎ বারিশে কাদায়
বোজানো ডোবার জল
তোমাদের প্রাণের পল্বলে মানুষ বাঁধে না বাসা
স্রোতের বিস্তার নেই
মাছও নেই, কাদা, ধুলা, মরা ব্যাঙ
রৌদ্রে শুকায়
তোমাকে দেখেছি, নেই তোমার নিস্তার ॥

## হাওড়া ব্রিজ

এ তবু জাহাজ নয়,
মাস্তুলে মাস্তুলে ক্রেনে ইস্পাতে কংক্রিটে
সাঁকো শুধু, ভিটে নয়, বাসা নয়,
জীবনের ঘাঁটি নয় ;
জলাচারহীন, হাওয়ায় ঝোলানো শুধু,
এপাব-ওপার লোক চলাচল করে
মাটি থেকে মাটি ;

তলায় জলের স্রোত জোয়ারে ভাঁটায়
খরস্রোত কালস্রোত যেন,
যায় এক মোহানায় পলিতে পলিতে,

এবং উপরে—উপবে তো সাঁকো শুধু
এপার-ওপার সারাদিনরাত কবে
অবিরাম আনাগোনা
জীবনের স্রোত
যায় কোন মোহানায়, কোন্ ভাঁটিতে ?
দেশবিদেশের স্রোত
প্রত্যহের সপ্তাহের পালাপার্বণের
জীবনের মরণের নাকি বুঝি মবণের জীবনের,
জীবিকার, জীবিকাহীনের, উদ্বাস্তুব. বুভুক্ষুর.
উন্নাসিকেরও, কদাচিৎ আমির ওমবার—
সর্বদাই হাওয়ায় কে যায়—
জনস্রোত চলে. কাজে বা অকাজে. ঘরে,
প্রত্যাশী সকালে. মধ্যাহ্নের শোথে. সান্ধ্য ব্যর্থতায়,

এ তবু জাহাজ নয়, ঢেউয়ের মিছিল নয়,
জলচলহীন,
সাঁকো শুধু, এপার—ওপার জলে,
চলে শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, গ্রামে ও শহরে,
গ্রামের সন্ধানে, শহরের অন্বেষণে প্রতিদিন,
পশ্চিমে, বাংলায় ॥

## যম-ও নেয় না

তুমি তো দেখেছ তাঁকে ? আমাদের বুড়ি ঠাকুমাকে ?
পেয়েছেন বহুতাপ, দেখেছেন বহুপাপ, মৃত্যুও অনেক,
তবুও অম্লান প্রাণ, শুভ্রকেশ সৌন্দর্য আরেক
মর্যাদার, অনেক দেখার রূপ ; অথচ সবাকে
নির্বিশেষ মমতায় সংযত উদ্বেগে উপদেশ,
সহ্যের অম্লান প্রজ্ঞা নেভেনি বৃদ্ধার জরায়ণে,
সততার আশা দীপ্ত শীতের আকাশ সে নয়নে,
হিরণ্ময়ী, নিরুপমা, উপমা কি ? খুঁজেছ স্বদেশ ?

যম নাকি ভয করে, যম নাকি দূরে রাখে তাঁকে !
সাতছেলে সব গেছে, কেউ দূর কমিশরিয়টে,
কেউ বা লক্ষ্মীর খোঁজে গদির তলায় চাপা কবে,
কারো নামে কানাঘুষা বাজারে খারাপ কথা রটে,
সবাকে নিয়েছে যম, শুধু একজনার গৌববে
তল্লাসিরা হানা দেয় আজও, ঘবে পায় নাকো তাকে,
কখনো নন্দিত বন্দী, সর্বদাই দেশ যাকে ডাকে,
যে ছেলের মুখ দেখে যম-ও নেয় না ঠাকুমাকে ॥

## আমি তো গাঁয়ের লোক

আমি তো গাঁয়ের লোক
দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ খুঁজি প্রায় প্রতিবছরেই
ইঁদুর শেয়াল দেখি গ্রামে গ্রামে আড়তে খামাবে
প্রতিদিন শহরে শহরে
অন্ধ লোভী এবং নির্বোধ অশ্রুময় কুমিরের শোক ।

আমাদেরও সন্ধ্যায় বিষাদ
ব্যর্থতার কুয়াশায় ধুলায় ধোঁযায়
আমাদেরও সূর্যাস্তের ক্লান্তির কাহিনী এক কান্নার আকাশ
প্রতিদিন সূর্যোদয় পুনরাবৃত্তির আশা আর অবসাদ
অবসাদ আর আবার প্রয়াস আব প্রতিবাদ আশা

আমাদের নদী যেন কান্নার কোটাল কিম্বা
কখনো বা শূন্য চর বাংলার
তারই দুই তীরে তীরে বেয়ে চলি প্রতিদিন দিনগুলি
আমরা গাঁয়ের লোক
সকালের স্তব্ধতায় সন্ধ্যার বিষাদে শূন্য চর বাংলার ।

কলকাতার শীতসন্ধ্যা দেখেছ কি টেনেছ কি ঘ্রাণে ?
মৃত্যুর আকাশ এক
নেই সেখানে তো নেই
সন্ধ্যার বিষাদ কিম্বা গম্ভীর স্তব্ধতা
সৌন্দর্যের বীজকম্প্র নিস্তব্ধ বিষাদে ব্যাপ্ত

এখানে তো চোখে কানে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে ফুস্‌ফুসে হৃদয়ে
শুধু মৃত্যু আর মৃত্যুর প্রলাপ
আর কবন্ধ শবের কোটি জীবাণুর উন্মাদ সংক্রাম
ভিড় গোলমাল এসপ্লানেড্‌ ডালহৌসিতে
ধোঁয়ায় ধুলায় বিষণ্ণ বন্ধ্যার সন্ধ্যা

মুখচাপা বুকচাপা অর্থহীন জীবিকার ভিড় অবিরাম
অসহায় ক্লান্ত জীবনের অবাস্তব উদ্দেশ্যে উধাও
সারে সার সারে সারও নয় এলোমেলো
আকস্মিক অসহায়
অসম্বদ্ধ পাশাপাশি নিঃসঙ্গের ভিড়
পায়ে পায়ে সারে সার ট্রামে বাসে
কাতারে কাতারে ভিড়
কেউবা সচল কেউবা অপেক্ষা করে

কলের মজুর যেন কাছারির চাষি যেন
তাও নয় বেলগাড়ির জন্তু যেন আড়ঙের মাল যেন
লাখো লাখো দেশেরই মানুষ
মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শিক্ষিতও অথচ মানুষই নয়
কলকাতার ভাবখানা এই
লাখো লাখো লোক বৃদ্ধ প্রৌঢ় যুবা মেয়ে
ক্লান্ত এক অর্থহীন নিরুদ্দেশ জীবিকার দিনশেষে
করুণ মলিন

অথচ নীরব সব মুখচাপা বুকচাপা কান্না নেই
উদাস শালীন অপ্রাকৃত

তারই মাঝে থেকে থেকে বিরাট মোটর
চলে যায় হুস্ করে এককোণে সাহেব নহুষ

কিম্বা বাবু-ই
ঊর্ধ্বগ্রীব এলায়িত
যেন চোখ কান নেই, যেন নেই দুইধারে
হাজার হাজার ক্লান্তিময় চোখ কান
ঘরমুখো ব্যর্থের আশার
শুকনো চোখ লালদিঘির ঘোলাজল হ্রদে

লালদিঘির পাপ ধুয়ে আমরা পৌঁছাই
প্রতিবাদ মুঠিতে মুঠিতে গঙ্গার ধারের পরিষদে
পোড়ো দেশ শূন্যচর বাংলার প্রাসাদে প্রাসাদে
আমরা শহর চাই গাঁয়ে গাঁয়ে আরেক শহর
আমরা সবাই আমরা গাঁয়ের লোক শহরের লোক
আর এক কলকাতাই ৷৷

## একজন দুঃস্বপ্ন

তাকে ঠিক চিনি নাকো, তবে তাকে দেখেছি দুবার

সে এক অদ্ভুত দেশ, গ্রাম নয়, শহরও নয়তো
জানি না কী ঠিক নাম, নামধাম নেইবা হয়তো,
আসলে সে দেশই নয়, কর্মময় সচল উদার
জীবনের গান নেই , অথচ রয়েছে মরা নদী,
রয়েছে পাহাড় কালো কষ্টি দিয়ে মুড়ে দুই পাড়,
আর আছে আবিজোনা থেকে কার দুহাতে উজাড়
উৎকৃষ্ট ক্যাকটাসে ঘেরা বাঁকা পথ, যেনবা ত্রিপদী
ছন্দে নয়া কোনো মোহমুদ্গরের নতুন বিলাস ,

তারপরে ইমারত মাটির ভিত্তিতে আজও পাকা,
কালের অশ্বত্থ ছাপ দেয়ালে পড়েনি বটে ঢাকা ;
শূন্য বাড়ি, তারই মাঝে একঘরে একা তার বাস,
চতুর্দিকে সাজিয়েছে ছোটোবড়ো হাজার মুকুর--
জানালা দরজা সব আছে বটে, আছে আলোহাওয়া,
কিন্তু পরোক্ষ সবই, আয়নায় কবে আসা যাওয়া ;
দৃশ্য রুদ্ধ, শব্দ চাপা, আপনাতেই সদা থাকে চুর।

দিব্যমূর্তি বসেছিল, জামেয়াবে চিত্র এক আঁকা ;
তৎসৎ . চৈতন্যের শূন্যে দ্বীপ ! নিরালম্ব নীলে
জীব বস্তু বীজ দ্রব্যে প্রজননে স্বেদাক্ত নিখিলে
মৃত্তিকার প্রাণময় ভিড়ে একা, অমাবস্যা রাকা !
উদাস গলায় বলে, দ্বারে কে ও ? চাই না আকাশ,
সো'হম , জানি আমি, আমি ছাড়া সবই নঙর্থক,
আমিই বস্তুর বিশ্ব বস্তুবাদী আমিই ভুঞ্জক,
জানালা দরজা সব আছে বটে, তবে সবই ঢাকা
চতুর বিন্যাসে দেখ সংগঠনে কোথা আছে ফাঁকা,
অথচ নিঃশ্বাস চলে, দাসদাসী আনে লেহ্যপেয়,
আমার জীবন তাই যুক্তিনিষ্ঠ স্বপ্রতিষ্ঠ শ্রেয়,
আমারই আকাশ আমি, নিজে কবি নিজেবই তর্পণ
আমি ব্যক্তি, আমি সঙ্ঘ, বস্তুবিশ্ব আমারই দর্পণ।

পালালাম ভয়ে ভয়ে, মৃত্যু দেখা জীবিত সমাজে !

তারপরে বহুকাল বাদে ফের গেছি ও অঞ্চলে
ভাবলাম কে জানে কী মুকুরকুমার আজ বলে।
কাজ সেরে তাই যাই, ভাবি আজ দেখব কী সাজে
বিশ্বলোপী সাধকের ব্যক্তিস্বর্গে দর্পণ-দ্রষ্টাকে।
নদীতে সচ্ছল স্রোত, দেখি পাড়ে সবুজ ভেড়িতে
চাষাবাদ, পাহাড়ের থাকে থাকে এলাতে গেরিতে
মানবিক এ নিসর্গে বিস্ময় তাকাই, কে স্রষ্টা কে ?
ক্যাক্টাসে ফুটেছে ফুল, বহু গান ভেসে আসে ধীরে-
হঠাৎ ঘনায় মেঘ ! কতো ঘব পার হয়ে পরে
দাঁড়াই আয়নার কেল্লা কুমারের পুরানো সে ঘবে--

চমকে দাঁড়াই, একী, যেন কোনো বৈতরণীতীরে
মেগালোমেনিয়া স্বপ্ন-মূর্তি ধরে—প্রতিটি মুকুর
চিড়-ধরা ফাট্‌ধরা, যেন সূর্যরশ্মির বল্লমে,
যেন কারা হলের ফলায় রূঢ় বেশীর বিক্রমে,
যেন কারা মিছিলের শব্দঘাতে করে গেছে চুর ;
অথচ দর্পণ সব রয়ে গেছে সাবেক বিন্যাসে,
শুধু শত প্রতিফলনের আলো ঠিকরায় ছায়া—
তারই মাঝে মায়াময় মানুষের শুষে সব মায়া
মুকুর কুমার বসে দেখে যায় সাবেক অভ্যাসে,
হাজার কুমার দেখে, প্রত্যেকেই বিকৃততির্যক ;
হাজার গলায় বলে, নঙর্থক সবই নঙর্থক
আমি নেই, কিছু নেই, আমাতেই হাজার বিভেদ,
অথবা আমিই আছি সম্পাদ্য ও নিজে সম্পাদক,
হাজার খণ্ডিত বস্তু আমারই তো, তাই নেই খেদ—

আরো কতো বলেছিল শুনিনি সে আপন তর্পণ ।
দুলে দুলে এল হাওয়া কার্তিকের ঝড়ের হাসিতে,
মনে হল মৃত্যু যেন মুষ্টি হানে প্রাসাদের ভিতে,
প্রচণ্ড আওয়াজে বজ্রে ভেঙে পড়ে তত্ত্বের দর্পণ ॥

## অক্টোবর দিনগুলি

(শ্রীমান নবযুগ আচার্যকে।)

তুমি কি আসবে ? আসবে কি তুমি
ধুয়ে বনভূমি পাঁচ পাহাড়ের
মাথা ছুঁয়ে ছুঁয়ে নীলাম্বরীর
আঁচল ছড়িয়ে নদীর পাড়ের
গেরিতে মেলাবে স্বচ্ছ শরীর ?
ভাসবে এলা-য় আউশের খেত
হাজার জমির সীমানা সমেত
আল্‌ ভেঙে ভেঙে আমনের পাকা
হালকা আলোয় হাসবে কি তুমি ?

আমার দিনগুলি হাজার ঢেউ
গ্রামে গ্রামান্তরে শহরে যায়
কখনো মেঘে মুড়ি চেনে না কেউ
কখনো রৌদ্রের প্রবলতায়।

পাহাড়ে পাহাড়ে সমুদ্র গড়ি
সোনাখচা বনে লোকালয়
প্রকৃতিতে গড়ি সমাজের বরাভয়।

ঊর্মিল কর্মের দিন উড়ে চলে হাওয়ায় হাওয়ায়
এ আকাশে বাসা তার জীবনের সমুদ্রে উদার।
জীবনে স্বপ্নের ভিড়ে তাই মিলে যায়।

সুদূর বন্ধু, বিশ্ব মিলালে হাতে
তোমার প্রভাত বিলাও আমার রাতে
তোমার বীরের প্রত্যয়ে হোক মুকুলিত প্রত্যাশা!

লাসের কতো না কাজ, জবা ও গোলাপ
এ আকাশে দীন অপলাপ।
এদিকে তুষার রাশি যন্ত্রণায় শুভ্রকেশ
মেঘ হয়ে ওড়ে
ওদিকে পাহাড় আর কালো মেঘ মাতে মন্ত্রণায়।
কোথাও বা ইন্দ্রনীল
কোথাও বা স্ফটিক আকাশে লাগে
আমনের পান্নার আবেশ।

আমরা মানুষ তবু চাতকের মতো ঊর্ধ্বমুখ
মাটির মানুষ তবু চোখ কান আকাশবিহারী
আমরা মানুষ তবু মেঘ রৌদ্রে বাঁধা দুঃখ সুখ।

কোথায় কোথায় গেল আশ্বিনের পুবালি বাতাস!
জলেস্থলে এনে দাও কর্তৃত্ব অপার।
লাখো হাতে ইন্দ্রধনু ভেঙে গড়ি আকাশ-পৃথিবী।

সবুজে বেঁধেছি দুই চোখে আজ ধুয়া
রসালো সবুজ কাঁচা খেতে, আঁকাবাঁকা
খোদাই সবুজ মাঝে মাঝে ঠায় শাল বা তমাল মহুয়া

কোথাও বা দেখি সবুজ আমনে লেগেছে সোনার আভা
নীলে আর লালে গেরিতে এলা-য় সবুজ কী গান করে !
শতেক গন্ধ হাওয়ায় হাওয়ায় মেলায় ।

গোলাপ আর তো ঝরে না সান্ধ্য ক্লান্তিতে
আমার আশার শিশিরে শিশিরে শান্ত
তোমাতেই তার উদয়-অস্ত হৃদয়ের লাল কলাপ ।

অশেষ বাহার ! শরতের মাঠে কতো বিচিত্র ফুল
রঙের বাহার ! এক সুযোগের হাজার আকার ফুল !
তুমি চলো লঘু তন্বীর পদপাতে ।

তবু নামে অন্ধকার ।
এক ঝাঁক টিয়া গেল, কৈলাসের আবেগবিধুর
চলে গেল শব্দময়ী অপ্সর-রমণী
বলাকার শুভ্র পক্ষধ্বনি,
একে একে গগনভেড়ের সাঙ্গ হল অভিযান ।
অন্ধকার বনে গেল তিতিরের গান,
চলে গেল নিঃশব্দ বাদুড় ।

এ সন্ধ্যায় আকাশ পালায়
বিষণ্ণ গ্রামের সন্ধ্যা অভাবে মলিন
শহরে উদভ্রান্ত সন্ধ্যা ক্ষতে ক্ষতে লীন
উদ্দাম যুবাব বোগ যেন ।
এ আকাশ ধুয়ে দাও স্বাধীন সন্ধ্যায় ।

গ্রামীণ এদেশ শহরে শহবে শুধু গ্রামভাঙা বস্তি,
আর গ্রামহানা শহরের শেষ কবন্ধ চির আকালে ।
বিদেশী ভাষায় শুনেছি লোভের শাসনে চিরটাকাল
শ্বেত হস্তীর নিত্যশোষণ, প্রতিদিনই তার মস্তি ।

তোমার মুখের আশ্বাসে পাই আশা
জীবনের মূক ত্রস্ত আঁধারে ভাষা
তুমিই আমার জীবনের বিশ্বাস ।

গোলাপ আর তো খোঁজে না প্রভাতী ঊষাকে
দিনরাত্রির প্রগল্ভতাও অচঞ্চল
তোমাতেই স্থির সম্বাদী নিঃশ্বাস।

নেমে এল একাকার গোধূলির পটে বর্ণহারা
স্বচ্ছ অন্ধকার, একটি তারকা ভালে,
জীবন মৃত্যুর নীল শূন্যে অগ্রদূত,
সকালের শুকতারা, লালতারা আসন্ন সন্ধ্যার ।

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, তার
সোনার কবরীখসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব করে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া
পরিচ্ছন্ন ধূমে ।

পৃথিবীর গান শত মুখে মুখে উন্মুখর
মাটির শিকড়ে গন্ধের শত মূর্ছনা
ঘ্রাণে ঘ্রাণে একী অর্কেস্ট্রায় বুক ভরে দেয় দিনরাত !

কখনো তীক্ষ্ণ ভিয়োলা সবুজ ধানে
কখনো বেয়ালা পাকাধানে বাজে তীব্র মুক্ত ছন্দে
ঘাসের চেলোয় মেলায় দোটানা মন্দ্রে
ফুলের তেরোটি মূরজ মুরলী থেকে থেকে পশে মর্মে
তারই মাঝে মাঝে এক পশলার মৃদঙ্গ বাজে হাওয়ায়,
আমাদেরও সব ডাক দিয়ে যায় পৃথিবী ঐক্যতানে ।

দুহাতে হৃদয়ে ম্যাগনোলিয়াকে রাখো,
ছিন্ন হৃদয়ে হৃদয়ে পৃথিবী একটি যে হাহাকার,
দু-হাত তোমার রক্ত গোলাপে ঢাকো ।

শহরে শহরে কোনোই আরাম নেই
গ্রামে মানুষের একটুকু দাম নেই ।
কঠিন জীবন ! তবুও প্রকৃতি তাকিয়ে প্রতীক্ষায়
তাই তো আমরা মিলেছি এ দীক্ষায় ।

মধ্যনীলে একরাশ মেঘ
এখনো ভাস্বর, আপন আবেগবাষ্পে সংহত বিদ্যুতে
আমৃত্যুঅম্লান, তোলপাড় সূর্যবহ মরিয়া সম্বিতে ।

দিগন্তে দিগন্তে দূর জীবনমৃত্যুর পারে পারে
ও কি পাহাড় চেয়েছে মেঘ হতে ?
নাকি আচম্বিতে হল মেঘই পাহাড়
আরেক নির্মাণে ?

হাওয়া চলে গেল পুব দিকে পশ্চিম
ফসলপাকানো সাঁঝ সকালের হিম
ঢোল থেমে যায়, ঢেঁকিশালে পড়ে তাল
সর্ষের খেতে ঠিকরায় আলো, গলিতে শিহরে নিম ।

টিলার ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাঠের মরকতে
কুল্‌থি-খেতে আর হঠাৎ লালে লালে
চোখের চলা চলে রঙিন পথে আলে
মনের সুর খোঁজা জীবনে জনে জনে
দুস্থ কুটিরের শুকনো ফুটো চালে
দুঃখী শহরের বেসুর গতে গতে
এই যে নীলা এই স্ফটিক ক্ষণে ক্ষণে
শিশির সজলতা হাওয়ায় আশা ঢালে
এতেই জীবনের স্বপ্ন গুঞ্জনে
উদার সংগীতে মেলায় একমতে ॥

## অথচ সহজ খুঁজি

'অথচ সহজ খুঁজি'
সুদীর্ঘ প্রান্তর, খাড়া চড়াই উতরাই,
গহীন অনেক গাঙ, গভীর জঙ্গল, শূন্য খেয়াঘাট,
কখনো বা কলরবে উচ্চকিত বাজার গহন,
কোথাও বা হাট,
সর্পিল নিস্তব্ধ পথ,

তারপর পথও বুঝি নেই—

গহন জঙ্গল, খাড়া চড়াই উতরাই,
সর্পিল কন্দর, অন্ধকার বনপথ,
হয়তো বা পথও নেই, হিংস্র কলরব
আশেপাশে, পিছে পিছে ছায়া আর প্রতিধ্বনি,

দুর্গম শিখর, দুর্গম সে সহজের চূড়া দুর্গম কঠিন

পায়ে পায়ে চমকাই
পায়ে পায়ে চোখে কানে মৃত্যুকে ডরাই থমকাই,
অথচ সহজ খুঁজি
অথচ যেতেই হবে অবিশ্রাম নিদ্রাহীন
দেখি তার ছবি সেই চড়াই উতরাই

সেই দুর্গম শিখর
মনে মনে গায়ে তার কেটে কেটে লিখে যাই নাম

তারপরে হঠাৎ শিখর
আকাশের পাশাপাশি,
মসৃণ পাথর যেন ত্রিকালে মসৃণ
রৌদ্রে জলে জ্যোৎস্নায় হাওয়ায় সংগঠিত
যেন ইতিহাস সম্বৃত পাথরে
একটু বা স্বচ্ছ ঘাস দূর্বাদল শ্যাম
ঝরনার নয়নাভিরাম নির্মল ইঁদারা
হাওয়ায় হাওয়ায় লঘু রৌদ্রে প্রাণের আরাম

মুক্তির সংরাগে
আর চোখে চোখে জাগে কানে বাজে
আসমুদ্র হিমালয় যেন
স্বচ্ছ ও নির্ভয় সহজ হাওয়ায় উদ্ভাসিত

শিখর সহজ বটে শেষে, হালকা হাওয়ায়,
আজো সে দুর্গম, পায়ে পায়ে মৃত্যু প্রতিদিন,
পৌঁছলে সহজ লাগে জীবনের মতন সহজ
সেই তীব্র দেশে

বরঞ্চ তোমার কথা বলি
সহজে তো তোমাকেই খুঁজি

দিনে দিনে বিকালে সন্ধ্যায়
বৈশাখী আবেগে হিম মাঘের বৈরাগে
চৈতালির পূর্বরাগে বছর বছর
তোমাকে সেধেছি কতো সুর যেন দেহমনে
কতো না সংরাগ ফুটিয়েছি জীবনের
আলাপের কতো ফুলে ফলে

কিম্বা, চলেছি কতো না কর্ম্মময় অবসর দিন কতো
কতো রাত্রি জেগে ঘুমে স্বপ্নে তোমার সন্ধানে
চোখে তুমি মহাশ্বেতা যেন নন্দাদেবী
কানে তুমি সর্বদাই কন্যাকুমারিকা যেন নীল উপল-উর্মিল
চলেছি জীবনে কতো তেপান্তর হাটঘাট পার হয়ে
চড়াই উৎবাই বেয়ে ক্লান্তিহীন একাগ্র তন্ময়
তারপরে—
হঠাৎ শিখর
তোমাব চোখের স্বচ্ছ সহজ হাওয়ায়

অথচ শিখর প্রতিদিন
যাত্রাও অশেষ নববিশ্বে
মেঘ যেন মেঘে মেঘে হাওয়ায় শিখর দূর প্রতিদিন
প্রতিদিন অভিযান গার্হস্থ্যেব পূর্বরাগ প্রতিটি প্রহব
দুর্গম দুর্জ্ঞেয় প্রেমে একান্ত অমোঘ
গ্রহণে ও দানে উভয়ত
তবু একাকার নয়
প্রতিদিন বারবার দুর্গম শিখর যেন পৃথিবীর পাললিক স্তর
যেন যাত্রা আর যাত্রাশেষ আর আবাব প্রয়াণ
যেন বা স্বদেশ যুগে যুগে অর্জিত যে

প্রতিদিন বাববার তোমার সন্ধান
চাওয়া আব পাওয়া আর চাওয়া
কোনোদিন ঘরে আসা ঘনিষ্ঠ ছায়ায়,
কোনোদিন আত্মদানে সুরের ঝড়ের হাওয়া,

কোনোদিন উন্মনা বা অবসন্ন.
দূর ও দুর্জ্ঞেয় কোনোদিন,
কখনো বা বিরুদ্ধেই প্রচ্ছন্ন বা স্পষ্টতই
শরীরে বা মনে কখনো বা শরীরে ও মনে

প্রতিদিন সুব সাধা প্রতিবাদে ঘনানো সম্বাদ
পিলু বা খাম্বাজ কিম্বা
দীপক মল্লার কিম্বা মালকোশ পরজ
একই সে খাদ নিখাদের নিত্য নব কঠিন বিন্যাসে নতুন পর্দায়
সরল বঙ্কুর সুর বুঝি
অবিশ্রাম
দুর্গম শিখর তুমি কঠিন জীবন

তোমাতে শিখরে
কঠিনে সহজ খুঁজি কঠিন সহজ ॥

## তিনটি ছোট কবিতা

তোমাব নামও নেই

আজকে সংবাদ তুমি কোটালের বান কিম্বা ঝড়,
কিম্বা ভূমিকম্প কিম্বা মানুষ-খেকোর হন্যে
সংবাদ, যেমন তুমি এই বাঁধো কোরিয়ায় গড়,
ইরানে কাম্বোজে যাও, সংবাদ সন্দেহ নেই, ভাবো তাই জন্যে
আমরা করব নাম এমন-কী ভয়ে কিম্বা ঘৃণায় অস্থির ?
তোমাকে ভুলবে লোকে কাল কিম্বা পরদিনেই, অটল অনড়
কালের পাহাড়ে শুধু পড়ে থাকে দুই কড়ি তোমার অস্থি-র—
তোমার নামও নেই রাত্রির দুঃস্বপ্ন, দূর প্রত্ন তুমি জড় ।

পোড়ো জমি চষে শেষে স্বত্ব জমে লাট—কি বেলাট,
সে সন্ন্যাস তবে ছদ্মবেশ ?
পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অন্তিমে কি লর্ড এলিঅট
ওএস্টল্যাণ্ডে চষে নেন আপন স্বদেশ ?
তাই তো বলেছে শাস্ত্রে সদা আছে ভয়
বিড়াল তপস্বী হোক, নয় মহাশয় ।

স্টেটসম্যানিকিন

কুম্ভীরাশ্রু প্রায়ই ফেলে, কুমির সে নয়, সে মণ্ডুক,
বাদাব ইঁদুর কিম্বা ক্লাইভের খোলার শম্বুক ।
ক-ইঞ্চি কলম চলে, ভাবে বুঝি সমুদ্রের তিমি---
কিম্বা যেন অজগর হল ভাবে জলুকা বা ক্রিমি,
স্টেটসে তার যাওয়া আসা তাই বুঝি ভাবে ম্যানিকিন
তোমার পায়ের নখ কেটে দেবে, তোমারও, স্টালিন ।
ধূর্ত জানে বজ্রঘোষে ইস্পাতে কে কাটে কবে তাকে—
কাদায় থাকতে দেয় শামুককে কিম্বা জলুকাকে,
কিম্বা আসে যায় ভুয়ো বাম ঘরভাঙা চালে তার ।
উই আর ইঁদুরের সবাই তো জানে ব্যবহার ॥

## জ্যৈষ্ঠের ট্রিয়োলেটগুচ্ছ

(কবিতা সম্পাদক সমীপে,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি —
প্রগতি কি মনে আছে ? ট্রিয়োলেটগুচ্ছ
জ্যৈষ্ঠে বিকালে মনে হয় অতি তুচ্ছ ।
যদিচ জীবনে বহু ধূমকেতুপুচ্ছ
আছড়ে গিয়েছে, ট্রিয়োলেটে তবু ভাবি,
জ্যৈষ্ঠে বিকাল মনে হয় অতি তুচ্ছ ।
লেখা চেয়েছেন, আপনার আছে দাবি !)

কবে থেকে বলো হলে বুর্জোয়া
চাকুরে বামনে ধরবে চাঁদ !
তোমার কি সাজে পশ্চিমা হাওয়া
কবে থেকে বলো হলে বুর্জোয়া
বৃথা ইতিহাস, বৃথা ধামা বওয়া,
ব্রিটিশ ভারতে এই তো ফাঁদ ।

রাজনীতি নয়, নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি
দিয়োনাকো কান প্রাণসমুদ্রগর্জনে ।
লাল ভল্লুকে দূরে রেখো, সে যে বিষম ভীতি,
রাজনীতি নয়, নীতি নয়, শুধু সংস্কৃতি,
হাড়ে-হাড়ে শুনো র‍্যাটল সাপের অচিন গীতি,
সার্কাসে নেচো সিংহের পোষা তর্জনে ।

তোমার প্রতি বিধি শুনছি কেমন বাম,
ডাইনে বাঁয়ে তোমার চালে হাসিনি তাই ।
অবাজকের স্বপ্নে তুমি চাও আরাম,
তোমার প্রতি বিধি শুনছি কেমন বাম
অথচ কিছু পেয়েছ যশ অর্থকাম
তবুও কেন ওড়াও বুলি তুড়ি ও হাই !

আমরা খুঁজেছি বিলেতি বইতে আপন দেশ,
বারবার তাই দেশের মানুষ ডাইনে বাঁয়ে
ঘুরিয়েছি আর হয়রান হয়ে খুঁজেছি শেষ ।
আমরা খুঁজেছি হরেক বইতে আপন দেশ,
থেকে-থেকে বই হারিয়েছে, মোড়ে নিরুদ্দেশ
ভাবছি এবার ফিরব মোড়ল সে কোন গাঁয়ে ?

সেকালে মারতে রাজা ও উজির,
একালে তোমার এ কী এ বেশ !
প্রোলেতারিয়ার পাড়ছ নজির,
সেকালে মারতে রাজা ও উজির
ভেলকিবাজির ইডিওলজির
আড়ালে ঢাকবে ছদ্মবেশ !

ছেলেবেলা থেকে শুনেছে সে শিশু প্রেকশাস,
কান তার ভোঁ-ভোঁ থেকে-থেকে মাথা ঝুঁকি দেয়,
আমাদের ভাবে কুকুর বেড়াল কি খট্টাস,
ছেলেবেলা থেকে শুনেছে সে শিশু প্রেকশাস,
অকালপক্ক মনে শুধু তার সন্ত্রাস :
যৌবনঘোরে শৈশবই বুঝি উঁকি দেয় !

আত্মত্যাগের বিষম বোঝা যে ভাঙবে ঘাড,
আমরা তো নই বীর বরঞ্চ বলো বোকাই,
ত্যাগের ভারে যে মাথায় পড়েছে চরম চাড়,
আত্মত্যাগের বিষম বোঝা যে ভাঙবে ঘাড !
ছোটো-ছোটো বুকে অহংকারে যে গড়ো পাহাড,
ঈগলে খুঁজছ নিজেরই ছবি তো তেলাপোকাই ?

তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
নিজের জ্বালা লেখার স্রোতে ধুইয়ে দিক ।
অজাত মৃত মূর্খ নিয়ে কী হবে শোক ?
তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
এখানে আর ওখানে ডেকে সভার লোক
নিজেরই ছায়া কুস্তি করে শুইয়ে দিক ।
তোমাদের ঐ নীরব কবি মুখর হোক,
নিজের জ্বালা লেখার স্রোতে ধুইয়ে দিক ॥

## বালাদ্ : লুই আরাগঁ-র জন্য

ওরে আমার হৃদয় আমার খুঁজিস অস্থাবরের বাসা
মনের মানুষ ভাঁড়ার ফেলে করিস যে তুই সন্ধান !
অস্তাচলের পার থেকে ঐ উদয়গিরির নীলে ভাসা !
আকাশ জুড়ে উড়ে বেড়াস ক্লান্তিহীন, যে ধনমান
ভাসিয়ে দিয়ে কালের স্রোতে বনেদি চাল খানদান
শিবঠাকুরের আপনদেশে সদাগরের তক্তায়
চাপালি না রে—দুপারে গঙ্গা, ডরবি নাকি তাই বান,
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় ?

জাত খোয়ালি কুল ভাঙালি একী নেশা সর্বনাশা
রূপসাগরে ডুব দিলি তুই ভুলে রূপার সম্মান
সূর্যে সোনা খুঁজিস শুধু তুচ্ছ সূর্যমুখীর ভাষা
কালের কালো বৃন্তে ফোটাস উদ্ভিদে চাস প্রাণদান !
মানুষ দেখেই অন্ধ হলি—এবার যাবে গর্দান্
আখের তুই খোয়ালি হায় তোর মাঝে যে বর্তায়
ছোটোলোকের আকাশআশা সবাই হবি আইভান্
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায় !

অনেকদিনেব ছলাকলা পায়ে ঠেলে সাজবি চাষা
মজুর কি তুই ? আপন স্বর্গে কোথায় হবি গর্দিয়ান !
রুশ ধরলি ? ভুললি রে তিন পুরুষে ইংরাজির আশা
তারপব কী ? এখন তবে একলা ঘরে ধর গান
শূন্য ঘর শুকনো মন হোক না প্রাণ খান্ খান ।
বঞ্চনায় দুচোখ ঠাস বুলি ছড়াস, পস্তায
যদিই মন তখনই বল্, থাকুক বেঁচে ট্রুমান

সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায ।
সভ্যতার বড়াই গাই হে প্রভু কোলে দাও টান
আজ ইংরাজ যেয়ো না চলে জীবন বুঝি কস্তায়
রাঙায সাবা দুনিয়া জুড়ে, কাতরে ডাকি বুরিদান
সারাজীবন বিলিয়ে দিয়ে বাজার দরে সস্তায ॥

## ভিলানেল্

দিনের পাপড়িতে বাতেব রাঙা ফুলে
সে কার হাওযা আনে বনের নীল ভাষা ।
জোগায কথা তাই সোনালি নদী-কূলে ।

আলোর ঝিকিমিকি তোমার কালো চুলে,
উষার ভিজে মুখে দিনের স্মিত আশা,
দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙা ফুলে

পরশ মেলে মেলে তুমি যে 'ধব খুলে.
হৃদয় সে উষায় থামায় যাওযা-আসা.
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে ।

কে খোঁজে পথে আর কে ঘোরে পথ ভুলে
অস্ত গোধূলিকে কে সাধে দুর্বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের বাঙা ফুলে ?

ঈশান মেঘে আর ওঠে না দুলে দুলে
ত্বরিতে কাঁদা আব চকিতে মৃদু হাসা.
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কূলে ।

সে তরু এ হৃদয়. তুমি যে-তরুমূলে
বসেছ ফুলসাজে. ছায়ায দাও বাসা
দিনের পাপড়িতে রাতের বাঙা ফুলে ।
জোগায় কথা তাই সোনালি নদী-কলে ॥

## ক্লান্তি নেই

আমার স্বপ্নও অপবিসীম
আমার মনে কোনো ক্লান্তি নেই,
অথচ ডালে ডালে শুকনো হাহাকার,
অথচ মাঠে মাঠে অসাড় হিম.
আকাশে কান্নারও ক্ষান্তি নেই !

জীবন উদগ্রীব প্রতীক্ষায়,
প্রতীক্ষা, না এক মিশ্রসুর !
আকাঙ্ক্ষার নীলে রেঙেছে অঙ্গার.
চাওয়ায় পাওয়া মেশে সে ভিক্ষায়.
শরীরে মন মেলে মুঠিতে দূর ।

চাই না তুমি বিনা শান্তিও, .
তোমাকে চাই তাতে ক্ষান্তি নেই।
কৃষ্ণচূড়া বাঙে, সেও তো হাহাকার ?
আমারই হৃদয়ের কান্তি ও।
তোমাকে জেনেছে যে শান্তি নেই
জীবনে তার আর, সেই হীরাব ॥

## রথযাত্রা ঈদমুবারকে

তবুও ভরে না চিত্ত, বথযাত্রা লোকারণ্য ঘুরে
মেলায় মেলায় ঈদমুবারকে জনসাধাবণে
গায়ে গায়ে কোলাহলে ঈদ্‌গায মন্দিবে প্রাঙ্গণে
মেলে নাকো দেখা তার, কাঁসর ঘণ্টাব উচ্চসুবে
শোনা তো গেল না সেই হিরণ্ময় সত্যের আখর
যে কথা সদাই কানে যে স্বব পশেছে মর্মে ম ,ম।
তবুও ভরে না চিত্ত, কতো যাগযজ্ঞে ধর্মে কর্মে।
দেউলে মসজিদে ঘুরি, মেলে নাকো পবশপাথর।

বাসায় ভিটায় কতো কতো রাজভবনে ভবনে
কত ভোজ উৎসবের শামিযানা দেখে দেখে শেযে
আজ মনে হয আমাদের শ্মশান স্বদেশে
বাসর নরক হল একাকার। ভাবি মনে মনে
এ যেন বিরাট এক বিবাহ সভার আড়ম্বব—
শুধু নেই বধূ, নেই, সে গিয়েছে আউশের বিলে,
বর নেই, বর কোথা জগদ্দলে মুনিষ মিছিলে—
শূন্য বথযাত্রা ঈদ্, শূন্য যেন বিবাহ-বাসব ॥

## সেই তো তোমাকেই

কোথায় যাবে তুমি ? যেখানে যাও সেই
একই মাটি জল একই নীলাকাশ—
জন্মভূমি যেন, দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, এই গ্রামের থেকে যেই
ও গ্রামে যাও, তবু কোনোই ভুল নেই
বাতাস একই বয় একই নীলাকাশ ।
কোথায় যাবে তুমি ? দেশের তুলনাই
তোমাকে সাজে, যেন জন্মভূমি তুমি,

মাটি বা পৃথিবীই তোমার পটভূমি ।
কোথায় যাবে তুমি ? দুঃখে আমাদের
জীবনে আমাদের দুঃখে মান হার ?
প্রতিটি দিন তবু জ্বালার দীপে জ্বালি
তোমারই পথে পথে—কে কার জিত হার
ঘৃণার ঝারি ঢালি ধুলায় আমাদের,
বসুন্ধরা তুমি, ও গায়ে ধুলা নেই,
পথেই ধুলা শুধু, জীবনে আমাদের ।

জীবন ! সেও তুমি, যেখানে যাও সেই
আমার শ্বাস পাও, কোনোই ভুল নেই
বিশ্বে ছেয়ে দাও তোমারই পটভূমি
তোমারই মাটি জল তোমারই নীলাকাশ !
আলোর মতো তুমি যেখানে যাও সেই—
এ ঊষা থেকে যাও আরেক ঊষাতে,
আমরা দুপুরের জ্বালায় দুহাতে
সেই তো তোমাকেই ধরেছি, সে তুমি ॥

## আশ্বিন

যদি সে আসে, তবে আসতে দাও তাকে।

খালের স্রোতে স্রোতে চালাও বান শ্রাবণ বান,
তোমার-ও গলি হবে কান্নাময় আহা কান্নাময়!
কোথায় ফিরাবে যে চোখ বা কান, নিজেব প্রাণ
কী আর হবে ভেবে এই কি হয় বুঝি এই কি হয!

রাত্রি হবে শেষ, নিওন যাবে নিভে, আসবে দিন,
অমোঘ তীর সেই ছিঁড়বে শ্মশানের অন্ধকার,
তোমার কান্নায় ফুটবে কান্নাব অনেক ফুল,
কী হবে বুক চেপে, সিপাই ঘিবে রেখে বন্ধ দ্বার?
বানের মুখে শত পাইক বাখা সে যে খ্যাপার ভুল,
আসবে আসবেই বিরাট আকাশের যে আশ্বিন,
শ্রাবণ পাব হয়ে যদি সে আসে তাতে মেলাও গান,
তোমাকে মাড়িয়ে যে আসবে, লালপথ সবুজ মাঠ ছেড়ে দাও তাকে॥

## আত্মীয় সওগাত

মহেনজোদারোর পণ্যে ছিল কি তোমার বেচা কেনা
মাইকপের মাটিতে পাথরে?
জেঙ্গিস খানেব ঘোড়া ছুটেছিল তোমারও প্রান্তরে
তৈমুরলঙ্গ ছিল চেনা?
কিয়েফে কাঁসর ঘণ্টা বেজেছিল সন্ধ্যারতিকালে
দ্বাদশমন্দিরে যেন বাজে
পামিরেব পরপারে সমরকন্দ ফেরগানা রুমালে
হাফিজ পাঠাল বোখারা যে।

তবু সে সম্বন্ধে দূর জ্ঞাতি কিম্বা কুটুম্বসমান
লেবেদফ আসেনি তখনও
বাংলার; কলকাতার রঙ্গমঞ্চে ওঠেনিকো গান
জন্মেনিকো নবনাট্য কোনো।
নেভার অজেয় তীরে লেনিনের আগামী শহরে
কালিদাস পেল তো সম্মান
নতুন অমরকোষে দেবভাষা রুশ কণ্ঠস্বরে
বিজ্ঞানের পেয়েছে সন্ধান।

তবু সে আদিম স্মৃতি তখনও তো শরিকে শরিকে
ভুলে যেত রক্তের বন্ধন
আত্মীয়ে আত্মীয় হেনে কুবেরের প্রাসাদ চৌদিকে
গড়ে দিত মনুর নন্দন।
তারপরে নির্বাসনে প্রজ্ঞার ত্রিনেত্র নির্নিমেষ
জ্বেলে দিলে যুগান্ত আহবে
জাগল একটি দেশ তারপরে জাগে কতো দেশ
পৃথিবীর কুমারসম্ভবে।

চিদম্বরে সে কী নৃত্য জীবনমৃত্যুতে দুলে দুলে
মাতে যজ্ঞে বিশ্বজনগণ
কালিন্দীর কলরোলে কালের কল্লোলে ফুলে ফুলে
তারপরে কালীয়দমন।
মথুরা বা দ্বারকা বা অযোধ্যাই কিম্বা বৃন্দাবন
আজ যদি দুস্থের সন্ধ্যাতে
একই অমৃতপুত্র সহোদর আত্মীয় পালন
করে তবে এই সংঘাতে

আমরা যে প্রাণ পাই মিটিয়ে সে বুভুক্ষুর ক্ষুধা
কখনও ভুলি কি সেই দিন ?
তোমাদের আমাদের লেনিনের একই বসুধা
অগ্রজ তো একই স্টালিন ॥

## বারোমাস্যা

১

ভেসে যায় হাওযায় হাওয়ায় তাবা
তাবা বুঝি বৃষ্টিহাবা বৈশাখীব ঢেউ, হাওযা, মেঘ
তাবা গানেব পাখিব সুব, অগোচর,
দূব থেকে ডাক দিয়ে যায়
অস্পষ্ট ঝাপটে
ছাতে ছাতে হৃদয ওড়ায
দিনান্তেব পটে তারা রেখে যায় উষার শিশিরে বেলি জুই ফুলে
চক্রান্তির মরমর বাবতা দক্ষিণা হাওযায় ধীরে ধীরে
সমুদ্রেব গন্ধবহ হাতছানিব সুরে সুরে দুলে

তাবা নেই, কোথা তাবা বসন্তের সমুদ্রেব হাওযা
নতুন বছরে
তমাল বা তালীবনে বননীল আমাদেব
নারিকেল কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জরিত বসন্তের সেনা,
হৃদযে যাদের বিরাট সমুদ্র স্থির
শান্ত, রুদ্র, গভীর, সুনীল,
হাতে আনে আমেরু নিখিল উন্মুখব
বসন্তেব হাওযা কখনো চঞ্চল তারা কখনো মন্থব
দেশ হতে দেশান্তবে আকাশে আকাশে
দ্রাঘিমায় দ্রাঘিমায় বাধাবন্ধহাবা
কোথা তাবা ভেসে যায
সে বসন্তসেনা
কলকাতাব বাংলাব দক্ষিণেব হাওযা

বেখে যায় অরণ্যে রোদন কোন নগরে অবণ্য কোন উচ্ছিষ্ট সন্ন্যাসে,

বাজার বাগানে জাগে উন্মাদ করাল পঞ্জীভূত ভুলে
মরে হেসে খাঁচায় হায়েনা
চিতা চড়ে প্রাসাদ শিখরে
সিংহদ্বাব ভাঙে হাতি, সিংহাসনে আসীন শৃগাল

ফলাও লাঙ্গুলে
নেকড়ের পাল ছোটে তাই দেখে সদরে অন্দরে
বীভৎস চিৎকারে
দিশাহারা নিস্তব্ধ আকাশ
ঝড়ে ঝড়ে কোথা তারা দুঃস্বপ্নের সমুদ্রের পারে

হাওয়ায় হাওয়ায় আসুক আসুক তাবা ফিরে ফিরে
বৃষ্টিধারে
নবধারা জলে তাবা বৈশাখীর দীপকমল্লারে তারা
বৈশাখীর মেঘ তারা আমাদের সমুদ্রে
সে বসন্তসেনা ।

২

বাত্রি রুদ্ধ, নিদ্রাহীন, জ্যৈষ্ঠেব জ্বালা নিঃশ্বাসে --
যেন মৈনাকমন্থনে আকাশ বাতাস মূর্ছিত ।
রাতের পাখিও কবে না বা, স্তম্ভিত মন স্তব্ধতায়—
অর্জুন যেন অসম্ভব, অজ্ঞাতবাসে অন্ধকাব ।

শুনি নিশাচরও নীবব, চুবি বাটপাড়ি নাকি নগরে কম ।
সুন্দরবনে স্বপ্নে তাই বাঘে কুমিরের মিলিত গান !
কপিলাগুহায় গোপন ও কাবা ? স্বেদাক্ত গুরু অন্ধকার
জ্যৈষ্ঠের জ্বালা নিঃশ্বাসে বাত্রি রুদ্ধ নিদ্রাহীন ।

আকাশে একশো চুয়াল্লিশ, বাতাস বন্ধ একঘরে
বিধি নিষেধেব বজ্রআঁটুনি, অণুও বন্দী, গড়েছে ফেউ
ফশকাগেরোতে শৃগাল বেঁধেছে, গাঁটছড়ে ভালোমন্দ এক,
চোব বাটপাড় চেনাই যায় না, নিশাচবেরাই নীবব শুনি ।

বৈশাখী শেষ, নিরেট গবম, আষাঢ় বৃষ্টিধারায় গান
কবে যে ধবরে উল্লাসে বঁধু বৃষ্টিভিব উদ্বেজিতা ।
বৃহন্নলাব পাপ হবে ক্ষয়, পার্থ-সারথি নির্ঘোষে
নামাবে বন্যা----মাটিব হবিষে পুরবৈ এতায় নিন্দ যাই ।

কোথায় পার্থসারথি পৃথার পুত্র কোথায় পৃথিবী ডাকে ।
শোনো উত্তরা উত্তরে আর দক্ষিণে একই উষ্ণ মায়া ।
ঊষায় জাগাও ঊর্মিল হাওয়া সুভদ্র দিনে পাণ্ডু হাসি
তারপর ঐ পাঞ্চজন্যে ভাঙুক পাহাড় ভাঙুক পাহাড়
ভাসুক হাসুক কপিলগুহায় অমৃত আষাঢ় হাজার সাগর

৩

বৃষ্টি তো নয়, মুঠি মুঠি ঝরে আনন্দ ফুলঝুরি
মুঠি মুঠি মিঠা হিমকরকার প্রপাত
এলোমেলো হাওয়া আনন্দে এলোমেলো
প্রথম প্রেমের পাহাড়ে স্রোতের খাত ।
মহুয়াশুকানো মাস শেষ হয়ে এল
জামকাঁঠালের আমকাঁঠালের চির আকালের মাস,
বৃষ্টি তো নয় মুঠি মুঠি ধান ছড়া—
ওরে ও কানু কি ভাঙল দৈত্যপুরী !
সরস জীবন বয়ে আনে ভিজে হাওয়া
জীবনে স্বপ্ন ঝিমিঝিমি ঝুরু ঝুরু
সুন্দরদির পাগলা হাওয়াকে ধাওয়া
এই ফুলঝাবি এই বা শিকারিপাড়া
এ ও-কে হারায় মেঘে মেঘে গুরু গুরু
মত্ত মাদল, হাওয়ায় পালক ওড়ে,
কাঠে কাঠি বাজে শালবন মাঝে আষাঢ়ে মন্ত্রপড়া
মহুয়াগড়ির পাথরভাসানো হাসি
পালসিতে ফোটে সফেন বেগের তোড়ে ।
ও ময়ূরাক্ষী তুমিও এবার জাগো
নবজীবনের বীজবপনের বানে
ভাঙনে গড়নে দুই তটে তটে লাগো,
ত্রিকূটের জলে পবগনা বারোমাসই
বাঁচুক নাচের সচ্ছল সুখী গানে,
নাচুক নাচুক মেঘমালা মেয়ে যতো
দুহাতে ছড়িয়ে মুঠি মুঠি শাদা হাসি ।

৪

সেদিনও আকাশে ঘনাল বর্ষা
বাজে আর বিদ্যুতে
নেমে এল সে কি শ্রাবণের ধারা
প্রবল জীবন যেন

নেমে এল এক মুহূর্ত উল্লাসে
ভাসাল প্রাত্যহিকের কড়চা
মেশাল আপন সত্তাকে দূরে ঘাসে এনে ঋতুতে
নেমে এল বাধাবন্ধনহারা
দীর্ঘ জীবন যেন

প্রাণ পেল এক মুহূর্ত উদ্ভাসে
মাঠ বাট খেত পাহাড় ঝরনা একাকার উল্লাসে।
সেদিনই আকাশে ঘনাল বর্ষা
যেদিন তোমার আসা।

সেদিন সুদূর তোমার স্মৃতির প্রান্তরে দেশছাড়া
তবু তুমি জেনো সেই বর্ষার জল
আমার হৃদয়ে
স্বচ্ছ দিঘিতে আজো বর্ষার ভাষা
পাহাড়গুলিতে প্রবল শ্রাবণ যেন।

৫

হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
ভেসে যায় অহরহ
তবু সাধ যায় তবু কান যাওয়াআসা
কাছাকাছি যদি পাই শূন্যের বাসা
নিতাই আনি নানা ফল কাঁচা ডাঁসা
আনন্দে দুর্বহ

হাওয়ায় তোমার অস্তিত্বের ভাষা
শুনি আমি অহরহ।

তুমি আর আমি বুঝিবা বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা
তুমি চন্দনা ফুলের বনের শাখী
তোমার গন্ধ হৃদয়ে আমার মাখি
আমার বনের ফল এনে মুখে রাখি
শুনি নাকো দূর মানা
আমরা দুজনে দুইটি বনের পাখি
ঝাপটে মেলাই ডানা ?

তোমার আকাশ আমার আকাশে মেশে
সূর্যাস্তের গানে
তুমি কি ভাসবে কখনও আমার দেশে
ঢালবে কি সুর আমার ডাকের রেশে
আমার বিভাসে আসবে সাহানা বেশে
বলবে কি কানে কানে
তোমারও আকাশ আমার আকাশে মেশে
সূর্যোদয়ের গানে ?

সূর্যোদয়ের সূর্যাস্তের মিলে
সে কবে বাঁধবে দিন
আলো ঢেলে দেবে হৃদয়ের ঝিলমিলে
জীবন ছড়াবে মুক্ত এই নিখিলে
পাখির মতন স্বচ্ছ স্বাধীন নীলে
খোলা শৃঙ্খল-হীন
আজ হবে কাল, ভাদ্রে বাঁধবে মিলে
জ্বলজ্বলে আশ্বিন !

৬

যেতে হবে বহুদূর অজানা পাড়ায়
মোড়ের মাথায় কাছাকাছি এসে শুনি এসে গেছি প্রায়

বাড়ি তার খুঁজে নিতে হবে

তাড়াতাড়ি গলি এক বাঁয়
দেখে ঢুকি অন্ধকার অন্ধ চোরা গলি
অনেক শোষণে শুকনো হাড়ে হাড়ে শান
বাঁধানো সে গলি যেন সরু আঁকা বাঁকা
কেবলই ডাইনে বাঁয়ে

অনেক কষ্টের অনশন ও অনেক মৃত্যুর
ঘেঁষাঘেঁষি ইতিহাসে জরজর এদিকে ওদিকে
অন্ধকার বাড়ি সারে সারে বঙচটা চুনঝরাঝরা
মনে হল শেষ নেই অন্তহীন চলা

কেবলই ডাইনে বাঁয়ে অন্ধকার গায়ে গায়ে লাগে
ভাদ্রের ধোঁয়ার মতো কান্নায় কান্নায়
আকাশ অদৃশ্য প্রায় অন্ধকার বোবা গলি
নিচু নিচু বাড়ির কান্নার চাপাহাসি প্রাণের গুমোটে

হঠাৎ সে গলি শেষ পড়ে যাই প্রায় বিস্মিত উঁচোটে
আলো পথে আলো লোক চলাচল রাতে দিনে এক রাত জাগে দিনে

পৌঁছিয়েছি চৌমাথার আগে
শুনি তার বাড়ি নাকি গলির আগেই মোড়েরই মাথায়

বিস্তীর্ণ আকাশ যেন ঘুম থেকে জাগে ভাদ্রে নয়
সদ্যস্নাত প্রশস্ত আশ্বিনে ।

৭

পাথরে বাঁধিনি ধরে তোমায়, পূর্ণিমা ।
ভুলে যাই খরস্রোতে দুইতটে সীমা
ভুলে যাই স্থাবব অভ্যাসে ।

প্রেয়সী, তাই তো ক্ষমা
চাই, ঐ পূর্ণিমায় ভুলে যাই অমা
পৃথিবীর পশ্চিম নিঃশ্বাসে।

অস্থির আবেগ খোঁজে ছন্দে পরিক্রমা
মেলে না মন্থরনাট্যে তোমার, পূর্ণিমা।
ফল্গুর বিন্যাসে

আমরা প্রয়াগ নই, আমৃত্যু প্রয়াণে
সংগত সংগৎ নই ; যেন বাখ্, উভচর গানে
ভেদে সুর, সোনাটা উপমা :

থেকে থেকে ওঠে মিল ঘূর্ণির আশ্লেষে,
অসহিষ্ণু অন্ধকার কোজাগরে মেশে,
আবর্তে উল্লাসে মিলে যায় সীমা।

৮

যেখানে খাড়াই শেষ দিগন্তের নীলে দূর শূন্যে,
হিরনার স্তনাগ্র শেষ আকাশের হঠাৎ আশ্লেষে
ধানের সজল স্বচ্ছ সর্ষের অনচ্ছ আবেশে
মাটিতে কাঁকরে  লাল আপিঙ্গল পথের রেখায়,
সেইখানে চোখ চলে, করকোষ্ঠী পাথুরে লেখায়
খুঁজে ফেরে বর্ষফল কয়েকটি হৃদয়ের পুণ্যে।

তোমারও হৃদয়ে তাই হাত পাতি। আজকে শরতে
বর্ণাঢ্য পৃথিবী বটে, তবু অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি
স্মৃতির পরম্পরা ঘুলিয়েছে অঘ্রাণের দৃষ্টি
পরগনার ঘরে ঘরে, যদিচ নীলায় মরকতে
কুস্‌মার টিলা জ্বলে, তবু দূর দিগন্তে দিগন্তে
মন খোঁজে নিশ্চিতের ভবিষ্যৎ বর্ষায় হেমন্তে।

এখন আসন্ন সন্ধ্যা। উপড়িয়ে হিরণ্ময় পাত্র
উন্মুক্ত বিরাট নীলে সত্যবান প্রাণ পায় রক্তিম ক্রান্তিতে।
পশ্চিমের ছটা বই আমারও হৃদয়ে—একমাত্র
বাধা আজ অঘ্রানের সোনা কাল বৈশাখী চৈত্রীতে
লুটেরায় লুট করে। তাই আজ হাত পাতি তোমার মৈত্রীতে
মিলাও সন্ধ্যার রঙে প্রেমের সংরাগ তীব্র সংহত শান্তিতে।

৯

হিমগিরি ছেড়ে এলে তুমি কার জন্যে
অলকনন্দা ! যাবে বুঝি সমুদ্রে ?
তাই কি গিরিশ ছেড়ে চাও নীলরুদ্রে ?
মন্দাকিনী কি সমতলে এসে অন্য ?

পরিবর্তনে একই তুমি চিরকন্যা,
চূড়া প্রান্তরে দেওদারশালে অনন্যা,
স্রোতস্বিনী সে শহর গ্রামের বন্যা,
আবার প্রিয়ার স্নানোদকে ধারা পুণ্য ।

তুষার করকা ! থই থই তুমি মোহানায়
তুমি সমুদ্রসত্তা কানায় কানায়
ক্রান্তি তোমার পৌষ করুক উষ্ণ ।

১০

যাক রজনীতে ঝড় হয়ে যাক
রজনীগন্ধাবনে
সহিষ্ণু বাহু তুলি কালো খাক
মাঘের মরণায়নে
প্রেয়সী তোমার কালের কপোলে অক্ষয় চুম্বনে ।

রজনীগন্ধা ! দিনের আলোয়
তোমার মুকুল বাহু
আমার হৃদয় ভীম ভয়রোঁয়
বেঁধে দাও, উদ্বাহু
বিশ্ব মেতেছে বৃথাই জীবনে ওত পাতে বৃথা রাহু ।

রজনীগন্ধা তোমার শরীর
ঢেকো না অন্ধকারে
মানসসরের ম্লান উষসীর
জহ্নুর কারাগারে
ভেঙে দাও নীল প্রেমের আলোয় জাহ্নবী শতধারে ।

কাল রজনীতে ঝড় হয়ে গেছে রজনীগন্ধাবনে ?
মোহিনী তোমাকে মন্দারে বাঁধি সমুদ্রমন্থনে ।

১১

সেদিন গলির কৃষ্ণচূড়ায় ফুল
আকাশে স্বচ্ছ হাসির ইন্দ্রধনু ।

করনিকো কোনো ভুল
তুমি নেমে এলে
স্বপ্নে বিলালে তনু
শূন্যের সাততলা থেকে এই শহরের ঘরে এলে
বাস্তবিকের নির্ভয়ে অবহেলে ।

আকাল বছরে কৃষ্ণচূড়াও ম্লান
গলিতে গলিতে আয়তচক্ষু হাড়
ফেরারি কতো না প্রাণ
তোমার দু চোখে তোমার মানসে সাড়
জাগায় নীল পাহাড় মেলে ধরে ফাল্গুন
জীবনেরই আহ্বানে

শহরে শূন্যে মেলায় নদীর পাড়
সেতু বেঁধে দেয় আষাঢ় ও ফাল্গুন
শূন্যতূর্ণীর ফাল্গুনী ম্রিয়মাণ
তাই কি কিরাত আকাশ রুদ্যমান
মানুষের সম্মানে ?

মোছাও ঘোচাও কৃষ্ণচূড়ার শোক
গলির মোড়েই ছড়াও ইন্দ্রধনু
প্রতিমা তোমার হোক প্রতীক আরেক
আকাশ যেমন পাহাড় যেমন স্বাধীন সমাজে জীবন যেমন ।
তোমার বাহুতে হৃদয় তনু-অতনু
তোমার বাহুতে ধরেছি ইন্দ্রধনু
তোমার চুলেই আলুলিত বেণী কৃষ্ণচূড়ার ফুল ।

১২

প্রলাপে প্রলাপে বুঝি নাচে খ্যাপা বসন্ত আকাশ,
জীবনের তেপান্তরে বাউল হাওয়ার হাঁকে হাঁকে,
বেলিমল্লিকার শুভ্র প্রণিপাত পায়ে দ'লে-দ'লে
চৈতালি-ঘূর্ণির রাজা নাচে একী মরিয়া গাজনে !
দোলপূর্ণিমার স্মৃতি বৈশাখীতে শ্মশানে ছড়ায়,
মড়কে মড়ক ঢাকে, ছিন্নভিন্ন শূন্যে হাহাকার !

বাতাসে ভিখারি মারী, মাটি গুটি, শূন্যে হাহাকার,
আসন্ন-নিপাত ধূম্রলোচন যে বসন্ত-আকাশ,
শারদপূর্ণিমা স্মৃতি, রাস আর মায়া না ছড়ায়,
ডুবে যায় শতশতাব্দীর স্মৃতি কবন্ধের হাঁকে ।
পিশাচসিদ্ধের ভিড়ে ডাকিনীরা মেতেছে গাজনে !
সর্ব ভূতে মলে যায় চিত্ত যায় চণ্ডী পায়ে দ'লে—

কমলে কামিনী কিম্বা নটরাজ নাচে পায়ে দ'লে
শতদল চিত্ত শত সহস্র হৃদয়ে হাহাকার !
মেলে না পার্বতীপরমেশ্বরে এ বেতাল গাজনে,
হিরণ্ময় পাত্র ভাঙে চোরে চোরে, উলঙ্গ আকাশ ।
তাই বুঝি থেকে থেকে ভৈরব ভ্রূকুটিভঙ্গে হাঁকে,
সতীর অস্থির অস্থি বিশ্বময় দুহাতে ছড়ায়,

তাই কি প্রলাপনাটে সম নামে ঘরোয়া ছড়ায়,
অন্নদা পৃথিবী হাসে থেকে থেকে, যতো পায়ে দ'লে
মৃত্যুরা ছড়ায় মৃত্যু মৃত্যুঞ্জয় পিনাকীর হাঁকে,
তাই কি মরে না মাতা, মহাচীনে থামে হাহাকার ?
তাই তো হাড়িপা হানে অন্ধবাজে, উদ্যত আকাশ,
হীরার দাসত্বে সারা দেশ কাঁদে ক্রান্তির গাজনে,

তাই খোদা নিরঞ্জন থেকে থেকে ক্ষুধার্ত গাজনে
বাতাসে বাতাসে মত্ত অপলাপ আছড়ে ছড়ায়,
তাই ধর্মরাজ মৃত্যু, তাই মাতে মহিষ আকাশ,
প্রাণতীর্থে জনস্রোত মৃত্যুভয় পায়ে দ'লে দ'লে
শূন্যে শূন্যে ভরে তোলে শূন্যের সরকারি হাহাকার—
জীবনই মৃত্যুর বলি, শূলে চড়ে জুডাসের হাঁকে !

ব্যক্তির স্বরূপে ডুবি, ডুবি গুরু সমষ্টির হাঁকে,
সাযুজ্যের ডাক শুনি উন্মোচিত ঊর্মিল গাজনে
বিকচ ভবিষ্যে ফোটে মাথুর, কদম্বে হাহাকার :
অকালবোধনে চণ্ডী সেতুবন্ধে আশ্বাস ছড়ায় ।
লক্ষ লক্ষ পায়ে পায়ে মনসার শত চর দ'লে
নাগপাশ ছিঁড়ি, মনে আশ্বাসের উন্মুক্ত আকাশ

প্রাণ দাও হে আকাশ
বিদ্যুতে বজ্রের হাঁকে হাঁকে
প্রাণের আকাল দ'লে
রিমিঝিমি শান্তির গাজনে
ঝুলন ঝুলায় শ্যাম !
ছড়ায় সে অন্য হাহাকার ॥

## দিনগুলি রাতগুলি

(প্রমোদ মুখোপাধ্যায় ও রথীন্দ্র ভট্টাচার্য সমীপে)

তুলসীডাঙার পশ্চিমে কয় বিঘা
ছোট্ট চাষের জমি.
ছোটোখাটো. আশা মহিম চাষার প্রাণে
ঘেরাও চাষের জমিতে ।

তুলসীডাঙার উত্তরে তার ভিটা,
তালের ছায়ায় সংসার তার বাঁধা,
ছোটোখাটো সুখ মহিম চাষার গানে
সংসার সাধে বাঁধা যেন তালদিঘি ।

তবু উত্তরে তবু পশ্চিমে ধুধু
ঝোড়ো হাওয়া আসে মরুভূমি আসে খেতে
মরুভূমি আসে তুলসীডাঙায় ঝোড়ো
হাওয়ায় হাওয়ায় বাংলায় মরুভূমি—

মরা নদী খাল, বৃষ্টি ঝরা তো খেয়াল শুধু,
অনাবৃষ্টিতে, অতিবৃষ্টিতে, সুদে,
খাজনায়, চড়া বাজারে যায় যে ভেসে
মহিমের পোড়ো বাসা ছোটো সুখ, ছোটো আশা ভালোবাসা ।

মহিমের খেতে, মহিমের সংসারে
সরে যায় ছায়া, জ্বলে যায় প্রাণ খাক
মহিমের জমি মুঠি মুঠি ছাই ছড়ায় দেশবিদেশে
মহিমের জ্বালা বিশ্বে ছড়ায় কয় বিঘা হাহাকার ।

রহিমেরই মতো ঘরোয়া মহিম ভাবে
ছোটো খাটো তার নম্র আশাও আজ কড়া সংগ্রাম
সংসারে তার মিলেছে দূরের ব্যারাক
রহিমেরই মতো মহিমও জমিতে-ভাবে—

শহুরে রহিম হাতে তার চাকা ঘোরে
পাটে পাটে দলে জগদ্দলের চাকা সে অবিশ্রাম ;
তার সুখ সেই আশা তার সেই, তাই যন্ত্রের পাকে
গভীর মমতা অথচ যন্ত্র তার
হৃদয়েরই শুধু, হাতদুটি ক্রীতদাস ।

রহিমের দিন তাই তো মিলের বাইরে
রহিমের রাত তাই তো বস্তি ছাড়িয়ে,
রহিমের হাত কারিগর, ভালোবাসায়
এদেশে ওদেশে ঘর খুঁজে খুঁজে কাজের মুক্তি ডাকে ।

মহিমের খেতে ইয়াংচি বোনে ধান
তুলসীডাঙায় পিয়োঙ্গিয়াং কাঁদে,
রহিমের হাতে স্টালিনো কিম্বা গোর্কির
যন্ত্র সচল—ঘর্ঘরে তার অবিসম্বাদী আশা,

তবু মহিমের প্রাণ ঘোরে মেঠো পথে
তুলসীডাঙার অঙ্গার হাটে ঘাটে
হয়তো বা যায় কলকাতা বড়ো দূর
রহিম যেখানে তুলসীডাঙার স্বপ্নে জোগায় ভাষা ।

উৎস লুপ্ত। সে কোন্ শতকে আলালের ঘরে জন্ম।
সুয়োরানি দূর স্বপ্ন আজকে, সৎমা বলে না দুলাল,
পলাশীর ঘোর কেটে গেছে কবে, যন্ত্রণা আজ তন্ময়
শূন্য আকাশে, উড়ে চলে গেছে বুলবুল।

হুতোমের ভাঙা কোটর আজকে জীবনের ইমারত।
উৎস লুপ্ত। ফল্গুর ধারা শুকনো অনেক যুগ।
অথচ শহরই নয় রাজধানী, সভ্যতা জঞ্জাল
উপড়িয়ে গেছে, রেখে গেছে শুধু উপ্‌রি-র দুর্ভোগ।

সামন্তস্মৃতি অলীক নকল গাথা, সান্ত্বনা নেই,
যন্ত্রনিয়ন্ত্রণের ভবিষ্যৎও শুধু কল্পনা।
সুরেশের দিনে গড়েছে পণ্য ঠুনকো অচেনা কুলাল
সুরেশের রাত মাটির ঘড়ায় এলোমেলো সোনা আলপনা।

উৎস লুপ্ত। তারা খসে পড়া। সুরেশ আকাশ খোঁজে।
লক্ষ্য লুপ্ত। রৌদ্রে বৃষ্টি মাটি খোঁজে নবজন্মে।
শিশিরে ধোঁয়ায় শুকিয়েছে তার কোমল লিলির শরৎ।
বেকার সুরেশ ফাল্গুন খোঁজে ভিড় ঠেলে রাস্তায়
শহুরে গলিতে ফাল্গুন খোঁজে—জীবন আবীরগুলাল।

অন্ধ মাটির অন্ত্রে অন্ত্রে, কয়লাখনির
দুস্থ মজুর গাঁইতির ঘায়ে বসুন্ধরা
খুঁজে পায় নাকো। তাই সন্ধ্যায় ক্লান্তিহরা
সুরায় খোঁজে সে সেই রঙ্গিমা, সন্ধ্যামণির
আকাশে যে আলো সবার—শ্রমিক, বেকার, ধনীর

মহুয়ায় তার মনের মুক্তি, ব্যর্থশ্রমে
পেশী তার ভাঙে মন তার ভাঙে, নিরুদ্দেশে
রাতের স্বপ্ন বন্দী দিনের ক্ষয়ের শেষে
প্রলাপী বিকার, নিরর্থকের নিরাশ ভ্রমে
স্বপ্নও তার খদের মতোই ধসল ক্রমে।

শাল মহুয়ায় মনের মুক্তি আপন জেনে
আজো সে বোঝে না এই পৃথিবীব কয়লাখনির
পাতালে তারই তো কন্যা, যে তার সন্ধ্যামণির
আলো-কে বাঁধবে ঘরের প্রদীপে, ধরবে টেনে
বিদ্যুতে রথ, কালের বীরকে দৃষ্টি হেনে

জয়মালা দেবে, লাল করবীব গুচ্ছে বেঁধে
চিকন কবরী দোলাবে কন্যা ক্লান্তিহবা
স্বাধীনদিনের সন্ধ্যাব নাচে মাদল সেধে ।
বোঝে না সে আজ, কয়লাখনির কক্ষ ভেদে
ভোলে বন্দিনী তারই কন্যা তো বসুন্ধরা !

...

মন্দ ছিল নেহাত নাকি বরাত,
বাপের তার কিম্বা পিতামহর ।
দিন আনে সে দিনের খয়রাত,
বেসাতি শুধু দুই হাতেব গতর ।

গ্রামীণ, তবু মাটিতে নেই ঠাঁই,
পড়শি আছে আছে কুটুম ভাই,
সবাই বোঝে আপন বাঁচাটাই,
বাঁচার দায় সবার বুকে পাথর ।

সাহেবি কালে বিশ্বব্যাপী লড়ায়ে,
চাষের নয়, পথ কাটাব মজুর
ছিল সে তবু বছর তিন্ গাঁয়ে,
মফস্বলে স্বাদ কিনেছে বধূব ।
কলকাতায় গিয়েছে পঞ্চাশে,
দল বেঁধেছে লঙ্গর-প্রত্যাশে,
পথের শানে ধুলার মতো ভেসে
পায়নি স্বাদ কলকাতার মধুর ।

এ শহর তো কারো শহর নয় !
কলকাতার সতীন মায়া ফেলে
পাঁচক্ষীরায় ফেরা কি পরাজয় !

ফিরল তবু, সঙ্গে বউ ছেলে—
ফিরল সে কি ? কোথায় তার ফেরা ?
সারাটা দেশে জোটে না যার ডেরা !
জন্মভূমি ! সারা দেশের সেরা !
জন্ম ! নাকি মৃত্যু অবহেলে !

আবার শোনে জন্মভূমি ভাগে
টুকরো নাকি, গল্পে যেন মাকে
করল বিলি, দুঃস্বপ্নে জাগে
পাঁচক্ষীরাও, শুধায় একে তাকে ।
সুরাহা নেই, আবার কলকাতা,
যেখানে চোবাগলিতে ঘোরে জাঁতা,
যেখানে শুধু শ্মশানে দেশমাতা,
হাড়ের হাতছানিই তাকে ডাকে ।

...

ধ্যানীই বুঝিবা সে, স্নায়ুর কোষে কোষে
স্বপ্ন ধরেছে কি রক্তে বাঁধ বেঁধে
অন্ধ রজনীতে আঁধার ধমনীতে
রুদ্ধ গঙ্গার সাহারা কিনারে ?
গৌরীশৃঙ্গের বিদেহ শিখরের
প্রাচীর তুলে তুলে তুঙ্গ শহরের
অভ্রকংক্রিটে হাওয়ার মহলের
বাগানে ছায়া গ'ড়ে পাইনে চেনারে

বুঝি সে স্বপ্নের কেল্লা বচেছে
এঁকেছে শিল্পের তীক্ষ্ণ জেল্লায়
একাগ্রতা দিয়ে রূপের সন্ধানে
ডেকেছে মানসের তুলনাহীনারে ?

সারাটা জীবনের স্মৃতির মন্থনে
নিজের, সমাজের, বিশ্বমানবের—
আগামী প্রেক্ষিতে আলোর বিন্যাসে
ভুলেছে কিবা মায়া মোহরে দিনারে ?

নাকি সে ভুলে গেছে লক্ষ্য-সাধনায়
লক্ষ্য পলাতক সুনীল আকাশের
প্রান্ত পার হয়ে শ্যাওড়া আগাছায়
লস্ এঞ্জেলেসে গজদন্তমিনারে ?

ছুটুক না ঘোড়া নবাবজাদার,
প্রকৃতির রঙে রক্ষামুকুরে
হরিণ লুকায় বনের ছায়ায়,
রাজার শিকারি কুকুরে কুকুরে

ছেয়ে যাক দেশ, তবু খরগোশ
মাটির ত্বরিত গুহায় লুকায়,
বন্দীশালার ঝুটা খোরপোষ
কেবা কবে চায় বলো স্বেচ্ছায় ?

বাপ তার যায় অজ্ঞাতবাসে
বনবাসে নাকি উলূপীর দেশে,
আহা ছোটো ছেলে, ছোট্ট ছেলেটা
কী যে ভাবে বাছা কাঁদে না হাসে !—

ও ছেলে .ছোট্ট খোকা ওরে শোন্
জ্বলজ্বলে চোখ কোঁকড়া চুলে
বিদায় আজকে বিদায় দে বাছা
পথ দুর্গম পথের ভুলে,

মা তোর আজকে থাকলে তো দিত
একাই সে দুইজনের বিদায়,
উজাড় প্রাণের উজ্জ্বল আশা
আমার দুপাশে যেত পায়ে পায়ে ।

ফুট্‌ফুটে মুখে, কচি কচি হাতে
হৃদয়ের নীলে আকাশে চাঁদ,
লক্ষ তারার মাঝে পূর্ণিমা,
বাছাবে পালাই, আজকে বিদায়—

ছিঁড়ে যাবে ফাঁদ, পালাবে কুকুর,
আবার আসবে বাছুর ডোরে,
সে যে একালের খুদে খুদিরাম
বিদায় দেয় সে রাতের ভোরে।

রাতগুলি আজও স্বপ্নে স্বপ্নে জাগ্রত
দিনগুলি শুধু জীবনের দিনই নিঃঝুম,
ঘুম নেই চোখে মনের আকাশে রাতে ঘুম,
ক্লান্তির তীরে দিনগুলি হতাহত।

হৃদয় বনানী, রাতগুলি গানে মরমর
আঁধারে স্বাধীন, ঘুম নেই চোখে সচ্ছল
চাঁদিনীতে অমাবস্যায় প্রাণ অথই সরসী, নীল জল,
শুধু বাংলার দিনগুলি গোবিপ্রান্তর।

হাতে হাতে রাত একায় মেলায় বিশ্ব
বিরহে মিলন, নিঃস্ব মরুতে প্রাণেব তমাল মেলে,
রাতগুলি হাতে হাত বেঁধে সুর ভৈরবী রামকেলি,
দিনগুলি তবু বুভুক্ষু অরাজক।

হৃদয়ে বনানী রসাল সবুজ লাল
শাল পিয়ালের পিপুলের সমারোহে,
জীবন তবুও ঘৃণ্যের ভিড়, ঠগে ঠগে খাক্ ডাঙা,
শিকড়ে শিকড়ে প্রাণের গঙ্গা রাঙা,
অথচ রাতের কোরকে সদ্য দিনগুলি ঝরে যায়।

রৌদ্রে স্বপ্ন বুনবে কবে সে রূপান্তর
জীর্ণ জীবনে স্বপ্নের ঋজু আলপনা
আঁকবে সে কবে সোনায় রাঙানো রূপনারানের প্রাতে
কড়িতে কোমলে অখণ্ড ভাস্বর॥

## বেয়ালা জন্মদিন প্রতিদিন

( আশীষ বর্মন কে )

ডুবেছে তখন চৈত্রজ্বালা অগ্নিদিন
দক্ষিণ বাতাসে স্নিগ্ধ মোলায়েম রাত বয়ে যায়
ভিন্ন হয়ে যায় এক
ধুলা আর ধোঁয়া এক স্নাত মহাশ্বেতা জ্যোৎস্নার তীব্র মাধুরীতে
আমাদের জীবনের বিভীষিকা জঘন্য প্রত্যহ
নির্মম কুটিল ঘৃণ্য অমাবস্যা হয়ে যায়
সহনীয় এমন-কী মধুর বুঝিবা পূর্ণিমায়
মনে হয় জ্যোৎস্না বুঝি এসে. গেছে পরাজিত দিনে
জ্বালা বুঝি বিজয়ীর শাস্তি
বুঝি এক হয়ে গেছে সব ভিন্ন
জ্যোৎস্নার ঢেউয়ে ঢেউয়ে
ঘৃণ্যের রাজত্ব শেষে সমুদ্রের স্বপ্নালু বাতাসে প্রাণের দিনের
আমার প্রেমের মতো
হাতে হাতে মৃত্যুহীন হৃদয়ের আগুনে ইস্পাতে
যেন এক জন্মদিন প্রতিদিন

হঠাৎ বেয়ালা বাজে
সুরের আনন্দে মাতোয়ারা বিষাদে গভীর
শুনেছি কয়েকদিন মাঝে মাঝে সুরের পাগল এক
গৃহহীন কিংবা ঘরছাড়া হযতো বা ভিক্ষাজীবী, যে যা দেয,
থেকে থেকে সন্ধ্যায় রাত্রিতে এপাড়া ওপাড়া
গলিতে গলিতে কখনো বা চৌমাথায়
খুলে দেয় সুরের ফোয়ারা জ্যোৎস্নায় বা অন্ধকারে
স্বপ্নের বিদ্যুৎঘর
ধুয়ে দেয় দিনের ঘৃণ্যতা
নির্বোধ লোভের গ্লানি অনর্থক স্বার্থের দহন
গেঁথে দেয় আসন্ন নির্দেশে অধরা আবেগে কানে কানে
শিল্পের চরম রসায়ন
সংগঠিত বিরোধের রূপকার স্রোত, সুরের সংহতি

বেয়ালায় সুর চলে স্নিগ্ধ মৃদু দক্ষিণ বাতাসে
মেলামেশা নির্বিরোধ স্বাধীন আকাশে

আঢুল বাড়িতে আর ঘুমন্ত বাসায়
যন্ত্রণার নিদ্রাহীন ঘরে বস্তিতে বস্তির
পাশের প্রাসাদে নীরক্তের পারদ-আলোয়
অভাবের অসুখের ঘরে রাস্তায় রাস্তায়
অপরাজেয়েব প্রাণ বেয়ে আসা প্রকাশ্যে গোপনে
বিশ্বপ্লাবী সুর।

মনে হয় এই সুরে চাওয়া যায়
পাওয়া যায় যাওযা যায় দক্ষিণ বাতাসে
যাওয়া যায় বাংলার গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
বহুদূর বাংলার এই জ্যোৎস্নায়
যাওয়া যায় ইয়াংচির ঘাটে ঘাটে
হানের রক্তিম স্রোতে পাহাড়ে পাহাড়ে
তুন্দ্রায় তাইগায় স্টেপে স্টেপে প্রান্তরে আবাদে
এই সুরে গেয়েছিল পেয়েছিল কত প্রাণ কত দেশ
কত গান কত না শহর
এই সুরে জারিৎসিন জীর্ণ সেই বর্জিত কবর
প্রাণ পেয়েছিল কবে স্বপ্নে যেন

দিনে দিনে সুরে গাঁথা স্বপ্নালু স্টালিনগ্রাদে
প্রাণের স্বপ্নের
এই সুরে যন্ত্রণার মোচড়ে মোচড়ে ব্যথার ঝঞ্ঝায়
অব্যর্থ আশার তীব্র মূর্ছনায় মূর্ছনায়
দিনীপারে স্রোতে স্রোতে অমর সুরের স্রোতে
আকাশে বাতাসে হেনে করকায় করকায় জ্যোৎস্নার শান্তির আনন্দ
বীর্যের প্রশান্ত ছন্দ মানুষের
স্টালিনগ্রাদের মানুষের।

আবার আলাপ ভাসে দুর্জয় বেয়ালা
প্রাণের অক্লান্ত উৎস, বিষাদের অভিজ্ঞ পুলকে
যন্ত্রণার হর্ষে হর্ষে রোমাঞ্চিত গ্রীষ্মের ফুলের মতো
চৈতন্যে প্রেমের মতো
মুঠি মুঠি বৃষ্টি করে সুর জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়
কম্পমান অথচ সুঠাম অস্থির অথচ অটল
প্রবাহ অথচ এক,
ভিন্ন হয়ে যায় এক, সমান বন্ধুর।

প্রত্যহ আয়ত্তে আসে বাস্তব মেশায়
সুরের সংগতে সাধ্য পরিবর্তনীয়ে রচনায় রচয়িতা
আমরাই হয়ে যাই সুর ।
গৃহহীন—অজানা—হয়তো ভিক্ষাজীবী তবুও অজেয়
বেয়ালার তীব্র কণ্ঠে খাদে নিখাদের
মনে হয় হাজার বেয়ালা লাখো লাখো লোক এদেশ ওদেশ
অথচ একাগ্র বাঁধা গান্ধারে গান্ধারে
মনে হয় আকাশের বাতাসের জ্যোৎস্নায় এদিনের
বাংলার স্থবির প্রাণের সুরে মিশে যায় শান্ত অতিক্রান্ত
দিনীপারে দানিয়ুবে মেশে যেন স্টালিনগ্রাদের
শান্তিময় মে-দিনের ফুলে ফুলে সুরে সুরে উত্তীর্ণ আখরে
তোমার ঘুমের পাশে আমার প্রেমের মতো নির্নিমেষ
প্রেমে প্রেমে নীলাকাশ জন্মদিনে আমাদের
জন্মদিন প্রতিদিন স্টালিনের মৃত্যুহীন প্রতিদিন লেনিনের ॥

## আষাঢ়েরই জয়গান

শতাব্দীতে নয়, আজ মন্বন্তর বছর বছব,
প্রতিদিন দুর্ভিক্ষে বর্বব ।
পোড়ো জমি, সুদে সুদে দেউলিয়া খেত,
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি নদীর খালের মৃত্যুতে বন্যায় বছর বছর,
এখানে ওখানে, হাল লাঙল ভঙ্গুর, সার নেই, নেই বীজ ধান,
পেশী নেই, রক্তে রক্তে আকালের কালি, রক্তহীন প্রাণ,
কামারের কুমোরের জেলের তাঁতির পঙ্গু হাত
আনন্দের লেশ নেই জীবনযাত্রায় জীবিকায়
প্রতিদিন ক্লান্ত পদক্ষেপ সুস্থের সাচ্ছল্য হল পার্বণের বা উৎসবেব দিন,
দুস্থ রোগ দৈনন্দিন ।
বর্তমান ছেয়ে গেল গৃধ্নু চতুরের ক্ষমতার বর্বরের মায়াবী শ্মশান ।

অসহায় ভিখারিই মান ।

অথচ পৃথিবী জানি বসুন্ধরা মানুষকে ডাকে
খেতে খেতে মাঠে তার ঐশ্বর্য দুর্বার
নবজলধর শ্যাম,
অথচ আকাশ সেই নীলাকাশ নয়নাভিরাম রৌদ্র মেঘে জ্যোৎস্নায়,
অতীতের জ্যোৎস্নায় রৌদ্রস্নাত ভবিষ্যতে ।
অথচ দুর্মর দেশ, মানুষ দুর্জয় ।

হে আষাঢ়, ধৈর্য দাও, বজ্রে বজ্রে সহিষ্ণু বিদ্যুতে
শ্রাবণে  মুষলধারে ধুয়ে দাও পতিত হৃদয়,
বীজকম্প্র মেঘে দাও রৌদ্রে দাও জীবনের গানে
আশ্বিনের স্বচ্ছ জয় ছড়াও ছড়াও এই পোড়ো জমি লাখো লাখো প্রাণে

যখনই জীবন মনে হয় দুঃসহ,
যখনই দিনের ধিক্কারে মনে হয়
রাত্রির ফুল শুকাবেই প্রত্যহ,
স্বপ্ন থাকবে দ্বন্দ্বই অহরহ,
তখনই তোমার প্রতীক বার্তাবহ
হাওয়ায় হাওয়ায় বেঁধে আনে প্রত্যয় ।

বামে বিচ্ছেদে দক্ষিণে ভিক্ষায়
যখনই জীবন মনে হয় দুঃসহ,
সমুদ্র মানে গোষ্পদে পরাজয়
দশের দাপটে দেশের তিতিক্ষায়
দুস্থ বিকারে পঙ্কিল প্রত্যহ,
তোমারই আকাশ ঝলসে প্রতিজ্ঞায় ।

হিমনদী ঘৃণা আগ্নেয়গিরি ক্রোধ
যখনই জীবন খাক্ করে অহরহ,
পণ্যের পায়ে অগণ্য পরাজয়
যখনই, আবার তোমার অভিজ্ঞায়
জেগে ওঠে কোটি মানুষের দীক্ষায়,
জল মাটি পায় জীবনের ন্যগ্রোধ ।

প্রকৃতির-ও গায়ে তোলো মানুষের বোধ,
কোটি মানুষের পল্লবে বরাভয়,
ওদিকে তোমার শান্তিতে প্রতিরোধ,
এদিকে স্বপ্নে অশরীরী বিদ্রোহ,
ওদিকে তোমার প্রত্যক্ষের জয়—
একাকার তুমি স্বপ্নই মনে হয় ।

সেদিনও কি মৃত্যু ছিল জন্মে জন্মে চতুর গোপন,
সেদিনও কি অপঘাত চুপি চুপি দশদিক ছেয়ে,
লোভীর নির্মম দম্ভ সেদিনও কি বুটে পদাঘাতে
হাজার প্রাণকে ছেঁড়ে গোলাপ গোলাপ হাতে পেয়ে
জীবনে সেদিনও ছিল তিলে তিলে মৃত্যুর শাসন ?
চোরের দৌরাত্ম্যে ছিল শত অনাচার অক্ষমের ?
সেদিনও কি দিনে দিনে সুস্থও শুকাত নিত্যবিষে
সেদিনও লক্ষ্মীর কৌটা চলে যেত কোটরে যমের ?

আমার রাত্রির মুখে দিকে দিকে ক্ষুধার্তের চোখ
আকাশে অঝোরে ঝরে বাংলার শ্রাবণ কান্নায়
আমার তারার আলো নিভে যায় রুগ্‌ণের কান্নায
হাজার তারার আলো কোটি কোটি পঙ্গুর কান্নায় ।

জন্মদিন মৃত্যুদিন, প্রতিদিন ঘৃণ্য অপঘাত,
প্রতিটি জীবন প্রতি জন্মদিন আজ ঘৃণ্য হার,
তবুও দিনের সূর্য মেঘরৌদ্র প্রাণের প্রপাত,
তবুও শান্তির জ্যোৎস্না স্বপ্নে বোনে সচ্ছল সংসার
সুস্থের সুখীর জ্যোৎস্না সহৃদয় আনন্দে দুর্বার,
ধূর্ত মৃত্যু রাজ্যহীন, জীবন যে লাখো হাতে হাত ।

তবুও গানের আখরে জড়ায় ছায়া,
তাই ভুলি প্রায় বৈচিত্র্যের স্বাদ,
কুরুচি আমার দশদিকে ধরে কায়া,
নিত্য অন্ধ অসতের অভিযান

আমার চোখেও নিষ্ক্রিয়তার মায়া
ঘনায় গোপনে, বাহুর যে অবসাদ
সেকি জরা, নাকি দুর্বল অভিমান ?

তাইতো কেবলই বেঁকে যায় ঋজু রেখা,
তাই কি ধূসরে সাতরঙ একাকার,
নরকের এক বৃত্তেই ঘোরে লেখা,
নরকেরই লোক দশদিকে গদিয়ান ।

হাজার হাজার বছরের শত শেখা
মানুষের আশা গর্ব কি ছারখার
করবে পাশের খর্ব বর্তমান ?

তোমারও স্বপ্ন কেন খুঁজে ফেরে ছায়া ?

অথচ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়েরই জয়গান,
অথচ তোমাতে বিদ্যুৎ পায় কায়া,
চোখে চোখে চলে বজ্রের অভিযান,
তাইতো আষাঢ় আশ্বিনে তলোয়ার
সূর্যে সূর্যে খরশর-সন্ধান ॥

## উপোসি পাহাড়ের চড়াইপার

উপোসি পাহাড়েব চড়াইপার
এসেছি আজ এই উপত্যকায়,
পথের লড়ায়ের খদের শেষে
ঘর কি বেঁধে দিলে নীল ছায়ায় ?

এখানে গাছে গাছে সরস প্রাণ,
এখানে ঘরে ঘরে সরল গান,
এখানে মানুষের সহজ মান—
এলে কি জীবনের উপত্যকায় ?

ভিখারি দিনগুলি হয়েছি পার,
হাওয়ায় পাব নীল সমুদ্রের,
আকাল রাতগুলি করেছি শেষ,
মেঘের রাতগুলি, যে রৌদ্রের
শরৎ-ঊষা দিয়ে করেছি জয়
সে রৌদ্রে তো নেই মরুর ভয়.
সে আশ্বিনে নেই বানের ক্ষয়
আমরা সচ্ছল উপত্যকায় ।

পাহাড় বাঁয়ে জাগে স্থপতি আকাশের
মেঘ ও রৌদ্রের প্রেমের আভাসের
সতেজ মুক্তির ব্যাপ্ত বাতাসের
গানের নদীপাড়ে উপত্যকায়
হাসির আলো ঝরে এই যে দেশ—
কবিতা আমাদেরই স্বদেশ এই
উপোসি পাহাড়ের খাড়াইপার
ভিখারি দিনগুলি যেখানে শেষ
সবুজ শান্তির উপত্যকায় ॥

## পাঁচ প্রহর

( ইরাবাবু তারাবাবুর জন্য )

পাহাড়ি সূর্যের রক্ত গোলাপে
রাঙবে নীলাকাশ তীব্র প্রভাতে,
ক্লান্ত রজনীর কৃষ্ণ কলাপে
সোনার আভা হেনে আলোর সভাতে
রাতের চামেলির স্বপ্ন প্রলাপে
ক্ষান্তি দেবে সে কি করবী জবাতে ?

সোনালি পাখি সে কি ? রইবে সে নীড়ে
যে নীড়ে পেতেছিল রাতের পাখা সে ?

দিনের আকাশের তারার এ ভিড়ে
উড়বে নাকি খুলে রাতের ঢাকা সে ?
দিন ও রাত্রির তরলে নিবিড়ে
ঘোরাবে আকাশের আলোর চাকা সে ?

তবু সে নিকষের নেতির প্রভাবে
আমার দিনগুলি কুসুমবন যে
আজকে সুর ওড়ে ষড়জে রেখাবে,
কথায় রূপ পাবে গুঞ্জরণ সে
যখন দৈনিক আমার অভাবে
নামাবে পাখা ফের সায়ন্তন যে ।

তাইতো একা একা রক্ত-গোলাপে
রাঙাই নীলাকাশ শূন্য প্রভাতে,
দিব্য দৃষ্টির আপাত প্রলাপে
হাজার লোক ডাকি বনের সভাতে,
নিকষ নিরাশায় মাটির কলাপে
কুসুম বন রচি শিউলি-জবাতে ।

...

বুঝি না যে আমি তোর ভাষা
পথকে যে ডেকে আনা আঙিনায় ঘরে
একী বা আকাঙ্ক্ষা কী আশা !
বাছারে বক্ষ কাঁপে ডরে ।

তাকাস পাহাড়ের ভিড়ে,
ডাকিস অরণ্যকে দুবাহুর নীড়ে,
ঢলেব বান কি চাস ঘরে ?
বক্ষ কাঁপে তোর তরে ।

বুঝি না রাতের সুর সাধা,
পাখার ঝাপট শোনা মাটিলেপা ঘরে
স্বপ্নে দিনের তোড়া বাঁধা ।
সারাদিন কাজে অবসরে ।

কে পাঠায় তোর চোখে দূত
মেঘচেরা দ্রুত বিদ্যুৎ ?
বজ্রকে বাহু দিবি আপনার ঘরে
অতন্দ্র সে কোন্ প্রহরে ?

বাছারে জানি না তোকে, মেয়ে
কী পাহাড় গড়েছিস ঘরে !
আমাদের মাঝে যায় কোন্ নদী বেয়ে,
কালের প্রাচীর তুলে ধরে !

উড়ে যাওয়া পাখি দেবে নীড় ?
ছেঁড়াতারে তুলবি কি মীড়
সমুদ্র বেঁধে দিবি উৎসের ঘরে
পাহাড়েব নীল অম্বরে ?

একান্ত ঘোরে বুনে বুনে
দিন যে গাঁথিস ফাল্গুনে,
বারেক চেনায় বুনে যাস চির আশা
বাছারে বুঝি না তোর ভাষা ।

ওগো মা, দেখেছি সে যে এল মেঘে মেঘে
শূন্য খেযায় পার হযে নদী আঁধারে
বিদ্যুতে জ্বেলে আমার হৃদয় আঙিনা ।
ভিজা বাদলেব আঙিনায় এল সবাকার অগোচরে
আমার দুচোখে আষাঢ় ধারায় সে যে এল মেঘে মেঘে
বজ্রে বাজাল গান্ধাবে বাঁধা বীণা ।

ওগো মা, আমাকে বলো দেখি তাকে ঘরে
আনব কি বলো থাকব প্রহর জেগে
অল্প প্রদীপে প্রহরী নিদ্রাহীনা ?
সে যে ঘর খোঁজে পলাতক মেঘে মেঘে
সবাকে এড়িয়ে বিদ্যুৎ অগোচরে
কারাগার তার পিছু পিছু ছায়া ফেলে ফেলে ধায় কিনা ।

হৃদয় আমার ছেয়ে দিলে মল্লারে,
স্নায়ুঝংকৃত আমার অগ্নিবীণা।
ওগো মা শুনেছি সে যে আসে ঐ বিদ্যুৎ আসে মেঘে।
...

সে কি জাগবে একা একা বন্য রাত
সেচবে জল গাছে দীর্ঘ দিন আহা দগ্ধ দিন
তুলবে ফলমূল প্রতীক্ষায়
উঠান কোণে এসে দেখবে পথ ?

সে কি ভাববে একা একা শূন্য রাত
বাজবে বাঁশি কবে পুণ্য দিন আহা দীপ্ত দিন ?
তাই কি দিন তার প্রতীক্ষায়
দীর্ঘ চাউনির মৌন পথ ?

সে কি টানবে দিন রাত আনবে পথ
তমসাতীরে তার বটের রাত ঘন আঁধার রাত
মেলবে যমুনায় তমাল দিন ?
পথ কি প্রাণ পাবে প্রতিষ্ঠায় ?

সে কি স্বপ্নে রূপ দেবে প্রতীক্ষায় ?
তাই তো তন্ময় রাত্রি দিন সে তো রাত্রি দিন
প্রাত্যহিক পালে সে দিন রাত
ঘরের ডাকে টানে দূরের রথ—
মথুরা ভেঙে যায় এ নিষ্ঠায় ?
...

আমার দিন শুরু সূর্যোদয়ে, রাত্রি কোজাগর বিনিদ্রের,
স্নায়ুতে মানসের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
কোয়ার্টেট যেন কোন্ অতন্দ্রিত অপরাজেয় গ্রোস্ ফুগের গান
রৌদ্রে এই সুর বিলিয়ে দাও, মধ্যদিনে হোক স্পন্দিত।
আমার দিন শুরু সাতটি রঙে, রাত্রি আদি নীল সমুদ্রের,
স্নায়ুতে স্বপ্নের আনন্দের অসীম রেশ বাজে রন্ধ্রহীন,
রঙের ঘনঘটা অতন্দ্রিত
অমোঘ শিল্পীর তুলির টান—
পাহাড়ে পাহাড়ে এ মিলিয়ে দিই প্রখর মুক্তিতে নন্দিত ॥

## আগামীবারে সমাপ্য

প্রথম দেখা ভুবনডাঙার হাটে
লাজুক দুটি উৎসুক সে চোখ
বটের তলায় দাঁড়িয়েছিল ভিড়ে
বাকি ছিল সবই বিকিকিনি
এদিকে প্রায় হাটের বেলা কাটে
শুনছিল সে একমনে যে কথা
তাকিয়েছিল নিশানবেদীর দিকে
লাজুক চোখ হৃদয় উৎসুক
বটের তলায় দাঁড়িয়ে অনিমিখে
অনেক চাষি মরদমেয়ের ভিড়ে
বাকি ছিল দিনের বিকিকিনি ।

অনেকদিনের পরে তাকেই চিনি
ফেরার পাখি যখন নীড়ে নীড়ে
রাতের দীপ দিনের ছায়া খুঁজি
শহর থেকে গ্রামে ও গ্রাম থেকে
এ গ্রামে ছুটি জীবন দিয়ে যুঝি
পাহাড় থেকে কখনো জঙ্গলে
তেপান্তরে বালির স্রোতে বেঁকে
দিনকে খুঁজি রাতে ও রাতে দিনই
হাওয়ার মতো ঘুরছি চারদিকে
তখন দেখি উৎসুক সে চোখ
লাজুক তবু স্বচ্ছ নির্ভীক
দুয়ার খোলে একটি কথা ব'লে ।

একলাদিনের শুকনো ভুবনডাঙায়
গড়বে কতো স্বচ্ছ স্বাধীনগ্রাম
যোগাযোগের শিরায় শিরায় পথে
আঞ্চলিকে গাঁথলে তাদের নাম
স্বপ্ন আমার বহুর মনোরথে
পথ পেয়েছে, তাইতো হৃদয় রাঙায়
উষার লালে, অস্তরবির মায়ায় ।

ভিড়ের রাতে শত আশার ভিড়ে
মেলাও কতো সম্পূর্ণের ভাষা
মহাসাগরে কতো না ঢেউ ওঠে
স্পষ্ট ঢেউ প্রতিটি যাওয়া আসা
ঐকতানে প্রতিটি সুর ফোটে
অবসরের গমকে আর মীড়ে
আকাশ যেন প্রতিটি নীড়ে নীড়ে

কিম্বা যেন আকাশে বহু তারা
স্বাধীন তারা স্বতই মহীয়ান
তবুও মিলে পেয়েছে তারা প্রাণ
নৈঃসঙ্গ্যে নয়কো দিশাহারা
আপন ঘরে আনাগোনার গান
স্বতই তোলে, স্বতই খোলে কারা
সবারই জোত, প্রত্যেকে প্রধান
...
দুহাতে নিয়েছি অনেক সন্ধ্যা সকাল অনেকদিন,
দান বলে নিই, স্বাধীন সে দান। আজও তাই নিই ঋণ,
পৃথিবীর মতো, আকাশের ঋণ। মেঘে বিদ্যুতে গানে
দিগন্তে দিই কয়েকটি দিন কেন্দ্রিক সম্মানে।

জীবনে অনেক মরণ, দ্বন্দ্ব, ভুল, ভুলবোঝাবুঝি
অভাব, দুঃখ, বহু অন্যায়, অনেক বিসম্বাদ—
তারই মাঝে তুমি স্বচ্ছ সকাল এনে দিলে সোজাসুজি
পাহাড়ি পথের চলতি সঙ্গে মুছে দুপুরের স্বাদ।

অসহিষ্ণুর ক্ষণিক ভ্রান্তি, অকালের অভিযান
দুর্বলতাকে মার্জনা দিয়ো ধরিত্রী! ধীর চিত্তে,
সাম্প্রতিকের গ্লানি তো আগামীবারে সমাপ্য নিত্যে
বৈশাখী পাবে শ্রাবণে যখন পূর্ণতা অম্লান॥

## প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল

প্রখর শান্তি খর উজ্জ্বল,
কাতর রাত্রি নয় রৌদ্র !
হাওয়া যেন ঝক্‌মকে তলোয়ার !
রৌদ্রে প্রসাদ হানে শান্তি,
শুকনো গেরির মাঠ, লাল ঢল,
রৌদ্রে বাঁধের জল ঝল্‌সায়,

সকালের হিমানীর আর্দ্র
চাহনিতে ছোটে আলো সওয়ার—
তাতার বা কসাকের ভ্রান্তি !
খরবেগে রৌদ্র যা উজ্জ্বল,
আকাশে যা স্বচ্ছতা বাতাসের
লক্ষ লক্ষ হাতে তলোয়ার,
যেন বা প্যারেড্‌ কোনো উৎসব !

শান্তি যে চাই খর শান্তি,
রৌদ্রের শান্তি যা উজ্জ্বল,
আতুল রাত্রি নয় রৌদ্র,
সর্ষে সবজিখেতে অড়রে
যে হীরার প্রবলতা ঠিকরে
আখের বনের ঘন সবুজে
হলদি চড়ায়ে নীল শিখরে
গ্রামে গ্রামে আর দূর শহরে

গোলাভরা সোনাজ্বলা আকাশের
পূর্ণের মশালের সে যে দূত,
হীরার শান্তি, সে যে উজ্জ্বল,
সকালের গোলাপের কান্তি
তোমারই লাবণ্য যে বিতরে
বাহুডোরে আতপ্ত ঝলমল,
উদার অথচ খর বাতাসের
রৌদ্রে স্বচ্ছ, ধীর, প্রস্তুত
চাঁদিনীর ইস্পাতে শান্তি ॥

## নদীর উৎস যদি জানা থাকে

তুমি যবে পাশাপাশি, বৃষ্টি থামে, রৌদ্রও প্রসাদ ;
তোমার শরৎ সত্তা স্বচ্ছ লঘু সমৃদ্ধ মধুর ।
কখনো বা আশ্বিনের শাদা মেঘ, কখনো ঘনায় রঙ
সূর্যাস্তে বা সূর্যোদয়ে,
পৃথিবীর মেলডিতে লাগে যেন আকাশের সিমফনিক সুর
হয়তো বা মুহূর্ত পশলা লাল পথে সবুজে সুনীলে
এনে দেয় সদ্যতর স্বাদ ।
শ্রাবণে তোমার স্মৃতি, মাঘে থাকো চেতনায় মিলে,
তোমার সত্তার সত্য তোমাতে বা তোমাতে আমাতে
শেষ নয়, সে বরং ব্যাপ্ত হয় শব্দের তরঙ্গ যেন
রেশে রেশে দিনে দিনে বছরে বছরে
জীবনের স্তরে স্তরে রূপান্তরে উত্তীর্ণ নিখিলে ।

আমার যে দিনগুলি তুলে তুলে ভরেছ আঁচলে,
জানো সে কি কতো দিন,কতো রঙ বিচিত্র রঙিন ?
আজ তুমি কাছে নেই, আছে শুধু একটি আকাশ
আমার সত্তাকে ঘিরে ।
আজ ফিরে ফিরে তাই যেদিকে তাকাই
দেখি সেই দিনগুলি তোমার আমার সেই দীর্ঘ ইতিহাস,
খুলে খুলে দেখি তার রূপান্তর,
এদিকে স্মৃতিতে স্থির, আততিতে প্রতিন্যাস,
অথচ একটি স্রোত, দুঃখে সুখে নবনব পরিণতি,
ছেদহীন, অমাবস্যা পূর্ণিমায় সন্ধ্যায় সকালে
ঘাটে ঘাটে এদেশে ওদেশে স্থানকালে মেশে
তোমার বিকাশে আর আমার বয়সে,
উভয়ের পরিণতি, রূপান্তর উভয়ত এবং স্বতই
মানুষে মানুষে, সমাজে সংসারে, আমাদের উত্তরপুরুষে
সংলগ্ন সন্তত ।
সেই দিনগুলি আনি দূরের আড়ালে ফের কথা বলে বলে
ঘুঘুর কূজনে তীব্র ছায়াচ্ছন্ন স্তব্ধতায় তোমারই আঁচলে ।

আজ চৈত্র বৈশাখের তাপে দোলে
হাওয়া কাঁপে রৌদ্রে থরোথরো,

পাহাড়ে প্রান্তরে তাপ পাণ্ডুর আকাশে প্রায় লীন,
দুপুর বাতাসে সদ্য নতুন পাতার চাপে
ঝরো ঝরো পাতা পড়ে
পাতা ওড়ে ঘুরে ঘুরে ছড়ায় ওড়ায় উড়ে উড়ে পাকে পাকে জড়ো
নিঃশ্বাসের ফাঁকে ফাঁকে আলিঙ্গনে কথার মতন,
কোথাও বা আকাঙ্ক্ষায় যৌবনের দিন বউল ঝরায়,
মাটির পরাগ ওড়ে ফলন্ত চৈতালি গানে
উন্মুখ প্রকৃতি গন্ধে গন্ধে ভারাতুর
আম জাম কাঁঠালের বনে।

তোমার ফলন্ত সত্তা স্মৃতি আজ নিবিড় শ্রাবণ কিম্বা ভাস্বর শরৎ
আমার জাগায় স্বপ্নে আকাঙ্ক্ষার মাটি আর ঘনিষ্ঠ আকাশে,
তোমার জীবন্ত সত্তা দেহেমনে বিস্তৃত আকাশ
অতীত ও ভবিষ্যৎ
জীবনে জীবনে পূর্ণ
তোমাতে তোমাতে এক, দিনরাত, কতো দিন,
সমগ্র বছর এক, গোটা এক আয়ুষ্কাল,
বহু ব্যাপ্ত স্থানে কালে,
জীবনে জীবনে কর্মে রূপান্তরিত অথচ এক
উভয়ে ও উভয়ত সম্বন্ধের নদী এক বিচ্ছেদ মিলনে—
নদীর উৎস যদি জানা থাকে জানাই তো থাকে
তাহলে বিস্তার তার দিনে দিনে গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে দেশে দেশে সকালে বিকালে রাত্রিতে দুপুরে
ঋতুতে ঋতুতে বাঁকে বাঁকে জল দিয়ে
ফসল বিলিয়ে ফুল ফল দিয়ে ঘুরে ঘুরে সমুদ্রের মুখে
মোহানার শেষে সমুদ্রের বুকে আত্মদানে
জানা থাকে যদি জীবনের সেই নৃত্য
কালের নূপুর এক ও বহুর বহুধায় একই ইতিহাস—

আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী
প্রেমের লাবণ্যে স্নেহে কর্মিষ্ঠতায় আশ্বিনের স্বচ্ছ স্রোত
পাড়ে পাড়ে ঝিকিমিকি এক ও অনেক।
আমাকে থাকতে দাও তোমার দিনের পাড়ে পাড়ে
মাটি কিম্বা একই সে আকাশ ॥

# নাম রেখেছি কোমলগান্ধার মনে মনে (রবীন্দ্রনাথ)

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে

ধুয়ে দাও এই গ্লানি
বাষ্পের আড়ালে এই গ্রীষ্মের গৃধ্নুতা
ওড়াও ওড়াও এই কলকাতার শবে শবে গলিত তাপের গ্লানি
এই স্নায়ুর লড়াই স্বেদের আশ্রয়ে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেঙে দাও গ্রীষ্মের গোয়েন্দা তাপে বেঘোর ক্লান্তিতে
আর অঘোর সন্তাপে এই কোকাকোলা গান

সমুদ্র বাংলা আমাদের বাংলার সমুদ্র
আত্মভোলা নিয়ে চলো খুলে খুলে হুগলির
রূপনারানের মাথাভাঙার মাতলার আগে
সাগরে সাগরেরও আগে সমুদ্রে সমুদ্র
নিয়ে চলো হলদি ছাড়িয়ে রসুলপুরের আগে
উদ্দাম হাওয়ায় মলয়মরুতে কিম্বা মৈনাকমন্থনে ঝড়ে
ভেঙে ভেঙে কলকাতার গলিত নিষেধ
ডিঙিতে শালতিতে পায়ে পায়ে বালিতে বালিতে জলে জলে
বালিয়াড়ি উজানে ওড়াও
পথিক হারাক পথ কাঁথিতে তমলুকে ভাঙুক কপাল

নিয়ে চলো মনপবনের নায়ে দীর্ঘ অভিযানে
গন্ধবণিকের দেশে দূর দেশে জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায়
জাভায় বলীতে কাম্বোজে শাম্পানে শাম্পানে
চীনসমুদ্রের পারে আরেক নীলের পারে
আরেক হলদির মুখে সমুদ্রে সমুদ্র

কিম্বা চলো মহানদী কিম্বা সেই সমুদ্রসূর্যের
প্রখর মিলননাট্যে পাথরে পাথরে কেটে
আনন্দের অবিরাম কদম্ব কেশর
জীবনের জয়গানে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়াখিয়া
বালিতে বালিতে আর নীলজলে মৌশুমিতে মর্মরিত নারিকেলে
ঢেউয়ে ঢেউয়ে অগণন ঢেউ
এক ও অনেক পর পর গায়ে গায়ে
ওঠাভাঙা আয়োজন সুরের বিস্তারে

একে মেশে অন্য এক
এদিকে ওদিকে পরপর অবিরাম বাহুবদ্ধ সমবেত নৃত্যে এক
সপ্তকের অন্যোন্য শ্রুতিতে ঢেউয়ে ঢেউয়ে মীড়বাঁধা অথচ স্পষ্টও
যেন এক মিয়াঁকি মল্লারে

ঢেউ দাও সমুদ্রের ঢেউ শুচি হিম ঊর্মিশুভ্র উত্তাল সবুজ
সবুজ সুনীল ঢেউ ভেঙে দাও নিয়ে চলো বিস্তীর্ণ দোলায়
দুলে দুলে ফুলে ফুলে ভেঙে দাও মালকোশে বা কানাড়ায়
ধুয়ে দাও জলে জলে পাণ্ডুর বালিতে আর স্বচ্ছ জলে
সবুজে ও নীলে দূর ফিরোজায়
ধুয়ে দাও কলকাতার গলিত সন্তাপ
হাওয়ায় হাওয়ায়
এই স্বেদের আশ্রয় কায়েমি নিষেধ
মনে দাও ঊর্মিল আছাড় ঢেউয়ে ঢেউয়ে গায়ে দাও
লবণাক্ত হিমশান্তি মুক্তি-স্নান
সঞ্জীবনস্বাদ সমুদ্র বাংলার সমুদ্র ভারতের ভাঙো বাধা
মুক্তি দাও জলে জলে হাওয়ায় হাওয়ায় কাটামারানের পালে পালে
শীতল হাওয়ায় লবণাক্ত সঞ্জীবন স্বাদে বিস্তীর্ণ অবাধ

আমরাও গড়ে দেব বারবার হাওয়ার মন্দির
হাওয়ার ঘোড়ার রথ সমুদ্রের ঘোড়া
মুক্তির আনন্দ মূর্তি জীবনের মুক্তির আনন্দ
পাথরে পাথরে মানুষের অঙ্গীকার
অজ্ঞান পাথর খুলে খুলে মামল্ল-সৈকতে
নিস্তব্ধ পাথর কেটে আমাদের চৈতন্যের সমুদ্রে সমুদ্রে
ঢেউ তুলে সমুদ্রে হাওয়ায় দীর্ঘছন্দ তোমার বাহুতে দুলে দুলে
সমুদ্রের কোমলগান্ধার ॥

## ২৫শে বৈশাখ

আমরা যে গান শুনি, গান করি আকাশে হাওয়ায়
ফুলে ফুলে বনে পথে ঘরে ঘরে সন্ধ্যায় সকালে,
আমরা যে ছবি দেখি আঁকি স্তব্ধ ছন্দের মায়ায়
রঙের রেখার মুক্তি কল্পনার নব নব তালে
আমরা যে জীবনের গল্প রচি হাজার কবিতা
হাজার সন্ধ্যার সূর্য প্রত্যূষের হাজার সবিতা—

রবীন্দ্র-ব্যাবসা৷ নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না, বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি, খুলে দিই রেখা আর রঙ
সদাই নূতন চিত্রে গল্পে কাব্যে হাজার ছন্দের
রুদ্ধ উৎসে খুঁজে পাই খরস্রোত নব আনন্দের ।

জঙ্গম সূর্যকে জানি আমাদের জঙ্গি প্রতিদিনে
অবিচ্ছিন্ন মাসে মাসে বর্ষে বর্ষে যুগযুগ ব্যেপে
প্রতিটি উষার রাত্রে মধ্যাহ্নের বটে দগ্ধতৃণে
গলাপিচে বৈশাখীর ভবিষ্যতে ঝড়ে মেতে খেপে
প্রতিটি সূর্যাস্তে আর সূর্যোদয়ে চৈতালি নিদাঘে
আষাঢ়ে শ্রাবণে আর আশ্বিনে অঘ্রানে হিম মাঘে

আমরা তো জানি তুমি আকস্মিক গরমবাজারে
রুদ্ধগতি, গড়ি তাই জীবনের ঝরনা, রচি, কবি,
প্রাত্যহিক ফল্গুস্রোতে লাখে লাখে হাজারে হাজারে
সাগরে যে গঙ্গা আনি সে তোমারই আনন্দভৈরবী ॥

# আলেখ্য

সূচিপত্র

## মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

কেউবা কবিতা লিখি, কেউ করি জীবনকে গান
কেউ আঁকি চিত্রপট, কেউ গড়ি প্রাণের গ্রানিটে ।
নির্মাণেই সত্য জানি,আমাদের আস্তিক্য প্রমাণ
আকাশে বাতাসে নীলে, রাঙা মাটি শহরের ইঁটে,
ছন্দ গান মূর্তি চিত্রে মৃত্যুহীন সত্তার নির্মাণ ।
আমরা খুঁজি না শক্তি মদমত্ত দুস্থ অস্ত্রকীটে,
জীবনেরই মৃত্যুঞ্জয় দান ।

আমরা খুঁজি ও পাই আকাশের সাম্যের সুযোগে
বাতাসে বাতাসে মৈত্রী আমাদের ভেঙেছে প্রাচীর ।
ঠগেদের ভাগাভাগি, বিভেদের হাজার দুর্যোগে
ভাঙে না দুর্জয় মুক্তি আমাদের বিস্তৃত গভীর
সমুদ্রের নীলে যেন, যেন বিশ্বমজদুরের যোগে,
বাংলার আকাশ যেন, বাংলার চাষি যেন, ধীর
মৃত্যুঞ্জয় হাজার দুর্ভোগে !

আমরা খুঁজি না শক্তি ইঁদুরের গোপন দপ্তরে,
পঙ্গপাল নই, নই উই, তাই মরণমদিরা
আমাদের পেয় নয়, নরকের সরকারি চত্বরে
আমাদের আনাগোনা নেই তাই, ক্ষমতার শিরা
দাঙ্গায় করি না স্ফীত, জলুকার পরজীবী ঘরে
খুঁজি না শাসনদণ্ড, স্বর্ণভাণ্ড ভরি না কবিরা
সর্বনাশ হেনে ঘরে ঘরে ।

আমরা সৃষ্টির কবি, জীবনের নির্মাণের গান
আমাদের নিদ্রাহীন স্বপ্নে জ্বলে প্রাণের কংক্রিটে
তৃপ্তিহীন আমাদের কাজ চলে, মৃত্যুঞ্জয় দান
জীবনের কবিতার প্রতিমার প্রাণের গ্রানিটে
আকাশের ঐক্যে আর বাংলার বাতাসে সন্ধান
ঘাটে ঘাটে খুঁজে পাই, মাঠে মাঠে খড় আর ইঁটে
আমরা দেশের প্রাণ, প্রাণ কোথা ইঁদুরে বা কীটে ?
জনতাই জীবনের এ দেশের অসীম প্রমাণ—
আকাশে মাটিতে গড়ি ভিটে ॥

১৯৪৪

## জন্মাষ্টমী ১৩৫৪

তবুও বলেন প্রাজ্ঞ, যেতে হবে নরকের ধাপে ধাপে।

পঙ্কিল শহরতলি। কপিলগুহায় পাপে
গুপ্ত সুপ্ত ঘাট
হাজার হাজার অন্ধ উন্মাদ সন্তান
ছড়িয়েছে গুহাহিত রক্তবীজ প্রাসাদে প্রাসাদে
স্বর্ণকুহকের বলে ক্ষমতার তুষানলে ভস্মীভূত বাতাসের মতো।
রাজ্যপাট মৌরুসিপাট্টায় স্বৈরাচারে
কণ্ঠাগত শত শত দলে।

তবুও প্রবীণ কন, আমিই পুরোধা
এ লিম্‌বোর মুক্তির আহবে
করতলগত শক্তি রক্ষার উৎসবে গোখুরা, ঢেম্‌না, গোধা
কী যে জ্বালা হানে, বরাভয়ে আমি জানি।
শান্তি চাই, (মোটামুটি) শহর গ্রামের
চেয়েছি শৃঙ্খলা,
দেখেছি তো ভোটাভুটি, বিদেশী স্বদেশী হরেক শৃঙ্খল।
আমার রামের
রাজত্বের রামই নেই, হরেক সর্দার
ঠিকাদার হরেক কৌশলে শাসনে শোষণে
খেলেছে আমার এই স্থাবর স্বপ্নের রামরাজত্বেই।
বোধনের লগ্নে তবু আমি
গোষ্ঠীগত—তবু বুঝি বাংলার আকাশের মতো
গোষ্ঠীর অতীত
শুভ্র শ্যাম পীত কোনো মুক্ত বিহঙ্গম জীবনের বাণী—
(হয়তো বা তোমাদেরও, তোমারই আশায়)
শ্রাবণগগনে কম্প্র আশ্বিনের নূতন ভাষায়
গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে
সেদিনের আন্দোলনে এদিনের দপ্তরে দপ্তরে,
নরকের চত্বরে চত্বরে।

নচিকেতা চলে দৃঢ়, আশেপাশে অনাত্ম্য তস্কর
অলিতে গলিতে ঘোরে, মোড়ে মোড়ে কবন্ধের দল
এখানে ওখানে রক্তচক্ষু ব'সে, গা ঢাকে তৎপর,

লুটেরা রাক্ষস যত বাসা বাঁধে প্রাসাদে প্রবল,
ছড়ায় রাজন্যকুলে বাণিজ্যের সৌজন্যপসরা,
দেশে দেশে জ্বেলে দিয়ে মরণের লেলিহ অনল
প্রফুল্ল মুখেই হাসে, অন্নদা ধরাকে করে সরা
অজন্মায় বানে বানে চোরা কালো পাপের পাহাড়ে ।
জীবনই যে রসাতলে, ক্ষমতার গৃধ্নু মুঠি-ধরা
জীবনই যে, ঘুণ-ধরা জীবিকার উপবাসী হাড়ে
ঘানিতে গড়ায় মেদ, শোথাতুর সচল কঙ্কাল
জীবনেরই বেশ এ যে ! যুগান্তের নিশানের আড়ে
এক আঁস্তাকুড় থেকে হাত ফেরে আরেকে জঞ্জাল ।

অন্যায়ের শেষ নেই, ভ্রষ্টাচার মজ্জায় মজ্জায় !
বিদেশীর দায়ভাগে একাকার গুরু ও চণ্ডাল !
কৌটিল্যের গোষ্ঠীগানে পিতামহ তাকান লজ্জায়
শহরতলিতে এসে মৃদু হেসে বলেন প্রবীণ,
আমার সুদীর্ঘ ব্রত ম্লান কূট কুবের-সজ্জায়
এ কী তেজির্মন্দি ! লাল ধনী, নীল কোটি অন্নহীন !

লালদিঘি ব্যথায় নীল, লাল নয়,
আমাদেরই যন্ত্রণায় নীল ।
কতকাল ধবে বলো কত রক্ত ক্ষমতাউন্মাদ
খেয়েছে রাক্ষসী বলো কত প্রাণ দিঘি কত নদী,
কত লালবাজারে বেসাতি
বসিয়েছে আমাদেব নিষ্কলঙ্ক হাড়ে হাড়ে
ছড়িয়েছে ঢাকা হাতে কতই না দাক্ষিণ্য-প্রসাদ ।
লাল কবে লালে লালে কালো হল
চোরা মন্ত্রণায় হল যন্ত্রণায় নীল,
ন্যায়নিষ্কাশনে
খয়রাতে শমনে আর হাজার হাজার মাৎস্যন্যায়ে শকুনিশাসনে
জ্ঞাতি বন্ধু নির্বিশেষ চাকরির আসনে
এ যুগে ও যুগে গত-আগতের মাঝে বেঁধে দিয়ে রৌরবের মিল ।

লালদিঘি তো চিরকাল এ শহরে অশ্রুর তোরণ
লালদিঘি তো চিরকাল যন্ত্রণার অন্ধকার খনি
লালদিঘি তো শেষ পথ খোঁজে ভ্রষ্ট নেতৃত্ব আপন ।

ন্যায়ের অমোঘচক্রে লালদিঘির, অধিষ্ঠাতা শনি
লালদিঘি নির্মাতা কেবা দণ্ডধর শক্তি ন্যায়াধীন
পরমপ্রজ্ঞানে আর রুদ্র মহাকরুণায় ধনী ।
এ লাল রাত্রির আগে ছিল নাকো ত্রিলোকের দিন
শুধু ছিল ত্রিকালের স্মিতহাস্য, রবে চিরন্তন
লালদিঘি কি ? এখানে যে আসো এসো সর্বআশাহীন ।

তবু চলো নচিকেতা, তোমরা দেখেছ মৃত্যু মৃত্যুহীন
চলো সাম্পরায়ে
আমার দধীচি দেহে যতদিন প্রাণ আছে—
অনুচরাবৃত তবু অনবগুণ্ঠিত সত্যেরই নিষ্ঠায়—
চলো সবে শান্তির সেনানী
জীবনের পথে পথে তোরণে তোরণে
মর্ত্যে আর মব-অলকায় চলো বজ্রপাণি ।
ত্রিশঙ্কুর ঘূর্ণমান নরকের দ্বাবে
চলো চিত্রগুপ্তেব দরবারে
দেখে আসি, তোমাদের ভবিষ্যৎ দিন
আমার অতীত রাত্রি বর্তমান নরককিনারে
দেখে আসি, আমি যে জাহ্নবী
আপন নির্দিষ্ট ভয়ে সঞ্চিত নিজের হবি
রক্ষার তাড়নে বেঁধেছিলাম অতীতে
একক মুক্তির গূঢ় তীব্র আততিতে,
দেখে আসি সেই অন্ধ অতর্কিত অংশুমান অতীতেব ছবি ।

ভাস্বর ললাটে দেখ আশ্বাসেব প্রতিশ্রুতি ফোটে ;
প্রাজ্ঞ কন, হে নবীন রেখো না সংশয় মনে,
এ ব্রতযাত্রায় ভয় সংশয়ের ঠাঁই নেই মোটে,
এসো দেখি ইতিহাসে, এখানে অস্থিব জনে জনে
বাঁধে স্ব-স্ব মূষিকদপ্তর, পঙ্কে আরো পঙ্ক মাগে ।
এ-সেই অসূর্যলোক শুভবুদ্ধি নিত্য বিসর্জনে
এখানে আসন জোটে । হাতে হাত যান পুরোভাগে
স্বচ্ছ মৈত্রী স্মিত মুখে, বিরাট পাতালে গর্তে গর্তে
গোপন গ্লানির স্তূপকীট ফাইলের আগে আগে
মানসেব বিদ্যুৎ উদ্ভাসি । শত শত কণ্ঠাবর্তে
মূঢ় ক্রূর বীভৎস চিৎকারে, মাৎসর্যের তিক্তশ্বাসে,

পদলেহনের শব্দে, পদাঘাতে, গুপ্ত চুক্তিশর্তে
কর্কশ বাতাস সেথা চিরতরে পিঙ্গল বাতাসে
উলঙ্গ মরুভূ যেন পাঞ্চজন্য তাড়িত ঘূর্ণিতে।
স্বেচ্ছামৃত্যু ভীষ্ম যেন, তবু কন অজেয় বিশ্বাসে,
পাতালের দলাদলি চায় মর্ত্যে অমরা চূর্ণিতে—

ভূলুণ্ঠিত শক্তির ঘাঁটির
পাতালের ফণার উপরে
আকাশের নিচে প্রাণ, মর্ত্যের মাটির
আকাশের গান আসে ভেসে আসে জাগ্রতের জনতার গান ;

আমারই অলকনন্দা সাগরনিস্তারে এসে,—
বৃদ্ধ ভগীরথ কিংবা জহ্নু যেন, কন,—পরিত্রাণ খুঁজে মরে,
শেষে মেশে শত গোষ্পদের পঙ্কিল পল্বলে স্রোতহীন
আমারই নির্দেশে একদেশদর্শী একাগ্রধারায়
তমসা পুরীষস্রোত, নির্বোধ স্বার্থের বিকিকিনি
ক্লেদকীটে ভরে ঘাট, মলমূত্রে দুকূল হারায়,
অবীচিতে মন্দাকিনী !
নিঃসঙ্গ অশীতি
আমার বিজয়বার্তা তাই আজ গোত্রহীন সত্যকাম মহাজনতায়
খুঁজে ফেরে দীর্ঘ জীবনের অর্ঘ্যে দুর্বিষহ স্মৃতি ।
ভয়াবহ আমারই জাহ্নবী আজ মোহানার মহাকাল,
লাল
লালমাটি ধুয়ে ধুয়ে
লালনীল একাকার জনসমুদ্রের সমান স্বাধীন
ভেদাভেদহীন আজ তুলেছে জোয়ার
রক্তবহা জীবনের নীলকণ্ঠ যৌবনের শোভাযাত্রী ঢেউয়ে ঢেউয়ে
সূর্যোদয়ে অঘমর্ষী নীল আর মৃত্যুঞ্জয় লাল ॥

১৯৪৭

## গান্ধীজির জন্মদিনে

অশীতি, তবু অমর এই মিতা,
ত্রিকাল বুঝি থমকে তাঁর মুখে,
ক্লান্তিহীন, প্রবীণ, দেশপিতা,
অথবা পিতামহই বলো সুখে—

পিতামহই, গোমস্তার দলে।
পিতারা চলে, চালায় চোরা খুন।
পিতামহই, শিশুর জয়রোলে
যৌবনের আহবে নবারুণ

প্রাণ বিলায় যৌবনের দূত
হাত মিলায় স্বার্থহীন গানে,
প্রভাতফেরি তাড়ায় অবধূত,
পিশাচও ফেরে দুর্গতের ত্রাণে।

নির্মাণের ঐক্যে দলাদলি
মোটা গদির তলায় জ্বলে চিতা,
প্রাণের টানে হাজার কোলাকুলি,
ন্যায়ের গানে সাম্য-সংহিতা !

দীর্ঘ আয়ু, উন্মোচিত দেশ
দাঙ্গা নেই ; দুর্ভিক্ষহীন
শহরে গ্রামে একটি সুখরেশ,
শান্তিসেনা রাত্রি করে দিন।

অতীত জ্বলে কী দুরন্ত চিতা,
ভবিষ্যৎ তুলেছে অঙ্গুলি।
মানুষ, তাই অমর এই মিতা,
গান্ধীজির জয়ধ্বনি তুলি
নবজীবনে শুভ্র আশ্বিনে
আলোয় শুচি বিবাট শুভদিনে ॥
১৯৪৭

## স্মর-ক্রান্তি

সারা দিন কাটে কোথায় গিয়েছ তোমার তো দেখা নেই।
প্রিয় শরীরের মায়া
একলা মনের বিষাদে ছড়াও। তোমার মনের খেই
খুঁজে ফিরি, আলোছায়া
তোমার চোখের চিত্রগতিতে তোমার বুকের সেই
স্মৃতির বুননে বাহুবন্ধনে কোমল চূড়ার গানে,
তোমার কম্বু কটি
প্রাকৃত রূপের ফুলে ফলে জলে তারায় পাহাড়ে টানে।
হৃদয়ে পঞ্চবটী
চিত্রকূটের স্মৃতি ঘোরে তাই তোমারই যে সন্ধানে।
সারা দিন কাটে তুমি নেই তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে
উদ্বেগে কাটে দিন
তোমারই প্রাণের কুলায়ে আমার ভীরু পাখি জেনো ছোটে
জীবনের ভয়হীন,
প্রেমে জীবনের ভয় সারা দিন কে জানে কী কোথা জোটে !
এ কোন্ নরকে আমরা এসেছি অলকার দম্পতি !
শকুনের কানাকানি
আমাদের দিন বেতাল করেছে, প্রতিটি দিন আরতি
আমাদের ছিল নিত্যকর্ম রাত্রি হবিষ্মতী।
এখানে কী হানাহানি !
তবু দক্ষিণে হাওয়া ওঠে ঐ অলকার হাতছানি :
তুমি কোথা ? ডাকে নিঃশব্দের গভীরে অতনুরতি।
ডোবাই ডোবাই এসো দুইজনে দুপাশের মূঢ় গ্লানি ॥
১৯৪৬

## বৈশাখী

সকাল থেকেই আকাশে আকাশে আগামীর আনাগোনা,
মেঘে মেঘে আর হাওয়ায় হাওয়ায় কত জয়দূত ছোটে।
থেকে থেকে শিবঠাকুরের দেশে গুমোটে বন্ধ দম,
আবার আইন-কানুন হাওয়ার দমকে কী তুলো-ধোনা !
—তোমার ছবিই যোজনার আগে চলচ্চিত্র ফোটে।
এই কি কালের নিয়ম ?

বিকালে বাতাসে সজল আমেজ, বজ্রের দূর হাঁকে
বুকে বুকে যেন আশ্বাস বাজে, পৃথিবীর চোখ চাতক,
মাটির দগ্ধ মুখে বুঝি ফোটে সরস ওষ্ঠাধর,
বেলফুলে কুঁড়ি জাগল বুঝিবা প্রাণমাতানোর ডাকে,
ধুয়ে যাবে বুঝি অনেক দিনের পাতক !
—এবারে তোমার স্পর্শে করবে অমর ?

তবুও বৃষ্টি আসে না আসে না তবু বৈকালী বন্ধ্যা,
ধুলার পাইক উদ্ধত ভাবে তারা ত্রিকালেশ্বর,
মেদচিক্কণ মার্কিন গাড়ি লেকে ময়দানে যায়।
বৈশাখী কালবৈশাখী বিনা যাবে কি দুস্থ সন্ধ্যা ?
আসবে না জল ? শুধু মরীচিকা ? গভীর কণ্ঠস্বর
শুধুই শুনব—তোমার মেঘের আশা ?
ঐ আসে, ঐ অতি ভৈরব হরষে মাটির ভাষা,
অবিরাম ধারা, গুরু মৃদঙ্গে নবজীবনের গান,
রাজপথে স্রোত, রজনীগন্ধা প্রখর হাওযায় হাওয়ায়
প্রাণমাতানোর নববৎসরে অন্ধকারের বান
—তোমার মাটিতে মুখে মুখ রাখি, তোমার ছাউনি বাসা,
হৃদয়ের ছবি মেলাই তোমার গায়ে ॥
১৯৪৭

## বর্ষা

সমস্ত দিন আকাশ পুড়েছে, ধোঁয়ায় হারাল নীল,
বিকালের রোদে তপ্ত তামায় ঘনাল সজল মেঘ।
দক্ষিণে হাওয়া উত্তরে হাওয়া উষ্ণ-শীতলে মাতে,
ঈশানের মেঘে সাগরের মেঘে উদ্দাম যাওয়া-আসা,
ভয় হয় বুঝি বাজে বিদ্যুতে খেলা মেশে সংঘাতে—
প্রেয়সী ! এ যেন আমাদের ভালোবাসা।

ফুকারে ঈশান সমুদ্রশ্বাসে অর্ধনারীশ্বর,
স্বেদবিন্দুতে শীতল বাষ্পে বিদ্যুৎকণা জ্বলে।
নগ্ন বেগের শত তরঙ্গ বাহু-ভুজঙ্গে বাঁধা—
হঠাৎ তূর্যে নামে যে তীক্ষ্ণ তীব্র বাঁশির ভাষা।
বৃষ্টি মরমে পশে। নীলে নীল যমুনার তীরে রাধা
শুনত যেমন, কিংবা যেমন আমাদের ভালোবাসা॥
১৯৪৭

## বৃষ্টি চলে বৃষ্টি অবিরাম

দেখেছ কি বৃষ্টি চলে ? বৃষ্টি অবিরাম
গরম দুপুরে ধুয়ে প্রবল হাওয়ায় ধুয়ে ধুয়ে
অবিরাম বৃষ্টি পড়ে, শীতল আরাম
মাটিতে মাটিতে পথে ইঁটে ছাতে, তৃষ্ণার্ত পৃথিবী
ছেয়ে ছেয়ে। বৃষ্টি নামে, পৃথিবী তো আর এক নাম
তোমারই, কোথায় তুমি ? কর্মরত, দৃঢ়বদ্ধনীবি

যেখানেই থাক তুমি, বৃষ্টি নামে, মেঘে মেঘে যাই,
একাকার, আদিগন্ত সমুদ্রের মেদিনীমেখলা.
অথবা পাহাড় শাল অরণ্যের খাড়াই উৎরাই
ঢাকি একই আলিঙ্গনে, বিদ্যুতে ও বজ্রে দিই ডাক
তোমাকে, যেখানে থাক বাষ্পে বাষ্পে জড়াই চঞ্চলা !

তুমি ভাব দূরে বসে পার পেলে, প্রেম যে অপার,
চেতনার নীল জুড়ে মেঘে মেঘে আমার আকাশ,
তোমাকে করেছে ধাওয়া মাঘ চৈত্র বৈশাখ আষাঢ়,
সর্বদাই ছেয়ে রাখে তোমাকে যে, বিলম্বিতনীবি
পীনবক্ষ দৃঢ়উরু, চেতনার বিদ্যুতে আভাস
তোমার সত্তার পাই, ঢেকে রাখি তোমায় পৃথিবী !
১৯৪৭

## একটি প্রেমের পাঁচটি কবিতা

১

হার মেনে চলি, পলাতক জেনে চলি
বনতুলসীর মাড়ানো গন্ধে গন্ধে ।
সূর্যে সূর্যে তারায় তারায় লেগে
জ্বালিয়েছি দিনরাত্রি, জীবন জ্বালি ।

আজকের হার কালকেও হার সে কি ?

আমের বউল ঝরে যায় ফাল্গুনে,
পলাশের-বন নিঃশেষ করে আগুন,
তবুও সরস আনম্র আমবন,
তবু মল্লিকা সচ্ছল হল চৈত্রে ।
হার মেনে চলি, আজ হয়তো বা নেই
তবু তুমি আছ জীবনের পাশে দেখি,
কাল বা পরশু দেখা হবে জানি মুক্তির প্রাঙ্গণে
আজ করবীতে খোয়াই ভরেছি স্বপ্নে ॥

২

চেনে সে, তবু জানে কি শেষ-জানা,
আড়ালে গেলে ভাবনা এই চলে,
বিলিয়ে দেওয়া উজাড় করে আনা
জানে কি ? দুই নয়নে জ্বল্‌জ্বলে
আলো কি জ্বালে প্রজ্ঞাপারমিতা,
কৈলাস কি মেলে সে চঞ্চলে ?
ভালো কি বাসে ? সে যে মেঘের মিতা,
সাগরে জানি দিয়েছে বাহু মেলে,
দিনের শেষে সে-ই নেবায় চিতা,
আত্মদানে শিখর দেয় জ্বেলে ।
তবুও মন ঘুমের মায়া মেলে
নিবিড় নীল, জিজ্ঞাসায় হানা
দেয় তো আজও । রাতের তারা জ্বলে,
অনেক তারা, আকাশে যায় জানা
দ্বৈত কেন এক-কে করে নানা ।

৩

বউলের দিন হয়ে গেল কবে সোনালি আমের দিন !
কাঁঠাল-ছায়ার পথে পথে তবু ঘুরে আসি সেই দ্বারে,
এপাশে ইঁদারা ওপাশে জামের থোকা থোকা সম্ভারে
পিঁপড়ের সার অবিরাম ভরে সংসার ।
তোমার ঘরের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে ।

চামেলির দিন হয়ে গেল কবে শিরীষ চাঁপার দিন !
আমকাঁঠালের জামের বেলের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে,
এপাশে মহুয়া ওপাশে পলাশ আগুনের সম্ভারে,
ধুধু প্রান্তরে ব্যাঙ ডাকে কোথা ছারখার সংসার,
তোমার চোখের ছায়ায় আমার মনের অনেক চেনা
আসি আমাদের দিনে ।

গেরিমাটি আজ এলামাটি আজ কালো পৃথিবীর দিন !
তোমার কাজের আমার কাজের সার্থক বিশ্রামে
মাটি ফুল ফল আকাশ বাতাস জীবনের সম্ভারে
লাখো লাখো হাতে পাতব সকলে সকলের সংসার
তোমার প্রেমের ছায়ায় আমার প্রেমের অনেক চেনা
মৌমাছি এক দিনে ।

তারপরে ঐ নামল শ্রাবণ বিপুল রন্ধ্রহীন,
ভেসে যায় মোর্ মাটিআরা শত নদী
ধুয়ে দেয় দেশ জীবনের সম্ভারে,
দিনগুলি ওড়ে প্রজাপতি, রাত দেয়ালির সংসার
আউশে আমনে নবান্ন আশ্বিনে ।

৪

থেকে থেকে আসে মেঘ যেন আশ্বিনে
হঠাৎ হাওয়ায় আসে আর চলে যায়
কখনও বা আসে শালবনি পার হয়ে—
কখনও বা যায় হরলাজুড়ির পার,
আমার চোখের দূরদেশে চলে যায়,
উঠানের কোণে বসে সে জাঁতার দাওয়ায়,
রাতের আড়ালে সে আসে লুকানো দিনে,
চুপি চুপি যায় আউশের হিম হাওয়ায়,
দুই চোখে দেখি আঙিনার বার হয়ে
কাজের মানুষ ঘোরে সারা পরগনা
প্রতি গাঁয়ে তার বন্ধু যায় না গোনা—

সে কি নেবে সব দুঃখ সবাব বয়ে
তাই বুঝি তার নেই আর বাসা বাঁধার
সময় আমার দুচোখে বটের ছায়ে ?

সে শুধু অতিথি আমারই একার প্রাণে ?
আমাকেও নিক মিছিলে তাহলে নিক সে,
হাজার ঘরের আশায় বাইরে দিক সে
বলিষ্ঠ তার কর্মী-বাহুর গানে
দিন রাত্রির একান্ত এক কোনা,

পাশে পাশে নিক আমাকে ফেরার হাওয়ায়
লক্ষ ঘরের দুর্গম নির্মাণে ।

৫

কত না ভুল হয়েছে পথে পথে,
পায়ে চলার দীর্ঘ পথে ভুল,
চড়াই বেয়ে কখনো নেমে ঢলে,
রৌদ্রে আর ছায়ায় আর জলে,
অমা আঁধারে প্রবল ঝিল্লিতে,
কখনো নীল নীরব চাঁদিনীতে,
হাটের ভিড়ে, পাহাড়ে প্রান্তরে,
কখনো সোজা কখনো আঁকে বাঁকে,
কত না ভুল হয়েছে পথে পথে
যন্ত্রণার কাঁটায় বিঁধে ফুল !

তবুও চলা অশেষ মনোরথে,
তোমাকে দেব কী দিই বা তোমাকে ?
ফুল নাকি এ ভুলের কাঁটা তুলে
দু' মুঠি দেব ব্যর্থতার ফাঁকি ?
শেষ কি পথে তোমার নীড় যদি
টানে আমায়, সময় নিরবধি
পৃথিবী নয় নাই বা হল বিপুল ।
তবুও তুমি আছ যে আছ তুমি
একান্তই সত্য নয় তা কি ?

গ্রামের পরে গ্রাম যে হই পার,
বারমাসিয়া ছেড়ে মশানজোড়ে,
এসেছি আজ তোমার এই দেশে
অনেক রাত-শেষের রাঙা ভোরে
তোমাকে চিনি, তোমাকে বারবার
চেয়েছি পথে, যতই হোক ভুল !
নেবাও দীপ, মাথায় পরো ফুল,
আগল খোলো হাজার ঘরে ঘরে
আগল খোলো, খোলো তোমার দ্বার ॥
১৯৪৮

## তিন পাহাড়

তৃষ্ণার পথে তুমি এনে দাও জল,
ছায়া মেলে দাও, তুলে দাও ফল মূল,
তোমার চুলের আড়ালে শুকায় ক্লান্তি,
তোমার দুচোখে তিন পাহাড়ের গান,
পথের তৃষ্ণা মেটাও হাসির আশ্বাসে—
যদি ভুল হয় ক্ষমা কোরো, অতুলনা,

যদি ভাবি তুমি কখনোই ভুলবে না,
যদি ভাবি দেবে ঘরোয়ার ইতিহাসে
বিশ্বব্যাপ্তি, যদি ভাবি দেবে হাত
কুসমা ছাড়িয়ে বাঙাপাড়ি শালবনে,
তবে অতুলনা সেই ভুল ক্ষমা কোরো,
তোমার ক্ষমার সে তৃষ্ণা ভুলব না ।

তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান,
পাঁচ পাহাড়ে দোহাব দিই তারই ।
কাঁকর পথে নিরালা পায়চারি,
প্রতীক্ষায় কাটাই দিনমান,
হঠাৎ দেখি সূর্য খান্ খান্
ছড়িয়ে গেল পাথরে, বনচারী
তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান ।

আকাশে যেন ছড়িয়ে দিলে প্রাণ,
খাঁচার পাখি ছাড়া কি পেল, সারী ?
নবজীবনে জাগল সঞ্চারী,
প্রতিদিনের বিজয়ে তার তান ।
তিন পাহাড়ে শোনালে তুমি গান
পাঁচ পাহাড়ে দোহার দিই তারই ।

আনবে দিনে রাত্রি বুঝি, নিটোল দিনখানি—
বনের দেশে তোমার দিন তোমারই হাতে আনি ।
নীরব বন, কূজনহীন পাহাড় সারে সারে,
সোনালি বালি নির্নিমেষ স্রোতের ধারে ধারে,

চতুর্দিকে কালো পাথর ভেদাভেদের গ্লানি
দুপুর রোদে আবেশে ভোলে, একটি বনবাণী
এই পাহাড়ে ওই শিখরে, থেমেছে কানাকানি,
চাঁদিনী যেন, তোমার চলা দোতারা ঝংকারে,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি ?
উপল থেকে উপলে যাওয়া, দোলে অরণ্যানী ,
দুইটি চূড়া মেলায় হাত আড়ালে জোড়পাণি ;
তরল চলা, নিরুদ্বেগ নিভৃত সঞ্চারে ;
এলিয়ে চুল জ্বালালে দিন স্বচ্ছ অঙ্গারে,
কালো পাথরে মহাশ্বেতা সজল ঝল্‌কানি,
আনবে দিনে রাত্রি বুঝি ॥

## ৩১শে জানুআরি ১৯৪৮

অনেক অনেক মৃত্যু, ঘৃণ্য মৃত্যু,অপঘাত,
ঘাটে ঘাটে পলিমাটি ছেয়ে গেছে শবে ।
গঙ্গার যমুনার মেঘনার শতদ্রুর অশ্রুর প্রপাত,
রক্তমাখা ক্রূর শত অন্ধ ক্ষমতার হত্যার উৎসবে
পিতৃপিতৃব্যের পাপে
ছেয়ে গেছে সারা দেশ দোয়াব পঞ্জাব বদ্বীপ সন্দ্বীপ
এ নদীমাতৃক দেশ জননী এ জন্মভূমি ।

শকুনের ডানার ঝাপট শিবার ফুৎকার
আর্যাবর্ত চষে খায় নিবে যায় সভ্যতার হাজার প্রদীপ

তবু তুমি হিমালয়,
হাজার নদীর উৎস,

মানসহ্রদের স্বচ্ছ সূর্যালোক,
এ নদীমাতৃক দেশে প্রাজ্ঞ পিতামহ
বিরাট আকাশ,
মৃত্যুঞ্জয়, প্রাণবহ,
পৃথিবীর মানদণ্ড
সমুদ্রে সমুদ্রে ন্যস্ত দুই হাত :

শকুন সেখানে মরে রুদ্ধশ্বাস, কৈলাস হাওয়ায়
শিবা মরে আপন কামড়ে, সেই প্রাণের চূড়ায়,
যেখানে ঠিকরে ত্রিনয়নে রুদ্র রৌদ্র প্রেমের প্রসাদ
গিরিশের তুষার মুকুরে ।
শঙ্খচূড় অক্ষম অবশ পড়ে যায় ঝরে যায় সর্পিল নহুষ
পুড়ে যায় শূন্যে শূন্যে ছিঁড়ে যায় কুটিল কুণ্ডলী
ঊর্ণনাভ নেমে যায় ঘৃণ্য রসাতলে ।
জীবনে জীবন দিলে মরণে জীবন তুমি, জীবনমৃত্যুর হলাহলে
ভেদ দিলে মুছে
ধুয়ে দিলে মন্দাকিনী নির্ঝর শীকরে ।

নদীতীরে শুভ্র সূর্যালোকে
মিলি শোকে, জীবনের বাণী
আনি গ্লানির তর্পণে, আমাদেরও গ্লানি
আমাদেরও পাপ তোমার এ মৃত্যু অভিশাপ
এনে দিলে ঘৃণার শপথ, ঘৃণ্য জিঘাংসু উন্মাদ ক্ষমতার প্রতিবোধে
মিলিত দুর্জয়
তোমার পৌত্রেরা আর দৌহিত্র প্রপৌত্র অগণন

শোক আজ স্বচ্ছস্রোত ক্রোধ মৈত্রী খরতোয়া
জনসাধারণ
আমাদের বিদীর্ণ হৃদয়ে ॥
১৯৪৮

## আষাঢ়

মনে হয়েছিল অনাবৃষ্টিই নিত্য
দগ্ধে দগ্ধে দিনগুলি বুঝি মরবে,
স্নায়ুর অশ্রু প্রতি শরীরেই ঝরবে,
থেকে যাবে মাটি রুক্ষ আকাশ রিক্ত ।
তবুও আষাঢ়ে পূর্ব-মেঘেরা নামল
আমাদের এই প্রথম দিনের আষাঢ় ।

মনে হয় বুঝি পৃথিবীর জ্বালা থামল
মনের হরিষে নিন্দ যাওয়ার ছন্দে ।
ওরা তাই নত সজল মাটির গন্ধে
রুয়ে রুয়ে যায় মাটির অবাধ বিত্ত ।
প্রকৃতি সেই তো পৃথিবীর দাবি মানল !

জীবন মানবজীবন থাকবে রিক্ত !
কবে যে মানুষ-ও আষাঢ়ের গান করবে
আমাদের এই নবজীবনের আষাঢ় !

## একমাত্র মুক্তি স্রোতে

দুর্দান্ত শূন্যের পাকে বৃথা ঢালে লুব্ধের প্রলাপ,
ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ঢাকে অশ্রুময় চরম ব্যর্থতা,
বিকল বুদ্ধিতে ছলে মেশাবে কি বাহুর প্রতাপ
কৌটিল্যের কটূক্তিতে, কোনো কোনো চতুষ্পদ যথা
কণ্ঠে দন্তে নখে হানে পান্থজনে ক্ষিপ্ত অভিশাপ !
অথচ মানুষ সেও, লিখন-ও-পঠনক্ষমতা
আছে শুনি, আমাদেরই সমগোত্র, তাই অপলাপ
তার মুখে মানায় না, একচক্ষু সাজে না মত্ততা ।

ধৃষ্টতা স্বীকার যদি করে যদি নহুষ দুর্গতি
উন্নাসিক ছাড়ে তবে হয়তো বা ক্ষমার আশ্বাস

উন্মুক্ত চেষ্টায় পাবে উত্তীর্ণের প্রাণের বিস্তার,
যেহেতু অন্ধের আত্মরক্ষা শুধু ধ্বংসেরই প্রয়াস,
গোষ্পদে মণ্ডূকই হয় নেতা কিংবা একচ্ছত্র পতি,
একমাত্র মুক্তি স্রোতে করতোয়া কিংবা তিস্তার ॥

১৯৪৮

ভুলের কাঁটা আকাশে দাও মিলিয়ে,
ভুলের জ্বালা এঁকে তারায় তারায় ।
কতো না ভুল করেছি আহা মাটির মতো ভুল,
আষাঢ়ে যেন অকাল বৈশাখ !

ভুলের শেখা হাওয়ায় দাও বিলিয়ে,
মনের গায়ে কেটে, স্রোতের ধারায়,
মাটিতে দাও শ্রাবণগানে নবজীবনে ডাক,
পোড়া মাটির মর্মে তোলো ফুল ।

আমরা যদি ভুলই করি তবে,
কোনোই ভুল না করি যদি, তবু
ক্ষান্তি নেই ক্লান্তি নেই, আমরা যেন মাটি,
ঋতুর পরে ঋতুর দাবি, সদাই নবীনতা ।

কোন্ অতীতে যাত্রা শুরু কবে,
প্রকৃতি, তুমি জানো কি মানুষের ?
আমরা জানি মানুষ আজই খাঁটি,
জিজ্ঞাসায় আশায় নেই তৃপ্তির হীনতা,
জীবন এই জীবনই জানি কেবল এক প্রভু
বীরভোগ্য জীবন মানুষের ॥

## রাগমালা

পরিতোষ সেন-কে

১

আমাদের শুভদিন প্রতিদিন, শ্রাবণ আশ্বিন
অঘ্রান ফাল্গুন আর আষাঢ় ভাদ্রের
জলে জলে থৈ থৈ কিংবা রৌদ্রে রৌদ্রে তলোয়ার,
শিশিরে ঘনিষ্ঠ মৃদু, উল্লসিত বসন্তবাহার,
বানডাকা পাড়ভাঙা সূর্যে মেঘে মাটির আর্দ্রের
মিলনের স্পন্দে স্পন্দে জীবনের সৃষ্টিময় দিন ।

তোমাকে কী দেব বলো ? আমার রাত্রিতে
তুমিই আকাশ, ঘুম, স্বপ্ন, তুমি পাশে জেগে থাকা ।
সবই তো তোমাকে ছুঁয়ে, দিনগুলি যেমন সূর্যেই,
তোমাকে যা দেব তাই তোমারই তো দান চেয়ে রাখা,
যেমন বাজাই সব প্রত্যহের জয়গান কালের তূর্যেই ।

ভালোবাসি সেই কথা তোমাকে তো বলি বার বার
আকাশ যেমন বলে, মাটি শোনে রৌদ্রে মেঘে আর
অন্ধকারে বার বার । তুমিই শিউরে ওঠ
বর্ষে বর্ষে মাটির মতন, ইতিহাসে যেমন মানুষ ।

কী বলব বলো, জীবনই যে এক বলা
ঘনপল্লব ফাল্গুনবন কোনো,
প্রাত্যহিকের অনন্ত পথে অরণ্যছায়ে চলা,
প্রতিদিন শোন, বৃথাই পাপড়ি গোন ।

সে পথের শেষ জীবনের শেষ তীরে
তোমার চলারই শেষে,
তোমার আমার একই পথ ঘুরে ফিরে
পাহাড়ে সাগরে একাকার এক দেশে ।

তুমিই এনেছ প্রিয়া এ জীবনে আমার, তোমারও,
আমাদের দেহেমনে এ জীবনে প্রত্যহের যে পরিপূর্ণতা,

তার ফুল দিই আজ চোখে চোখে মানসের তীরে,
এই আজ প্রতিদিন ভরুক শূন্যতা নীল প্রেমের পাত্রের
অভ্যাসের মৃত্যুঞ্জয়ে—তোমার, আমারও, ফিরে ফিরে
পাত্রের শূন্যতা নিত্য ভরে দিক জীবনের নিত্য নব ঘাটে ।

তুমি এসো প্রতিদিন হে জীবন হে প্রেয়সী আমার হৃদয়ে,
এসে তুমি বাহুবন্ধে প্রতিদিন উভয়ের কাজে মৃত্যুঞ্জয়ে
কালের উজানে এসো, সময়ের কালীদহে কুমুদ-কহ্লারে
তোমার আপন সত্তা আমাকে সম্পূর্ণ করে দেহ-মন-স্নায়ু
বছরে বছরে প্রতিদিনরাত্রি । দীর্ঘ করো আমাদের আয়ু
উভয়ের আকাঙ্ক্ষায় প্রত্যেকের একতায় প্রত্যহের অসীম হৃদয়ে
ব্যক্তির একে ও দ্বৈতে, ব্যক্তি আর সমাজের দীপক-মল্লারে ॥

২

তুমি পাশে নেই, আকাশে নেমেছে যতি ।
তোমার আলোর ক্ষণিক ক্ষতিকে জ্বালাই সন্ধ্যারতিতে
দিনের প্রণতি রাত্রির একা অন্ধকারে ।

প্রেমের লয় বিলম্বিত, প্রেম,
জীবনে জ্বলে সাঁঝের দেরিতেই;
মৃত্যু যবে সমের হাতছানি,
তখনই প্রেম বিজয়ভেরীতে ।

তোমাতে আমাতে কি বাঁধিনি মিল ?
জীবনে-মরণে কি বাঁধিনি বাসা ?
পয়ার ফেলে দাও, ভাঙুক খিল,
মাটিতে মেটে সে কি নীল তিয়াষা ?
মন্দাক্রান্তায় সজল ভাষা ।

তুমি যদি বলো অঘ্রান চেনাশোনা
তোমারই অনেক, নেব নতশিরে মেনে,
রাখব না বেঁধে চৈত্রের চীর টেনে ।
জীবনে মরণে মাঘে ফাল্গুনে একই তো আঙিনা প্রিয়া,
সর্বদা আনাগোনা ।

পাহাড়ে পাহাড়ে কালোর কঠিনে নীরদনীলিম কান্তি
সবুজে ও লালে মীড়ে মীড়ে ঘোরে খুশিতে চকিত গোপাল,
মাটির মহিষে শাদা বকে খোঁজে নব্যন্যায়ের ভ্রান্তি।
হঠাৎ মেঘের আবেগে ত্রিকূট বিরহগুরুণা কান্তা
খোঁজে তার প্রাণ কৃষ্ণ প্রদোষে কোমল যে দিঘারিয়া
—প্রকৃতিতে খুঁজি প্রতীক দুজনে, আনি যে দ্বন্দ্বে শান্তি।

আমার গ্রামটির হাটের বটের
ছায়ায় এনে রাখি দগ্ধ মন,
জীবনযাত্রার জীর্ণ পটের
ধূসরে মেলি পাখা যে দুই জন,
সেই দুই জনে আজ জীবনই,—রূপকে—
জরতী যৌবনে, যযাতি যুবকে।

প্রেমের গানে মৃত্যু হানে আখর,
নতুন সুর এবারে দাও কবি।
প্রবল রাগে ভাসাক স্রোতে পাথর,
কণ্ঠে তার জ্বালাও গ্রহরবি ॥

৩

থরে থরে জমে এ কী বা অপার অন্ধকার ;
গোলাপের বন কালোয় কালোয় হয়ে গেল একাকার,
দুস্থ দিনের কান্নায় কালো আমাদের রাতগুলি,
গোলাপবাগানে আমাদেব ফুল তুলি আর নাই তুলি।

আকাশ একটি কালো কান্নার বাসা
কিংবা 'কলোনি' হাজার দুঃখ জুড়ে ;
হৃদয় সেজেছে ভিখারি সারাটা বিবাগী জীবন মুড়ে।

তারপরে নীলে একে একে জ্বলে আলো,
বোল্‌শয় বালে, হাজার নাচের তালে
কিংবা ফেরারি জনতা বুঝিবা ফেরে জয়-তারা ভালে।

জানি এই কালো ধুয়ে যাবে নীলে
ব্যাপ্ত নিখিলে, আবার লাগবে ভালো,

দুয়ার ভাঙবে অন্ধকারের বুকচাপা খিলে,
অন্ধ ব্যথার রক্তে রাঙবে আলো,
রাঙবে গোলাপবনের লক্ষ গোলাপ,
সদ্য গোলাপে ভাঙবে রাতের কালো ।

কারণ পৃথিবী দুর্মর আর দুর্জয় তার আশা,
আজও আছে মাতা মানুষের মুখ চেয়ে,
কবে দিনে রাতে সুর পাবে তার ভাষা,
কবে প্রকৃতির নিয়মে বাঁধবে বাসা
কবে যে বাঁচবে সুখে দুখে তার কোটি কোটি ছেলেমেয়ে,
কারণ পৃথিবী মানুষেরই, জনসাধারণ৷পৃথিবীর।

তাই এরা বীর, এদের আশায় ক্ষয় নেই,
বাঁশি শুনে তাই এরা ছেড়ে যায় ঘর,
তাই এরা ভালোবাসে সুখে দুখে,
শতগ্লানি তাই সয় হাসিমুখে,
মরণ-কে করে জীবনের নির্ভর,
পর-কে আপন, আপনকে করে পর ।

এদের আঁধার রাত্রিদিনের জননী ।
অন্যের পাপের বোঝা, নিজেরও ভুলের
কাঁটার কান্নায় তোলে কালের ফুলের
বাগানে এরাই ফুল স্বজন-সজনী ।
জন্মের যন্ত্রণা আজ আঁধার রজনী ॥

## একটি পূরবী

ক্ষণিকে অক্ষয় কান্তি, সূর্য অস্তে, রাত্রি অনাগত,
শুধুই রক্তের আভা শুধু বিশ্ববিস্তৃত আকাশ,
আগুনে বিহ্বল যেন মর্মে মর্মে আমারই বিষাদ :

তোমার দূরত্ব নিত্য আমার ক্রৌঞ্চের দিনে অব্যর্থ নিষাদ।

হয়তো বা দূরে নেই, মন শুধু কাজের প্রান্তরে
আমার সত্তার প্রান্তে, এপাড়া ওপাড়া,
কিংবা সমুদ্রেরও পারে ;
ঘরে কিংবা বাইরের দ্বারে মেঘে মেঘে
আমার হৃদয় একা, অমাবস্যা,
অন্ধকারে পাই নাকো সাড়া
নিজেরই নাস্তিতে যেন,
কখনও বা পূর্ণিমাই,প্রতিপদ দ্বিতীয়ার ভয়ে
বারে বারে শীর্ণ থেকে শীর্ণতর।

চাও যদি তবে তুমি এই শূন্য ধরো,
পরিপূর্ণ গ্রহণের নিঃশেষ ভাণ্ডারে
নিস্তব্ধের হৃৎপিণ্ডে সমগ্র-তে তুমিই বিরাজো
অথচ এও তো ভালো, তোমাকেই চাই,ঘরে,
প্রেমের আগুনে লাল সন্ধ্যার আকাশ,
তারপরে নীল অমাবস্যা আর কখনও বা পূর্ণিমাই
তোমারই যা চলিষ্ণু আভাস।

বেঁচে আছি তাই আজও।

## এই ধনী বসুন্ধরা

তুষারে তপস্যা কার ? আজ বুঝি আকাশে হিমানী,
দিকে দিকে শাদা মেঘে কুয়াশায় একফালি নীল,
নীলকণ্ঠ যেন দিল গৌরীর পাণ্ডুর ভালে চুমা,
জ্যোতিষ্ক নয়ন জ্বেলে তাই বুঝি নির্নিমেষ উমা।

তৃতীয়নেত্রের তাপে ভেসে যায় মেঘেরা ঊর্মিল,
প্রহরান্তে দিন আসে মেঘে মেঘে রৌদ্রের সন্ধানী।

পশ্চিমা হাওয়ায় রৌদ্রে হেমন্তের বিরামবিহীন
তীব্র মাধুরীতে ভরে আগামীর মর্মরিত দিন।

পৃথিবীর শ্রোণিভারে নিটোল টিলায় চেয়ে থাকি,
সারাটা দুপুর কাটে সচ্ছল কূজন শুনে যাই,
ভাবি কবে এই ধনী বসুন্ধরা প্রসাদ বিলাবে,
বীরভোগ্য রূপবতী ! জনে জনে, সবাকে একাকী,
সম্পূর্ণের স্বাদ দেবে, জনে জনে স্বভাবে মিলাবে—
এই রৌদ্র এই ছায়া সুন্দরীকে দেখে ভাবি তাই ॥

## হোমরের ষট্‌মাত্রা

ছিল একদিন কস্তুরীমৃগ কৈশোরকের চিত্তে,
ঝরনার বেগ দ্রুতমুহূর্ত পাহাড়ে মাত্রাবৃত্তে
তীব্র তড়িতে মেলাতে চেয়েছি, ক্ষণিকাকে চুম্বনে
সংবৃত একা ত্রিকাল খোদাই পরম চিরন্তনে ।

গ্রীষ্মে ঝরনা হারায় পাথুরে বালিতে.
বর্ষায় ছোটে ঢল ভেঙে জল ঢালুতে ।

আজকের দুপাশে সমুদ্র দূর দিকে দিকে দেয় পাড়ি
অনেক নৌকা অনেক জাহাজ গাঙচিল ঝাঁকে ঝাঁকে,
হৃদয়ে মিশেছে আরেক কালের আবেক দেশের খাড়ি.
পাহাড়ের বেগ স্মৃতিমন্থিত আরেক বেগের বাঁকে ।

সেদিন আমার বাসা ছিল মাঘ ফাগুনে.
বিভোল সে গানে কালের ত্রিতাল কে শোনে ?

অনেক জনের অনেক দিনের বহু বছরের স্রোতে
কত না রৌদ্রে সুরবেসুরের ঊর্মিল সংগীতে
তোমার আপন আবেগে মেলাই আমার সাগর যাত্রা,
সাফোর ঝরনা কলকল্লোলে হোমরের ষট্‌মাত্রা ॥

## ঐ মহাসমুদ্রের

ঐ মহাসমুদ্রের অশান্ত গর্জন
দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে চলে, আসে,
চলে যায় যাত্রীদল
বোঝাই বা খালি নৌকা বা স্টিমার,
আমরাও, আমরা সমুদ্রে দুলি, ভাসি, ডুবে যাই
অন্ধকার হিমস্পর্শে সমুদ্রের অগণন জীবনে জীবনে
হাঙরের তিমির শিকারি, হয়তো শিকার।

তবু দেখ তোমার ভিখারি
এসেছি তোমারই পাশে, নূতন ঊষার স্বর্ণদ্বার
দেখেছি তোমারই চোখে, অমর মহিমা
তাই দেশে দেশে বর্ষে বর্ষে
সময়ের তীর ধুয়ে ধুয়ে
চূর্ণ করে নিজ মর্ত্যসীমা মুহূর্তের সংহত ফাল্গুনে,
—এই তো দুপাশে মহাসমুদ্রের অস্থির গর্জন গতির প্রচণ্ড হর্ষে–
এসেছি তো তাই
তোমার বাহুতে স্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্বচ্ছ নীল শীতল লাগুনে ॥

## সমুদ্ররেখা

১

বৃষ্টি কোথা ? রৌদ্রে ঝরে শিলা, কিংবা আগুনে তুষার,
প্রবল প্রপাতে ছুটি, অন্ধ চোখে বালি অবিরত,

পার্থের পৃথিবী নগ্ন দুঃশাসন দুর্বার মরুতে—
বালিতে ছুটেছি—ব্যর্থ বর্তমান জীবনের মতো।

ছায়া কোথা ? শুধু সোনা পুড়ে পুড়ে বালিতে নিষ্ঠুর,
আমাদের জীবনের মতো ব্যর্থ, লবণাক্ত জলে।

হঠাৎ বালির যুগ শেষ হল ; মিলনে বিধুর
ডোবাই সমগ্র সত্তা নীলাম্বরী ঢেউয়ের আঁচলে ।

২

দগ্ধ দিন দূর স্মৃতি—অতীতের জীবনের মতো,
কে ভাবে দুপুর গেছে দুঃস্বপ্নের মরুদাহ জ্বেলে !

শীতল আশ্লিষ্ট হাওয়া আবেগে বলিষ্ঠ, অবিরত
আমার হৃদয় খোলে নীল অন্ধকারে মেলে মেলে,

আকাশ বিছায় লক্ষ লক্ষ হাতে আকাশের নীল,
ঢেউয়ের পাপড়িতে জ্বলে লক্ষ লক্ষ তারার শিশির,

রাত্রিতে সমুদ্রে মেশে মানবিক প্রথম নিখিল,
আমরাও—মন আর হাওয়া আর ঊর্মিল শরীর ॥

## রূপান্তর

তুমি কি চলে গেলে ভিন্ন দেশ ?
দু' হাতে দিয়ে গেলে ভোরের গান,
দিনের পর দিন শুনি সে রেশ,
চৈত্র-স্মৃতি হল রৌপ্যকেশ,
আমার দিন হল যে অঘ্রান ।

দু' হাতে ভরি হিমে লালগোলাপ,
পাহাড়ি হাওয়া প্রেম, তার আবেশ
জীয়ায় মাটি যেন শিকড়ে তাপ ।
কার যে স্বাধিকার ! ভোগ্যশাপ
কেন যে ! কবে হবে বর্ষশেষ ;
ক্ষান্ত ফাল্গুনে বিপ্রলাপ !

তুমি যে গেলে, জান তুমিই দেশ ?
তুমিই আশা, তার তাই প্রতাপ ।
দিনের পরে রাত ছদ্মবেশ,
মাটির মতো জাগি, হিম আবেশ
ঝরাই ডালে ডালে, তোমারই তাপ
হৃদয়ে ধরে রাখি, সে আশ্লেষ
মল্লিকায় আনে লালগোলাপ ॥

## এড্‌গার এলান্‌ পো-র সম্মানে

সাবিত্রী ! তোমার রূপ আমার নয়নে
প্রাচীন ময়ূরপঙ্খিসম, মনে হয়,
সুগন্ধ সমুদ্রে চলে মন্থর গমনে,
শ্রান্ত দীর্ঘ পথক্লান্ত প্রবাসীকে বয়
আপন স্বদেশে তার একাগ্র তন্ময় ।

কতো না দুরন্ত সিন্ধুবিহারের পরে
তোমার অতসী কেশ, সারস্বত মুখ,
নির্ঝর তোমার লাস্য ফিরায়েছে ঘরে
মথুরার অলৌকিক গৌরবে উন্মুখ,
বৈভবের ইন্দ্রপ্রস্থে অমর আখরে ।

ঐ ! দেখি সমুজ্জ্বল গবাক্ষবেদীতে
তোমাকে প্রতিমাসম আভঙ্গে নিশ্চল,
মর্মরপ্রদীপ হাতে নিথর অঞ্চল !
আহা ! মনসিজে ! জ্বেলে দিলে ধরাতল
স্বর্লোকের পুণ্যময় জ্যোতিষ্কসংগীতে ।

## মেলালেন তিনি মেলালেন—২১শে জানুআরি

দু' কানে আসে গান তো নয়, সমুদ্র
ক্ষুধার রাগে অনাচারের জ্বালায় ।
গৌরী দেখ মানসহ্রদে কী রুদ্র
তুফান তোলে, কিরাত দূরে পালায়,
হৃদয়ে গান থমকে যায়, মাতে
লক্ষ লোকে কালের সন্ধ্যাতে ।

মেলাও কবি লক্ষহাতে মেলাও ।

এখানে দিনরাত্রি নীলা ঠিকরে
মাটির ঢেউ চুনিতে আর পান্নায় ;
ইন্দ্রনীল মরকতের শিখরে
ছায়া ঘনায় বঞ্চিতের কান্নায়,
গন্ধবহ থমকে যায়, মাতে
সকাল থেকে রুজির সংঘাতে ।

মেলাও ছবি একতাবাতে মেলাও ।

হিমালয়ের নামল চূড়া সমুদ্রে,
লগ্ন যেন নামে অমোঘ বজ্রে,
অথচ ধীরে বৃহতে কী-বা ক্ষুদ্রে
পাহাড় যেন প্রজ্ঞা আর ধৈর্যে,
ত্রিকাল যেন থমকে যায়, মাতে
ইতিহাসের দীপ্ত ইস্পাতে ।

কোটি কোটি হাতে কৈলাস এক মেলালেন ॥

## যামিনী রায়ের এক ছবি

(পটলের জন্য)

কেবলই কি লয় কাটে ? জাগে মরণের মরুভূমি ?
মাথার রুপায় ঢাকে হৃদয়ে সূর্যঘটে সোনা ?
সদা ভয় কে যে যায় সে কি আমি অথবা সে তুমি,
তাই রাত্রি হিরণ্ময় তাই দিনগুলি জোড়ে বোনা ?

আকাঙ্ক্ষার সূর্যোদয়ে মেলে নাকি সন্ধ্যার আরতি ?
তোমার আমার গানে প্রেম-মৃত্যু বিবাদী মূর্ছনা
একাকার, কৈলাসের যেমন এক উমা আর সতী—

এ দ্বন্দ্ব ব্যাপ্ত যে সারা জীবনেই, গঙ্গা আব গোবি।
চোখে কানে ভরে দেয় ঘ্রাণে-ঘ্রাণে প্রকৃতি সুন্দর,
অথচ সমাজে জীর্ণ স্ববিরোধে অপ্রাকৃত ক্ষতি,
অথচ কুৎসিত গ্রাম শহরের জীবন বর্বর !
প্রকৃতি বৃথাই গায়, মানুষের ক্ষোভের নির্ঝর
চোখের ধূসরে আঁকে যামিনী রায়ের এক ছবি।

ত্রিকালের তিন তালে গড়ো তুমি একটি ভৈরবী ॥

## কোণার্ক

(অশোক মিত্র-কে)

১

আকাশে বালিতে সূর্য আদিগন্ত উন্মুক্ত মুখর কলরোলে,
চোখে সূর্যমায়া জ্বলে, কানে বাজে নির্মাণের জনতার হাসি,
মাকাড়া মুগ্নী আর বেলে পাথরের নৃত্যে করতালে খোলে
জীবনের সাধারণ্যে আনন্দের তীক্ষ্ণ সুর ওঠে পাশাপাশি

নির্মাণের জয়ে জয়ে, মানুষের জয়ে জয়ে ; ভাস্কর স্থপতি
এ দেশের মানুষেরই প্রাণসূর্য উঠে যায় আকাশে আকাশে,
অনড় পাথরে এই জড় পৃথিবীর দেহে যেন বা উদ্ভাসে
লক্ষ লক্ষ কর্মময় মানুষের মিছিলের একাগ্র আরতি ।

ওরা কারা ? শূন্যজয়ী কারা ওই ভরে দেয় শূন্যের কলস ?
জীবনে সহস্রদলে কারা ওই ফুল তোলে, নেই মৃত্যুভয় ?
এরা কি সবাই বীর, প্রত্যহের অশ্বারোহী, কর্মী অনলস,
সবাই অপরাজেয়, জীবনে নির্মাণে এক সংহত তন্ময় ?
তাই বুঝি মধ্যাহ্নের চন্দ্রভাগা বয়ে যায় কোণার্কে অম্লান,
চোখে ভাসে সমুদ্রের এদেশের সেকালের মাল্লাদের গান ।•

২

স্তব্ধ সন্ধ্যারতি, মরু নিয়াখিয়া, বাসরের রাত্রি হর্ষহীন,
আমাদের জীবনের চূড়া নিত্য ধূলিসাৎ, পরাজিত দিন ।

বরঞ্চ, অহল্যাচিত্ত রূপান্তরে হোক ঊর্ধ্বে পাষাণ-দেউল :
আমি রই খিলানের আলম্বিত শূন্যাবর্তে খোদাই কিন্নর,
যে শূন্যে কিছুই নেই, যেখানে বিরাজে শুধু প্রহর প্রহর
যন্ত্রণাই, ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক্, প্রত্ন পৃথিবী পৃথুল ;
যেখানে পাথর ক্ষিপ্র নৃত্যরূপে ঊর্ধ্বশ্বাস, বিরাটে বিলীন,
যে বিরাট দিবারাত্রি আলো-অন্ধকারে নিত্য দুহাত বাড়ায়,
কেবল চরম এক বিদায়-উদ্‌গ্রীব মুখ, শেষ আকাঙ্ক্ষায়
সত্তার দুর্দম্যবাক্ সমুদ্রের ঢেউ-এ ঢেউ-এ ত্রিকাল-মসৃণ ;

কেবল নিছক এক পাথরের মূর্তি, তবু আন্তর আভাস
স্বত মাধ্যাকর্ষে মানে স্বপ্রতিষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ সুষমাগম্ভীর—
সে মৃদঙ্গে করতালে যেই শূন্য মহাকাল নিঃসঙ্গ আকাশ
নীরবে আঘাত হানে, হর্ষে হর্ষে বেজে ওঠে কোণার্ক-মন্দির ।

৩

সচকিত নারিকেল, ঝাউবীথি জেগে ওঠে, সমুদ্রের তালে
সূর্যের মন্দিরা বাজে, চোখে কানে মর্মে মর্মে মর্ত্যের জীবন
নিঃসঙ্গ কোণার্কে তোলে সুন্দরের ঘননৃত্যে মুখর সকালে
কত শিল্পী মজুরের মাঝিমাল্লা কুলিদের কর্মিষ্ঠ গুঞ্জন !
কত না দ্বাদশশত কত শতসহস্রের বাটালি তুরপুনে,
কত লক্ষ মানুষের জীবনের আনন্দের বিস্তৃত আকাশ
পৃথিবী পাথরে বাঁধে লক্ষ লক্ষ মূর্তিভঙ্গে, এককে মিথুনে,
ফুলে ও লতায়, ফলে, পল্লবিত গাছে. শত জীবে ! রূপাভাস
আশ্চর্য এ আমাদের দেশের মানুষ দিলে, সূর্যের সমান
প্রবল প্রেমের চোখে সর্বজয়ী জীবনের প্রত্যক্ষ আবেগে ।
গ্রামে গ্রামে শহরে বন্দরে যত বঞ্চিতের এবং বন্দীর
বিজয়ী জীবন তাই শত সহস্রের হাতে রক্ত-সূর্য লেগে
অমর ঐশ্বর্য বাজে শিল্পীর তন্ময় ধ্যানে সৌন্দর্যে গম্ভীর—
নির্মাণে চঞ্চল ভিড়ে জেগে ওঠে কোণার্কের মন্দির-শ্মশান ॥

## আন্দ্রমিদা

তোমার প্রবল হাতে তুলে দিই এই অবসাদ, আন্দ্রমিদা,
তোমার আয়ত চোখে চোখে জ্বালি আমার বিষাদ,
কালের মশালে ক্ষণিকের এই কালো অবসাদ
তোমার লক্ষ নীহারিকা-জ্বালা চোখে ।
উল্কা জাগাও শহরের শবে পাঁচটা-ছটার ট্রাফিকে,
তারায় তারায় জ্বালাও জীবন জীবনেরও চারিদিকে
বিদ্যুতে ধাও নিরালম্বেরও পূর্বাপরে
আকাশের মতো কালের আবেগে নাক্ষত্রিক চোখে ।

আশার কার্যকারণ জাগাও ক্লান্তিতে,
বৈকালী করো উষার মুক্তিসিক্ত,
একটি সন্ধ্যা ইতিহাস করো সারাটা জীবনে দীপ্ত,
যেমনটি হয় পূর্ণিমায় বা অমাবস্যায় সূর্যের চোখে চোখে,

যেমনটি হয় তারায় তারায় লেগে সংঘাতে ক্রান্তিতে
নতুন মানুষ নতুন পৃথিবী নতুন সূর্য, আন্দ্রমিদা ॥

## সে বলে

সে বলে, জীবন হবে নাকি দুঃসহ,
সাবিত্রী নয়, বেহুলাও নয় তুল্য :
সে নাকি মৃত্যুনাট্যে সতীর মূল্য
দিতে চায় তাই একান্তে অহরহ ।
আমার প্রেমের পাথেয়ে সে হাতে হাতে
ছেদ দেবে শেষ ফুলশয্যার রাতে ।

বলি, তাই হোক, নিঃসঙ্গের দিন
আমাকেই দিয়ো, করব না আমি শোক,
মৃত্যুর কাছে দেব না কিছুই ক্রোক ;
বঞ্চিত রাগে ত্রিভঙ্গে হবে লীন
ইলোরার গায়ে ত্রিকালহন্তা যম,
তোমাতে আমাতে মিলবে কালের সম ।
অন্তত এই বলব—আজকে রোখ্,
জানি না সেদিন কী বলব তুমিহীন ॥

## গুপ্তচর মৃত্যু

তোমার অভাবে আজও বেঁচে আছি
নিত্যই অভাব
মেঘের যেমন রৌদ্র প্রতিদিন,
কখনও কখনও অবশ্য শ্রাবণ আসে,
তাতার সওয়ার কখনও বৈশাখী,
ভাদ্রের কিংখাবে হাসে কখনও বা হালকা আশ্বিন,
কখনও পৌষের ঝক্‌ঝকে তলোয়ার ।

জানি আছ, সেই ঘর আছে,
আজ-ও উঠানে নিমগাছে আলোছায়া ধর,
দালানের কোণে সেই আরামকেদারা পাতা.
মাথা ধুয়ে মেল এলোচুল
আর. ভ্রমরের গান কর ।
রক্তের স্বভাবে তবু থরোথরো তোমার অভাব,
মেঘের যেমন রৌদ্র কিংবা শিকড়ের
যেমন হাজার শাখার পাতার স্তব্ধতার এবং ঝড়ের ।

তাই কি করে না ভয় যতই বয়স
চলে এক অর্থহীন প্রাকৃতিক অস্তিমের দিকে ?
এই তো তোমার ঘর, তোমার আসবাব
তোমারই সকাল-সন্ধ্যা, চারদিকেই অনুপম তোমার প্রভাব
তবুও অভাব, একটি মানুষ জানে আরেকের,
সদাই অভাব স্বভাবের হাড়ে হাড়ে মেঘে রৌদ্রে
রৌদ্রে ঝড়ে শিকড়ে শিকড়ে ।
প্রতিদিন গুপ্তচর মৃত্যু যাই দেখে, ঠেকে শিখে ॥

## এবং লখিন্দর

হৃদয়ে তোমাকে পেয়েছি, স্রোতস্বিনী !
তুমি থেকে থেকে উত্তাল হয়ে ছোটো,
কখনও জোয়ারে আকণ্ঠ বেয়ে ওঠো,
তোমার সে রূপ বেহুলার মতো চিনি ।

তোমার উৎসে স্মৃতি করে যাওয়া-আসা,
মনে মনে চলি চঞ্চল অভিযানে,
সাহচর্যেই চলি, নয় অভিমানে
আমার কথায় তোমারই তো পাওয়া ভাষা ।

রক্তের স্রোতে জানি তুমি খরতোয়া
ঊর্মিল জলে পেতেছি আসনপিঁড়ি,
থই থই করে আমার ঘাটের সিঁড়ি
কখনও বা পলিচড়াই তোমার দোয়া ।

তোমারই তো গান মহাজনি মাল্লার,
কখনও পান্সি মাঝি গায় ভাটিয়ালি,
কখনও মৌন ব্যস্তের পাল্লার,
কখনও বা শুধু তক্তাই ভাসে খালি ।

কত ডিঙি ভাঙ, যাও কত বন্দর,
কত কী যে আন, দেখ কত বিকিকিনি,
তোমার চলায় ভাসাও, স্রোতস্বিনী,
কাঠ খড় ফুল—এবং লখিন্দর ॥

## তবু কেন

হৃদয়ে যে বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়ে সারাদিন-রাত,
রক্তের মাটিতে শুনি রিম্‌ঝিম্ সে আকাশ-গীতা,
সেই ছন্দ তুলে তুলে গড়ে যাই আনন্দ-সংহিতা ;
তুমিই আকাশ তুমি রোদসীর মেদুর প্রপাত ।

তবু কেন মরুভূমি ধেয়ে আসে বাংলা জীবনে,
তেপান্তরে নিঃস্ব পাণ্ডু আম জাম-কাঁঠালের বন,
একান্তের নিষ্ঠা কেন থেকে থেকে বিমুখ ? উন্মন
সত্তা হয়ে ওঠে স্বার্থ, সিমূমের বালুকা-বীজনে ?

মতান্তর বুঝি আমি, কিন্তু কেন এই মনান্তর ?
বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের তাপ জানা আছে গাঙ্গেয় আলোকে,
আছে চেনা বর্ষভোগ্য বিবর্ণতা বৈধব্যের শোকে,
কিন্তু কেন বকুলের বনে ফণী-মনসা প্রান্তর ?

অবিচ্ছিন্ন গান কেন করে দাও গৌণ অবান্তর ?
মনে হয় কী নির্বোধি ! বৃথা গেছি আজীবন বকে !

## পরিক্রান্ত

বহু দীর্ঘ পরিক্রমা, নীল কন্যাকুমারিকা থেকে
নদনদী মাঠক্ষেত পাহাড়পর্বত পার হয়ে
ডিঙিয়ে অগস্ত্যবিন্ধ্য, মুক্তির গাহনে গঙ্গাজলে
লঘিমা সর্বাঙ্গে মেখে ধূর্জটির জটা বয়ে শেষে
মন্দাকিনী নির্ঝরের শীকরবীজন ভূর্জবনে
এসেছি, এখানে হাওয়া স্বচ্ছ নীল অণিমা বিথারে,
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি দেয় থেকে থেকে ঈথারে নিঃশ্বাস,
তনুবায়ু দিবাস্বপ্নে ভাসে দেখি স্থবির বৃদ্ধের
সম্পূর্ণ স্মৃতির রাত্রি আসমুদ্র হিমাচলে স্থির :
কন্যাকুমারিকা থেকে অভিযাত্রী আমি ক্লান্তিহীন
এবারে পৌঁছাব বুঝি কৈলাসের দিন পার হয়ে
সাংপোর উৎসের জলে সর্বগ্লানি রতির রোদনে
ধুয়ে দেব, শুভ্র হিমে আমৃত্যু রইব শুধু চেয়ে,
সৌন্দর্যে বিধুর শুদ্ধ, পার্বতীতে যেমন গিরিশ ॥

## এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে

সে-গ্রাম একান্ত চেনা, থেকে থেকে মন চলে যায় ।
সেখানে এখন বুঝি পলাশের আগুনের কাল,
মহুয়ায় রিক্ত বন প্রাণ পায় গোছা গোছা ফুলে ;
এখন সেখানে জানি কী সবুজ শালের ডাঙায় !
সেখানে পালায় মন, হাওয়া কাঁপে আমের বউলে,
গলিতে গলিতে শ্বাস রুদ্ধ করে আসন্ন কাঁঠাল ।

শহুরের মন যায় থেকে থেকে ছোট সেই গ্রামে,
থেকে থেকে মনে আসে রূপ-রস-গন্ধে বসুন্ধরা,
মনে পড়ে সেই মাঠ, তালদিঘি, টিলা সার সার,
যেখানে আকাশ মেলে সূর্যাস্তের আশ্চর্য পসরা,
যেখানে মানুষ বাঁচে নিতান্তই কড়িকেনা দামে,
এক বেলা ভাত পেলে ভাবে সেও সৌভাগ্য অপার—

তবু বাঁচে গিটে গিটে মৃত্যুহীন রক্তিম পলাশ ।

রূপসী পৃথিবী আর চেনাশোনা লোক সেই গ্রামে-
সৌন্দর্যে ব্যথায় তীব্র স্মৃতি হয়ে ওঠে দীর্ঘশ্বাস ।

শান্তি নেই জীবনের এ বিচ্ছিন্ন নয়নাভিরামে ॥

## চৈত্র হাওয়ায়

অড়রের খেতে রৌদ্রের চড়া সোনা,
এদিকে ওদিকে পলাশেরা দৃঢ়বাহু
সিঁদুর কিংবা আবীর-খেলায় মাতে,
—তোমারই হাসি কি বিলাসী চৈত্র-হাওয়ায় ?

রাতের পাহাড়ে নীলিমা শোধে কি দেনা ?
ঘন জ্যোৎস্নায় এ কী বা স্মৃতির দাহ !
তোমার কাজের তিমিরে কি কোনো মতে
লেগেছে আগুন আমার মনের ছোঁয়ায় ?

যেখানেই যাও, তোমার কাজের দেশে
যতই না তুমি ভূগোলে হারাও দিশা,
আমি তো শুধুই একখানি মেঘ ; চলি,
সাতসাগরের সন্ধানে ভাঙি গলি

এগ্রামে ওগ্রামে শহরে পাহাড়ে মাঠে
বালির পাড়ের ক্লান্ত নদীর ঘাটে
তোমার মুখের ছবিই আমাকে ধাওয়ায় ।

তুমি সেই কোথা ট্রামে বা ভর্‌তি বাসে
ভাব,প্রকৃতিকে আনব শহর ঘেঁষে ;
গ্রামদেশে দেবে নবনাগরিক ভাষা ।
তাই আমি ভাবি : মাঠের ঢেউয়ের দেশে
তোমারই চলা কি সচ্ছল সুখী হাওয়ায় ?

## বৈশাখী মেঘ

হাওয়ার রথে বৈশাখী মেঘ ডাক দিয়েছে তোকে
উঠল বুঝি উড়ল হৃদয় দ্যুলোকে স্বর্লোকে
সকল হার হার মেনেছে প্রাত্যহিকের সুখে-দুঃখে শোকে—

কে বলে ঐ আশার গান ডাক দিয়ে যে জাগায় প্রাণ ও কে ?
ও কি শুধুই হাওয়ার হাঁক, ও কি শুধুই ঝড়-ঝরানো গান ?
দগ্ধদিনে প্রাণ বিলায়ে মাটির গায়ে গন্ধ এনে এ কার আহ্বান ?

আকাশ ! দাও শরীরে হিমহর্ষ
পৃথিবী পাক নীলের হিমস্পর্শ
জীবনে ধুয়ে দাও বিপ্রকর্ষ
বৈশাখীতে ক্লৈব্য যাক হৃদয় অম্লান ।

জীবন যদি আকাশ হত আর
মানুষ যদি পৃথিবী হত তবে
জীবন হত হাওয়ারই মতো কবে
বৈশাখীর মেঘের বিপ্লবে

জীবন আহা জীবন শতবার
প্রবল প্রেমে বজ্র উৎসবে
নতুন জলে শান্তি শতধার

আমাদের গ্রীষ্মে দাও স্বচ্ছনদী তালদিঘি দাও
বাঁধে বাঁধে বেঁধে দাও বৈশাখকে শতখেতে খালে
শহরে শহরে ছায়াবীথি দাও অরণ্য জাগাও

সারা দেশে সরসতা আনো ফুল ফলের বাগানে
জীবনের রূপ দাও প্রতিদিন সকালে বিকালে
অসহ্য এ দগ্ধ ধুলা হে আকাশ ধুয়ে দাও মানুষের
প্রকৃতির গানে ॥

## তাই শিল্পে

তাই শিল্পে সত্তা শুদ্ধ ; তবু জানি জীবনই আকাশ,
শিল্প শুধু মেঘ, জ্যোৎস্না, মাঘী রৌদ্র, আষাঢ়ের ধারা ।
শিল্প শুধু ইতিহাস, মুহূর্তেব তোরণে পাহারা ।
তড়িৎ মুহূর্তমাত্র, যদি বলো জীবনই অভ্যাস ।

আমাদের প্রত্যহের বিড়ম্বিত দিনগুলি ঝরে
ফাল্গুন পাতার মতো, চৈত্রে কোনো রাখে না আশ্বাস ;
আমাদের দুস্থতার গ্লানি ওড়ে ধুলার বাতাস ;
পরাগ ওড়ে না কোনো সৃষ্টিময় বসন্তমর্মরে ।

জীবিকার ব্যর্থতায়, তিলে তিলে নিত্য আয়ুক্ষয়ে ;
দৈনন্দিন বিকারের মজ্জাগত আনন্দের ভয়ে
কোটি কোটি লোক বাঁচি, নাকি মরি, শাসনে শোষণে ;
তাই, থেকে থেকে খুঁজি জীবনের তন্ময় ভাষণে,
প্রেমে, সখ্যে, প্রকৃতি বা সংগঠনে,—মানুষের জয়ে,

শিল্পের চিন্ময় কর্ম জীবনের ভঙ্গুর মৃন্ময়ে ॥

## হেমন্ত

১

লালমাটি ওঠে নামে, সুর যেন, পরতে পরতে
বেয়ালায় পরদায় পরদায় । এদিকে কালোর খাদে
চেলোর বিষাদ আর অন্যদিকে ভিয়োলার হাসি
এলায় জর্দায় মাতে উদারা-তারায় । আর হঠাৎ হঠাৎ
ঐ ধানে ধানে বেজে ওঠে তীক্ষ্ণ-চঞ্চু সবুজের বাঁশি ।

এ আকাশ মহাসভা পৃথিবীর কত না রঙের
শত শত বর্ণাভাসে এ যেন বা অর্কেস্ট্রা বিরাট !
একত্র, সবাই এক সংগীতের সঙ্ঘে বদ্ধ,
তন্ময়, মননে এক ; কেউবা বাজায়, মুখে দিব্যহাসি,
বিভোর বিহ্বল ; কেউ প্রতীক্ষায় তীব্র, কোথায় সে
দূর্বাদলে কখন বাজাবে তূর্য ; কেউ থেকে থেকে
পল্লবিত শিঙা ধরে ; কেউবা বাজায় পুষ্পিত মন্দিরা—
সবাই নিবিষ্ট, এক লক্ষ্যে গাঁথা—কেবা মুখ্য কেবা গৌণ !
যে যার অংশেই পূর্ণ সমগ্রের সংহতিতে
পরস্পরে, প্রত্যেকেই, সবে মিলে একটি সংগীত ।

কবে যে নামাল মাটি সপ্তরথী ইন্দ্রধনু—নাকি সে মানুষ
আপন চেষ্টায়
ভাঙল রঙের কেল্লা রাঙাল পৃথিবী আনন্দে ইন্দ্রিয় ?

আমার ছুটির দিন চলে চেয়ে চেয়ে অর্কেস্ট্রায়
আকাশ আসরে শুনে শুনে
চোখে কানে ঘ্রাণে এক সংগীতের মহিমায়
উপমায় আশায় গভীর,
লালে নীলে সবুজে হলুদে আদিগন্ত চলে বেয়ে ;
মোড় ফিরে বৃত্তের নিটোল দীর্ঘ ঋজু শালকুঞ্জ ওঠে গেয়ে,
আর ঐ তারই পাশে
আমাদের তন্বী শ্যামা পৃথিবী পিনদ্ধ নাচে টিলায় টিলায়
মৃদঙ্গের বোলে বোলে আবেগে মেদুর ।

২

চাঁদের আলোয় অঝোর দুঃখে বাতাসের হাহাকার,
বিরাট আকাশে একটি শূন্য হৃদয়,
পাহাড়ে পাহাড়ে আছড়ে বেড়ায় হিমের বাদল রাতে
মেঘের আড়ালে বিধবা আলোয় হাতড়িয়ে যায়,
বৃথা খুঁজে মরে, মাঠে মাঠে কান পাতে,
সান্ত্বনা নেই তার ।

জানলায় ডাকে দুরন্ত হায়-হায়
কান্নার হাওয়া মাইল-মাইল ব্যেপে,

এ কি ক্রন্দসী কাঁদে ? নাকি কাঁদে মাটির হৃদয় :
সে কোথায় সে কোথায় ?
ঝড়ের বাম্পে বন্যার বেগে কোথা তার আশ্রয় ?
তাই কি আকাশে বিদ্যুৎ ওঠে খেপে,
এদেশে ওদেশে যায় ?

দিনে চোখে ফোটে উপোসি মানুষ, পৃথিবীর সাতরঙে
প্রকৃতির গান ছাপিয়ে ছাপিয়ে হাড়ে হাড়ে বাজে
দাঁতে-দাঁত অভিযোগ,
গ্রামে গ্রামে রোজ অভাব আদুল গায়ে
ঘুরে ঘুরে চলে আমাদের পায়ে পায়ে : জীবনই যেন বা রোগ,
শিশু বা বৃদ্ধ মেয়ে বা পুরুষ সবই এক দুর্ভোগ ।
তাই তো ছুটির গ্রাম্য-সন্ধ্যা অন্ধকারের সংগীত
উপছে উপছে ওঠে শহরের দেশজোড়া শত কান্নায় !
কবে যে মানুষ প্রকৃতির রঙে সাজবে,
এ গ্রাম শহর আর নয় !

অত্যাচারের অমোঘ নিয়মে সুখী অসুখীর বিচ্ছেদ ভেঙে
কবে যে সবাই বাঁচবে !

## জন তিনেক ভগ্নহৃদয়

১

তুমি যেন দুনিয়ার সুয়োরানি মুহুর্মুহু গোসা,
রাগ ভয় লজ্জা আর অশ্রুজলে নৈপুণ্য অশেষ,
চোখে মুখে চলচ্চিত্র, হলিউডে মেশাও স্বদেশ,
বেশভূষা প্রসাধনে মুগ্ধ হই বাঙালি ছাপোষা,
আমরা সবাই তাই সারা সন্ধ্যা ঘুরি যেন মশা
তোমার গুঞ্জনে ঘিরে, সারা ঘরে ভারী তার রেশ,
তুমি তার মাঝে আন ক্লান্তিহীন ক্লান্তির আবেশ,
তোমার হৃদয় যেন জগদীশ বসু'র মিমোসা ।

অথচ একটি মেয়ে তুমি শুধু, নিরবধিকাল
বিপুল পৃথ্বীতে ভাবো অগণন কত কোটি মেয়ে,
তুমি তারই একজন, তোমার শরীর, মুখ, স্বর
একার কৃতিত্ব নয়, আপতিক জীবতত্ত্ব বেয়ে
তোমাতে থমকেছে মাত্র, তাও শুধু কয়েক বছর ।

তোমার বর্ণাঢ্য দম্ভে দেখ অধোবদন ত্রিকাল ॥

২

এই দুর্বিপাকে, প্রিয়া, তোমাকেই করি আমি দায়ী,
কারণ আমি তো দাস, অথবা ভক্তই বলা চলে,
তোমার চরণে নত, যদি পাই দাসত্বশৃঙ্খলে
তোমার সান্নিধ্য, পাই অন্দরের বন্দীশালে ঠাঁই,
কিংবা যদি মন্দিরের অন্ধকারে দেখি নিত্যশায়ী
কখন জাগেন দেবী নামেন আবিষ্ট কৌতূহলে ।
মোট কথা তুমি কর্ত্রী, আত্মদান করেছি কৌশলে,
অর্থাৎ আমিই জেনো নই হৃদয়ের ব্যবসায়ী,
তুমিই হিসাব কর,আমার হৃদয় ভাব পণ্য,
এদিকে ওদিকে তাই ঘোর ফের যাচাই-এর লোভে,
এমন-কি ঝুটামাল জহরৎ ভেবে প্রায়-কেনো,
হয়তো কিনেই ফেল, যা হোক সে কথা লাজে ক্ষোভে
বলাও সংগত নয় ; আজ যবে খাঁটি হীরা চেন,
তখন প্রেম ও মৃত্যু উভয়ে সতীন, আমি ধন্য ॥

৩

মুক্তির সংবাদ আনি, পুরস্কার কী দেবে প্রেয়সী
ভ্রমর-চুম্বন, নাকি দেবে প্রজাপতির চুম্বন ?
বক্ষে ঠাঁই দেবে শেষে আনন্দিত করব গুঞ্জন ?
তাই তো আবার দেখ তোমার ঘরের পাশে বসি ।
জানি আমি বহুদোষে শ্রীচরণে হয়ে আছি দোষী,
দীর্ঘকাল করে গেছি ভুল সুরে অরণ্যে ক্রন্দন,
আমার অশ্রুও জানি জুগিয়েছে তোমার ইন্ধন,
তোমার উৎসবে প্রিয়া কতদিন থেকেছি উপোসি ।
আজকে আমারই জয়, আমি আনি মুক্তির সংবাদ,

দূর স্মৃতি হয়ে যাব, তুমি যদি হঠাৎ উন্মনা
ভাব : আহা যাই হোক বেঁচে ছিল হোক না অবুঝ :
স্মৃতির একান্ত শূন্যে ভরে যাবে আমার প্রসাদ ;
আর যদি নাও ভাব, তাহলেও ভুল বুঝব না :
প্রেত কবে, তুমি বলো, ভাঙে-গড়ে প্রেমের ত্রিভুজ !

## একাদশী

তোকে দেখি, মেয়ে, মনে মনে হয় ভয়
শৈশবের শেষে যেন আসন্ন জীবন
ছেয়ে না ফেলে রে তোর আনন্দতন্ময়
অঙ্গের লাবণি আর বিহঙ্গম মন ।

দুই চোখে টলোমলো আকাশের ছুটি,
কখনো শফরী ছোটে, কখনো খঞ্জনা,
কুঞ্চিত কুন্তল দেখে ভ্রমর ভ্রূকুটি,
হৈমবতী সারা গায়ে মেজে দেয় সোনা ।

তোকে দেখি ; হাত রাখি মাথায় আদরে
আর হয় অনায়ত্ত জীবনের ভয় ।
একাদশী ! রৌদ্রে জলে বালিতে পাথরে
আজীবন সদ্যশুচি থাকিস তন্ময় ॥

## সনেট

আমি তো ছিলাম শূন্য তেপান্তরে উদ্বাস্তু পাথর,
নিকষ পাহাড়ে কিংবা টিলা, কিংবা, বলা যায়, ঢিপি,
তুমি শুরু করে দিলে তোমার শকাব্দে শিলালিপি ;
আজ যদি যাও তবে মুছে যাও সমস্ত স্বাক্ষর ।

আমি যা ছিলাম, একা, অবিচল, পাললিক শিলা,
তাই শুধু রেখে যাও, নিয়ে যাও দীর্ঘ ইতিহাস,
যাবে যদি যাও দূর ইন্দ্রপ্রস্থ মথুরা মিথিলা,
আমার আদিম সত্তা নীল শূন্যে ফেলুক নিঃশ্বাস।

না হলে অন্তত ভাঙো তোমার খোদাই সব স্মৃতি,
ভেঙে ভেঙে ছারখার করে দাও ভাস্কর্য-বাহার,
আমাকে ছড়িয়ে যাও ইতস্তত বৃষ্টির আহার,
ভেঙে যাব ঢল-স্রোতে, ভেসে যাবে বাস্তু কালচিতি

কোথায় পালাবে তুমি, তোমারই এ স্মৃতির পাহাড়,
ধূর্ত অগস্ত্যেরও কাছে কখনো সে নোয়ায়নি ঘাড় ॥

## তুষারে আগুন জ্বালে—লেনিন

*'For the sweetest, wisest soul of all my days and lands—and this for his dear sake—'*

—Whitman

তুষারে আগুন জ্বালে, অন্যহাতে ঢালে মানুষের প্রেমে
শীতল বাদলধারা শূন্য মরুদাহে। এই ইতিহাস।
প্রেম ঘৃণার বিদ্যুতে বজ্রে সমস্ত আকাশ
একাকার করে দিলে একটি নিশ্চিত নীলে।
শুনি তারই রিমঝিম শব্দের আখর দূর দেশে যুগান্তরে মনের হরিষে।

মানুষের দ্বন্দ্বের জগতে, ক্ষমতার সংঘর্ষে অটল
সে মানুষ, সে আকাশ, মৈত্রীর ক্রন্দসী তার একাগ্র দৃষ্টিতে।
স্থিরলক্ষ্য করুণায়, বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাতে
প্রচ্ছন্ন সংহত এক আলিঙ্গন আবিশ্ববিস্তৃত,
ইতিহাস বিরাট ললাটে ত্রিনয়ন, নির্নিমেষ দুই চোখে
মানুষের ভালোবাসা, সর্বমানুষের একাত্ম চেতনা।

বৃথা হত্যা, উন্মাদের বৃথা চেষ্টা।
ইতিহাস কে কার গুলিতে ভেঙেছে কখনও ?
পৃথিবীর মানুষ অমর, চোরাগুলি বৃথা তাই।
একটি মানুষে, দুই চোখে জর্ডনের জল ফাঁসিকাঠের উপরে
সংবৃত ও বদ্ধমুষ্টি উত্তোলিত হাত বিথারে শান্তির ছায়া
বোধিদ্রুমে শাখায় পল্লবে অক্ষয় অমেয়।
ত্রিনয়নে ইতিহাস, আলিঙ্গন দুহাতে সংহত।
মৃত্যু নেই। বৃথা হত্যা। মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস
একটি মানুষে একাগ্র প্রতীক। বৃথা হত্যা।

মৃত্যুহীন প্রাণ, সারা দেশে, দেশে দেশে, সারা বিশ্বে একটি আকাশ
অখণ্ড একটি হাওয়া, চোরাগুলি বৃথা তাই আজ,
(বৃথা যাবে আণবিক দানব-চেষ্টাও, আজ, নয় কাল,)
মানুষ অজেয়, নির্বোধ বিমূঢ় অসহায় আজ সারা পৃথিবীর
সামান্য মানুষ, সাধারণ লোক, অমর আকাশ আজ
প্রতি চিদম্বরে উত্তরাধিকার, সাধারণ্যে জনসাধারণে,
মৃত্যুহীন প্রাণ মাতে কোটি কোটি প্রাণে দেশে দেশে
তুষারে আগুন জ্বালে, মরুদাহে ফলায় ফসল, এই আজ ইতিহাস,
লেনিন অমর কোটি কোটি লোকে, যেন বা কৈলাসে
সারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত, শান্তির প্রেমিক এক জীবনের দোষেগুণে
প্রেমের ইস্পাতে ॥

## স্মৃতির গোধূলি

ভেঙে গেল ইন্দ্রধনু,
সূর্যাস্ত মিলায় আসন্নের অন্ধকারে
জীবনে রাত্রির নীল পাহাড়ে পাহাড়ে
সপ্তর্ষিরা নিয়ে এল স্মৃতির গোধূলি।
আকাশে আকাশে অশ্রু,
অরুন্ধতী এলোচুল খুলে।
আর দুটি চোখ জ্বলে শুকতারা সন্ধ্যার তারায়
চামেলিতে নিস্তব্ধ শিশিরে।

সে কি শুধু দিয়ে গেল স্মৃতির গোধূলি ?
সেই কি দেয়নি বেঁধে হৃদয়ের বাসা
প্রত্যহের সূর্যোদয়ে আর জীবনের
অস্তগামী সূর্যের আলোয় ?
অন্ধকার গ্রামে গ্রামে গ্রামান্তর শহরে
হৃদয়ের আশেপাশে ।

তবু তো সে আসে ধীরে ধীরে ।
আসা তার পাপড়িতে পাপড়িতে খোলে আশা
অনির্বাণ চোখ জ্বলে,
যেখানে সন্ধ্যার তারা শুকতারার ভোরে
প্রতীক্ষায় প্রতিজ্ঞায় পরিচ্ছন্ন স্থির ঘাসে ঘাসে,
আমাদের কালজয়ী কান্নার শিশিরে ॥

## বহুরূপী

এ জীবন বিচ্ছিন্নের সমুদ্রে সমুদ্রে নিরাকার ;
ঢেউগুলি নিরুদ্দেশ নির্বিশেষ, কোথায় সীমানা !
কার কোথা তীর কোথা তল কোথা দ্বীপ নেই জানা—
এলোমেলো সব ছবি মানুষের অসহায়তার ।
তারপরে পৃথিবীর ভূগোলে শিল্পীর মেলে দিশা,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে তীরে তীরে দেশে দেশে বন্দরে বন্দরে
প্রত্যক্ষে স্বরূপ দেয়, ইতিহাস গড়ে ঘরে ঘরে,
মানুষে মানুষ চেনে, জীবনে শরীর পায় ঈশা ।
তখন জীবন ওঠে তীরে, ঢেউয়ে প্রচণ্ড নাটক,
ক্রতুকর্ম খুঁজে পাই নাটমঞ্চে বইয়ের পৃষ্ঠায় ।
সফেন জোয়ার বাঁধি চীৎকারে কখনো চুপিচুপি,
মুখে চোখে অঙ্গে অঙ্গে মুহূর্তের ক্ষিপ্র বহুরূপী
প্রত্যক্ষের নাট্যে মাতি নটনটী দর্শক পাঠক,
হয়ে উঠি ত্রিকালের স্তব্ধ মূর্তি মুহূর্ত-নিষ্ঠায় ॥

## একযুগের সংলাপ

১

তোমার হৃদয় আজও চৌমাথায় বাসার মতন,
অবিরাম চলাচল, নানা শব্দ নানা তীব্রতায়
দোতলায় ভেসে আসে, বিকালের খোলা জানলায়
চোখে চলে চলচ্চিত্র, জানও না কেউ বা কখন
কোন্ ছাপ কার ছাপ রেখে যায় স্বপ্নালু স্নায়ুতে,
হয়তো বা ভাব এল যৌবনের পরম লগন,
একাকীর সন্ধ্যাঘোরে থেকে থেকে শিহরিত মন
মুহূর্তের মূর্তি দেখ জীবনের সমস্ত আয়ুতে।
এই স্বাভাবিক বটে বয়সের এ জলবায়ুতে,
তোমার মেয়েলি সত্তা আধোসত্যে আধোকল্পনায়
এমনি ঘুরুক স্বপ্নে আর প্রত্যক্ষের প্রতীক্ষায়।
যেদিন আসবে পথ ঘরে উঠে চেনায়-অদ্ভুতে,
সেদিনের কৈলাসের মৃত্যু আর জন্ম-মুহূর্তের
একান্ত প্রহরে জেগে উঠো বাহুবন্ধনে মুক্তের ॥

২

সেদিন গোলাপবনে বসন্তবাহার,
কেটে কেটে তুলে আনি বাইশটি ফুল,
সাজাই সযত্নে বন্ধু টেবিলে তোমার,
বহুমূল্য ফুলদানি, চিত্রিত বর্তুল।

বাইশটি গোলাপের বর্ণাঢ্য সৌরভে
সাজাই তোমার ঘরে নশ্বর যৌবন,—
শুনি প্রেম চিরজীবী আপন বৈভবে,
কুসুমের মৃত্যু দিয়ে পাই যদি মন ॥

৩

বাজাবে বাজাও তবে নানা সুর ভিন্ন ভিন্ন তারে,
সত্যে-স্বপ্নে কল্পনায় মানসের আনমনার গৎ,
তোমার সত্তায় সখী সবই স্বাভাবিক ও মহৎ।

তবু জানি কোনোদিন কোনোক্ষণে কানাড়ার রাতে
কিংবা বুঝি রামকেলির শিশিরের শীতল আভাতে
তুমি আত্মহারা হবে অন্ধকারে একাগ্র উৎসুক,
বাজাবে বিহ্বল তুমি, জানাবে না কোন্ ছিন্নতারে
নক্ষত্রের পায়ে পায়ে এসে গেছে স্তব্ধ আগন্তুক ;
দিও তাকে ভৈরবীতে নিঃশব্দ তীব্রতা দুই হাতে,
বক্ষে নিও, সে তোমার সর্বস্বের ভৈরব ভিক্ষুক ॥

৪

ধুধু মাঠে লাল হাওয়া সারাদিন বয়
ধুলায় ধুলায় কত না পরাগ ওড়ে
বউল ঝাম্‌রে ঝরে আর উড়ে যায়
সারাদিন ধরে পুবের গলির মোড়ে
নিমের পাতার কাঁপন প্রতীক্ষায়
সে কার জন্যে সারাদিন হাওয়া বয় ?
তারপরে হাওয়া নেমে যায় গোধূলিতে
দগ্ধদিনের ধুলার জীবন রাঙে
দূরের মজুর মন্থর পথ ভাঙে
অন্ধকারের অদৃশ্য মৃদু তাপে
আবার কিসের আশায় আকাশ কাঁপে
দিনের জ্বালা কি ছড়াবে সে রাত্রিতে
সারাদিন কেন মিছে লাল হাওয়া বয়
তাই কি রাত্রি আতপ্ত তন্ময় ?

৫

নিরবধিকাল আর পৃথিবী বিপুল—
তার মাঝে দিলে তুমি আমাকে সম্মান,
নিত্যের মর্যাদা নিয়ে নিস্তব্ধ পিপুল
আমি দেখি করে যাও প্রত্যহের দান,
আমি শুনি, স্রোতস্বিনী, দিবারাত্রি গান
অম্লান স্নেহের ভরে, শ্যাম মমতায়
তোমার চঞ্চল দেহে দেখি যে পৃথুল
আমার প্রাণের স্থির শিকড়ের স্নান।

যদি কোনো দিন অন্য পাড়ে আনো বান,
যে গ্রামে অনেক গাছ করবী শিমুল,
কে জানে ফিরবে কিনা নিঃসঙ্গ সৌতায়—
আমি ডাকব না ব্যর্থ লুব্ধ সমতায়
নিস্তব্ধ নিরম্বু চরে নিশ্চল পিপুল ॥

৬

তোমারই ছায়ায় বাসা, দিনরাত্রি তোমারই সংগীতে
মর্মরিত আমার নিঃশ্বাস, শ্যামপত্র সমারোহ
আমাকেও ছায়াঘন করে, তবু মাঘের নিগ্রহ
তোমাকে ভোলায় যদি, উপবাসী তোমার ভঙ্গিতে
যদি ভুলি তোমার স্বরূপ, যদি ভুলি হিম পীতে
শ্রাবণের ঘটা কিংবা ভুলে যাই বৈশাখী বিদ্রোহ
তোমার সর্বাঙ্গে যবে উন্মুখর ফাল্গুনী সম্মোহ,
আমাকে মার্জনা কোরো, সে ভুল যে করি অতর্কিতে।

যদি বা কখনো যাই গ্রামান্তের নব-হরিতের
সন্ধানে তোমাকে ছেড়ে, যদি যাই অরণ্যের ভিড়ে
সে জেনো ক্ষণিক শুধু স্বভাবের চঞ্চল আততি,
উন্মনা মুহূর্তে ভ্রান্তি উদাসীন শিথিল শীতের,
আমার প্রাঙ্গণে আমি গৃহস্থ যে তোমারই নিবিড়ে,
তুমি প্রত্যহের নীড়, ঘনিষ্ঠের নিত্য বনস্পতি ॥

৭

জানি তো নই তোমার প্রেমে প্রথম আগন্তুক :
ষড়জে নয়, ঋষভে নয়, আমার পালা বুঝি
গান্ধারের বাঁধন শুরু, নাকি সে মধ্যমে ?
খুশিই তাতে, আননি তুমি আনাড়ি যৌতুক,
তোমার জ্ঞানে আমার ধ্যানে তাই তো প্রেমে যুঝি
ত্রিকাল-জোড়া দীর্ঘ মীড়ে লয়ের সংগমে।

আজ-ও দেখি হঠাৎ হও উদাস উৎসুক ;
থম্‌কে শুনি, থামবে ভাবি আমার পালা বুঝি,

শঙ্কা হয় বাঁধবে সুর এবারে পঞ্চমে,
নাকি নিষাদে ? আমার প্রেম প্রবীণ ভিক্ষুক,
তোমার রাগমালার লোভে সেই বিরাম খুঁজি
যখন তুমি ক্লান্তি-ঘোরে নামবে এসে সমে ;

অন্তহীন ধৈর্য হবে ধন্য, তারে তারে
বাজব শেষ গান্ধারের চরম ঝংকারে॥

## আলেখ্য

শ্রীমান হীরেন মিত্রকে

১

চোখে ঝক্‌ঝকে সূর্যের স্মিত হাসি
নিয়ে যায় লঘু স্বচ্ছ আলোয় দূর পামিরের পারে ।
হৃদয়ে কি তার আরালের স্রোতে সোরাবও উজ্জীবিত ?

কথাগুলি তার গান যেন কথাগুলি
ফাল্গুনী যেন মর্মে মর্মে তারা কী আকুল করে !
কে কার কণ্ঠে দিল এই বিস্ময় ?
ঝরা দেশে এই মরা দেশে সে কি করবে বিশ্বজয় ?

দুদণ্ড তার পাশে বসা তাও যেন জীবনের অভিযান,
কত উৎরাই চড়াই কত না প্রান্তর,
এক মুহূর্তে ভাস্বর তার দীর্ঘ ভবিষ্যৎ,
প্রাত্যহিকের সমতলে তার ফুলে ফলে নির্মাণ ।

তাকে যে দেখেছে, সেই জানে কেন শ্রাবণের
থৈ থৈ মাঠে ফের উড়ে আসে আশ্বিন,
মাঘের অন্তে বারে বারে কেন অঙ্কুর,
কেন যে লেনিন আগুন জাগান লেনিনগ্রাদের তুষারে ॥

২

চামেলি মিলেছে একটি মানুষে
সান্নিধ্যের প্রসাদে তার নৈরাশ্যের নম্র বিষাদ
যেন ধূপে ধূপে ব্যক্তিস্বরূপ কর্মীর মতো কর্মে
প্রাত্যহিকেই নিজেকে পেয়েছে বিলিয়ে বারংবার ।
কথা বলে যেন আম-জামে পাতা ঝরে,
যেন বা পাহাড়ে নদীর বালিতে ঝিরিঝিরি সোনা জ্বলে,
নীরবতা তার বাগানে শিশির.
গাছে গাছে লাগে বউল ।

চাহনিতে তার যাত্রারম্ভ, নতুন ঘাসের পথ,
দুই দিকে চলে ঋজু ও সুঠাম তাল,
মাঝে মাঝে দৃঢ় শাল কখনো বা পলাশের বঙ্কিমা,
এই ছায়া এই রৌদ্রের ঝিকিমিকি ।

সে যখন পাশে তখন সবাই ভোলে,
চলে যায় আর রেখে যায় শত টুকরা
ছোট ছোট দিনরাতের সজাগ সতর্ক শত কাহিনী—
সে যেন মাঘের রৌদ্রে ছড়ানো আকাশ—
মধুর মধুর ব্যাপ্ত বর্তমানে ,
আমরাই ঘুরি অতীতে অতীতে মেঘের ভবিষ্যতে ॥

৩

চোখে বিদ্যুৎ দীপ্ত স্বচ্ছ নির্ভীক,
সে রেখে এসেছে পাহাড়ে যা কিছু দ্বিধা ।
চলায় বলায় তীরের ফলকে রৌদ্রের হীরা ঠিকরে

সে যেন তাতার সওয়ার এক,
যেন বা গড়েছে ভাস্কর কোনো গ্রিক,
আতত শরীর এই বুঝি দেবে টংকার!
যৌবন তাকে ডাক দিয়ে যায় নিশ্চিতে,
একটি আস্থা গড়ে দেয় তাকে সিধা পথ ।

মনে মনে ভাবি : হে প্রাণের দূত জীবনের দেশে প্রান্তরে
সব রাজপথ পার হয়ে তুমি ইন্দ্রধনুকে বাঁকিয়ে
মেঘের উপরে স্বচ্ছ হাওয়ায় জ্বালবে আবার বিদ্যুৎ ?
প্রজ্ঞাপ্রবীণ নয়নে ত্রিকাল উঠবে আবার শিখরে
যেখানে তুঙ্গী সব সমতল একটি বিজয়ী হাস্যে ?

৪

অনেক দিনের চেনা সে আমার, মন
জানি তার প্রায় নিজেরই হৃদয় সম,
যত কিছু কথা শুনেছি দূর আপন
মধুরতম তো তারই, সেই প্রিয়তম

কাছে যবে থাকে, তবু থাকে কত দূরে,
দূরে যবে যায়, কাছের হাওয়ায় নিশিদিন রাখে ভরে
আকাশ যেমন ফাল্গুনে সুরে সুরে।

কতকাল চেনা, তবুও জানা অশেষ
প্রতিদিন তার—আমারও রূপান্তরে,
আমাদের প্রেমে দোহার কাল ও দেশ।

আমাদের প্রেম খরতোয়া আর দুই পাড়ে ধারে ধারে
বটের ছায়ায় গ্রামে হাটে বাটে কখনো পাহাড়ে কোথাও শহরে
কোথাও বা প্রান্তরে

এ-জীবনে বুঝি কেউ ঢেউ ভেঙে ভেঙে ফুরায় না তাই রেশ।

আমার জীবন বেঁধেছি তো তার ঘাটে ॥

৫

দেখেছিলুম তো ঘরের লক্ষ্মী গৃহিণী,
তন্বী সে শ্যামা চকিত-হরিণী—যদিই বা তোলে চোখ,
হাতের সোনার স্পর্শ সারাটা সংসারে,
যেন বা ফুলের গন্ধ ছড়ায় এ-ঘরে ও-ঘরে সবখানে
তারই উঠানের যত্নের টবে চারা।

আজ দেখি তাকে কর্মমুখর কলরোলে,
বিশ্বের এক নারী,
তন্বী সে শ্যামা, তবু মনে হয় শরীর তার
দীর্ঘ সুঠাম সুপ্রতিষ্ঠ স্পষ্টতর—
মেদুর দুচোখ থেকে-থেকে খর বিজলি হানে ।

কে তাকে তুলেছে টব থেকে খোলা প্রাঙ্গণে,
নাকি সে অধরা, বাঁধন ভেঙেছে পোড়ামাটির ?
মাঘের সদ্য পল্লব যেন পত্রনিবিড় আষাঢ়ে
শ্যাম সমারোহে হাওয়ায় হাওয়ায় বকুলগন্ধে দোলে ॥

৬

ভয় নেই তার
জীবনে যে তার সমুদ্র ঊর্মিল
সে তো মরা নদী মজা খাল নয় জোয়ার-ভাঁটায় নীল
সমুদ্র সে যে মুক্ত সে নির্ভীক

কিংবা সে মেঘ নয়নাভিরাম
কান্নার ঝুলি ক্লান্তির মুঠি সে কেন ভরবে ভিখে
আকাশে নীলে অবারিত সে যে
সে কেন ব্যর্থ সমব্যথী খুঁজে ঘুরবে চতুর্দিক

গতির লক্ষ্যে অবধারিত সে পৌঁছেছে ঊর্মিল
সমুদ্রে, সে যে লাখো ভগীরথে ডেকে এনেছিল
জীবনের সন্ধান, মরণের সেই কপিলগুহায়
তাকায় সে অনিমিখে ;
আত্মগ্লানিতে সে কেন বা হবে চাতুর্যে অশ্লীল

কিংবা সে মেঘ আকাশচুম্বী
সূর্য যে তার চোখে, আবেগে যে তার মেঘেরই মন্দ্র
হৃদয় আকাশে, সে বুঝি বা হল প্রকৃতিতে সংহত
নতুন মানুষ নতুন জীবন নতুন কালের বীর,
বাজে বিদ্যুতে মেঘের মতো সে
ভুল করে যদি তবু প্রশান্ত সূর্যের মতো ধীর

শ্রাবণ আকাশে চেনা যায় তাকে
দূর দেশ বয়ে হাওয়ায় হাওয়ায় শোনা যায় তার ডাক
নীল অম্বরে স্বপ্রতিষ্ঠ চেতনার নিজ মর্যাদায়
সংবৃত গম্ভীরে ॥

৭

তাকে চেনা যেন কঠিন মানস-যাত্রা,
কিংবা যেন-বা মরুভূমি ঘুরে জরিপ,
হঠাৎ আড়ালে দেখা খেজুরের শিহর,
হঠাৎ দেখায় টলোমলো হিমদিঘি ।

আকাশের মতো উষর, চলেছে শুধু পাণ্ডুর ঢেউ,
টিলায় ডাঙায় দিগন্তে প্রান্তর,
তারই মাঝে দুই পাহাড়ের খদে সতেজ রঙিন পলাশ
ফাল্গুনে কী-বা রাঙবে !
অমর আশায় নিশ্চিত যেন রোপণ করেছে কেউ ।
এই গাছে তার উপমা ।

জানি মনে হয় থেকে থেকে কোথা পালাই
যেখানে দ্বন্দ্ব সমাহৃত এক সুস্থ সুশ্রী গানে,
জানি তবু তাতে ঘুচবে না এই বাস্তবিকের বালাই ।
সে তো পালায় না, সে বলে, সমাজই ভাঙবে ।

সে বলে, মনকে ধনুকের মতো বাঁকাবে
আর তারপরে মাটিতে জিষ্ণু খরশরে
জাগাবে সবার নির্ঝর ।
মন ? মনে আছে, সে বলে, মানসসরোবর,
বহু পর্বত, অনেক শিখর : সে বলে, প্রতিটি দিন
আমরা সবাই শেরপা !

৮

( শ্রীযুক্ত বলাই পালকে )
প্রথম যেদিন তাকে দেখি, ছিল সেদিনও সে শ্রাবণের ভরানদী,
অন্তত নদীর পেশী, হাড়ে হাড়ে ছাতিতে কব্জিতে
টলোমলো করে, যেন মধুমতী সদ্যস্মৃতি
দুধে-ভাতে শাকান্নে সবজিতে;
প্রত্যহের কর্মিষ্ঠ সম্প্রীতি
চোখে এনে দিয়েছিল যে আকাশ,
সেই মুক্তি রেখেছে তখনও সতেজ সুনীল মেঘের রৌদ্রের আভা,
পাহাড়ের মতো গায়ে তখনও বাস্তব তার স্মৃতি ।

তারপরে ইস্টেশন্, শেয়ালদার পরে নাকতলা
তারপরে একেবারে সটান্ উত্তরে
উল্টাডিঙি, বস্তিতে বিখ্যাত রাজধানীতেও সেরা,
জল নেই, কাদা আছে অপর্যাপ্ত,
হাওয়া নেই, দুর্গন্ধ প্রচুর,
আলো নেই, আছে তীব্র স্থানাভাব, গোলমাল ঝগড়াবিবাদ,
বসন্ত কলেরা ;
কর্মস্থান বহুদূর, যদি বা যখন থাকে,
আপন কর্মও নয়, ভয়াবহ পরকর্ম,
তাও থাকে কি না থাকে,
যদি কেউ কাজে ডাকে তবে কয়দিন স্বাধীন বাজার
দুঃখের সুখের ঘরে তবু দুইবেলা খাওয়া আটটি মুখের ।
তবু দেখি মাঝে মাঝে বিদ্যুতের রেখা,
শুনি নম্র কথার কাঁথায় প্রচ্ছন্ন বজ্রের স্বর,
আর মাঝে মাঝে দেখি সাতরঙে লেখা অভিরাম
প্রাণের প্রচণ্ড প্রতিবাদ—
তাকে দেখে আজ মনে হয়
মেঘ সে তাড়াবে চোখে চোখে খরশরে,
সারা বিশ্বে মিত্র তার সে বুঝিবা বুঝেছে নিশ্চয়,
তারই জোরে রামধনু ভাঙবে সে ছড়াবে সে সাতরঙ
আজকে বস্তিতে কাল নতুন শহরে জীবনের প্রতি ঘরে ঘরে ॥

৯

আঁটসাঁট বেঁধে আঁচল জড়াল কোমরে,
মুগ্ধ চোখের এক নিমেষের দেরিতে
লঘু লাবণ্যে লাফ দিয়ে চলে গেল।

কালো পাহাড়ের গায়ে চমকাল রেখা
শাড়ির শাদায় কস্তাপাড়ের সিঁদুরে
কষ্টিতে ঋজু কোমল শরীরে তরল স্রোতের ছন্দ।

এই লাবণ্যে এই নিশ্চিত ছন্দে
আমরা সবাই কেনই বা পার হব না
সামনের এই পাহাড়ের খাড়া খন্দ?

১০

চোখে জ্বেলে রাখে আকাশপ্রদীপ,
হিমের আমেজ শরীরে।
দিঘির ওপার ঢালু হয়ে আসে আর
শুধু মাঝখানে পদ্ম।

তাকে দেখ যদি মনে হবে তার দুগালে
শিশিরের যাওয়া-আসার চিকন চিহ্ন।
এইবারে বুঝি গোলাপবাগান রাঙবে।

চিলেকোঠা বেয়ে তবু কি জমবে কুয়াশা?
তবু জ্বলবে না হৃদয়ে কি তার স্বচ্ছ সূর্যালোকে
সোনালি দিনের নিশ্চিত অঘ্রান?

১১

কী করে যে বল কুসংস্কার? তাকে
দেখ যদি কোনো টাট্‌কা সকালে, সবে
স্নান সেরে ভিজে
চুল মেলে দিয়ে শুরু করে তার দিন,
তাহলে দেখবে তোমাদেরও মনে হবে,

যতই বাঁধুক তাগায় তাবিজে ভয়ে উদ্বেগে আশায়
নিজেকে এবং আপনজনকে, নানা
বিশ্বাসে আর ঐতিহ্যের ভাষায়,
তবু যেন তার শরীরের তনু নম্রতা
হৃদয়ের এক দিনরাত্রির নিয়মিত নিষ্ঠাই ।

প্রাচীন দেশের দীর্ঘ জটিল বিন্যাসে
—যেখানে বাবুর সমাজে আজকে মনের প্রাণের পক্ষে
দুদণ্ড টেঁকা দায়—
জীবিকার দায়ে ছাড়া
দেখ দেখ চেয়ে জীবনের সেই দেশে
ভিজে চুল মেলে সদ্য পট্টবাসে
গোটা জীবনের প্রেমে বিশ্বাসী বাংলাদেশের মেয়ে,
করুণায় স্মিত, প্রথমে কুমারী, বয়সে সেবাব্রতা ॥

১২

ভুল বোঝাটাই স্বাভাবিক তার ক্ষেত্রে,
ভিতরে বাহিরে দিনে ও রাত্রে মেলে না !
চিনলে চিনবে শিল্পে, কাব্যে নাট্যে গল্পে, তৃতীয় নেত্রে
সম্ভাবনার সম্পূর্ণের প্রজ্ঞায়,
না হলে স্বরূপ পেলে না, জানবে দিতে পারলে না দাম

অস্থির তার স্নায়ুর গ্রন্থি শত পাকে পাকে অঙ্কিত
শরীরে ও মনে, স্বপ্নে এবং চিন্তায়,
স্বপ্নে এবং চিন্তায় আর জীবনে ।
কালের দ্বন্দ্বে খর ইন্দ্রিয়, মন সর্বদা ঝংকৃত—
স্বাভাবিক নয় একালে মননে চোখ কান ।

সে যেন বা এক উপমায় হরধনু,
টান দেয় কোনো রাম বা পরশুরাম ।
দিনে রাতে তাই অবিরাম সে টংকৃত ।

তাকে ভুল বোঝা তাই তো সহজ,
স্বার্থপর সে জটিল, খেয়ালি,
বর্বর যেন মহেশ্বরের অনুচর,

তাকে চেনা যায় শুধুই তৃতীয় নেত্রে,
যে কৈলাসের দৃষ্টিতে সব দ্বন্দ্ব
বর্তমানের খণ্ডিত শতপাক
অতীত কালের গ্রাহ্যতা আর ভবিষ্যতের আততির
সার্থকতায় অন্বিত ॥

১৩

স্তব্ধ আকাশ ভরে দেয় সে যে ভোরে সদ্য গানে,
সারাদিন ধরে খুঁজে ফিরি তার রেশ,
কখনও বা পাই, আবার কখনও পাই না।
হতাশায় ভাবি সুর-বেসুরের শত মুহূর্ত
এইবা যত্নে এদিকে বাঁকাল,
হেলায় ওদিকে হেলাল ; এ অনিশ্চিতি চাই না,
পাই না যে তার যোজনার উদ্দেশ।

তাই তো ধূর্ত-দিনের একটি পলকে
কাজ-অকাজের সংসারে
আলেখ্য তার বারেবারে হয় খণ্ডিত,
আবার আত্মগ্লানির ঘুমে যে বেশ পরে তাও অর্ধেক।

তাকে চেনা যায় গোটা দিনরাত মেলালে,
তাকে চেনা যায় সূর্যোদয়ের স্বচ্ছ বিজয়কেতুতে
যখন ক্ষিপ্র নীলের সত্যে সত্তা অবাক স্তম্ভিত
চেতন এবং অবচেতনের সেতুতে,
সমগ্রতার ইন্দ্রধনুর চির-অস্থির ঝলকে ॥

১৪

ভেবে দেখো সে কি ভুল হবে যদি তাকে ভাবো আজও উল্কা,
যে আগুন আগে ছড়াত তন্বী পথের চলতি আকাশে,
সে আগুন আজ আশ্বিন দিনে ব্যাপ্ত।
সে যে কথা বলে তাকায় বা চলে সবেতেই
মুখর সচল আবেগের জ্যোতি জেনো উদাত্ত সত্তার।

দীপ্ত চেতনা দু-হাতে চলে সে মিলিয়ে
আমাদের যায় বিলিয়ে কাউকে ঊষার প্রথম বিভাস
কাউকে সন্ধ্যানীলের বর্ণ-বৈভব ।
কাউকে বা দেয় মধ্যাহ্নের শান্ত কূজনে আহুতির ঠিক মধ্যে
দিনের কেন্দ্রে অগ্নিবীণার তাণ্ডব,
যেখানে মুগ্ধ চোখের মণিতে হয়ে যায় একাকাব
ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র ও ঝিল্লি-অন্ধকার ।
ভালো হবে যদি তাকে ভাবো শুধু ক্ষণিকেব বিদ্যুৎ
চলে যায় যবে সামনে দিয়ে সে যায়,
তার যাওয়া-আসা প্রাত্যহিকের আকাশে
প্রহরে প্রহরে আমাদের চেনা সূর্য,
তাব চোখে বহু নীহারিকা আর নক্ষত্রের আহ্নিক ॥

১৫

রাতের ঘোরে ঘুমের মতো হারায় সে কি ভোরে ?
দুয়ার-বাঁধা অন্ধকারে কেন যে তাকে খোঁজা !
কেন যে তাকে সাপের মতো মনের পাকে মোড়া !

মিলিয়ে দাও পাহাড় থেকে গ্রামের প্রান্তরে,
শূন্য নীলে বিলিয়ে দাও ঘুমের লোভী বোঝা,
মনপবনে পথে-প্রবাসে ছুটিয়ে দাও ঘোড়া,

তবে না ওকে দেখবে রোজ আপন বাহু-ডোরে,
রাত্রিদিন কেন্দ্র পাবে, শান্ত হবে যোঝা,
স্বপ্ন আর জাগর হবে গাঁটছড়ায় জোড়া ;

আকাশে ওকে মুক্তি দাও, তবে না দুহুঁ কোরে
বিচ্ছেদের কান্না জমে . ওর খোঁপায় গোঁজা
প্রত্যহের যে ফুলটি তা বহু হাওয়ায় ওড়া,

বহুযুগের গন্ধে মোড়া অনেক দেশ ঘুরে
ওর স্বরূপ ধূপের মতো, ছড়ায় নিজে ও যা,
যদিও ওরই শুকতারায় বহু তারার তোড়া ॥

## ক বছর পরে

ক বছর পরে
যখন ভাঙবে সব স্মৃতির মঞ্জুষা,
আর আজও অম্লান যা, বিপুল কামনা,
তখনো কি ফাল্গুনের ত্রয়োদশী রাত
হৃদয়ের হাত ধরে এই চেনা ঘরে
ছড়াবে একটি করে পাপড়িতে পাপড়িতে
সেই চেনা মল্লিকার কণা ?

ক বছর পরে ?
মৃত্যুকে দেখি না আজও আনাচে-কানাচে
আজও দেখি সর্বদাই আকাঙ্ক্ষার ঢেউয়ের সংঘাত,
একাগ্র মধুর স্মৃতির মন্থর স্বরে
আজও নিত্য বাঁচে যে তীব্রতা,
তুমিই কি আন সেই আকাশের আনন্দের পতিব্রতা ঊষা ?

ক বছর পরে
সব স্মৃতি হয়তো বা অন্ধ মরীচিকা,
থেমে যাবে প্রত্যহের নির্ঝরে কামনা,
তবু সেই ঘরে আজও দেখি
অঘ্রানের যে গোলাপ গন্ধের স্পন্দিত নীলিমায়
নিঃশ্বাসে টেনেছি কত,
পরাগের সে তীব্র যন্ত্রণা
তুমি দিলে, সে কি গোলাপ ? মল্লিকা ?

## প্রেমের ক্ষমতা

নিষ্ঠুর আকাশ, আর নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর তার চোখ,
নিষ্ঠুর হাতের কাঁচি, কেটে চলে পল্লবিত ডাল,
বিস্তৃত বাগান, তার ক্লান্তিহীন মৃত্যুহানা রোখ্,
পায়ে পায়ে ঠেলে ফেলে, জড়ো করে পোড়ায় জঞ্জাল

আকাশে পালটায় রঙ,সূর্যালোক দুচোখে মাতায়,
প্রেমের আলোয় নত দৃষ্টি ভ'রে\মায়ের মমতা,
সে ঘোরে শিশুর রাজ্যে, ডালে ডালে পাপড়িতে পাতায়·
গন্ধে রঙে হাসি গান । দীর্ঘদর্শী প্রেমের ক্ষমতা !

## একটি বিবাহবার্ষিকী-তে

এ কথা ঠিক যে আকাশে ঘনায় ঘটা,
দুঃসময়ের বিহঙ্গ পাখা ঝাড়ে,
আমাদের দিনে হাজার কাজের ছায়া ;
তার মাঝে ওড়ে তোমার অলক উদ্দাম ।

খুলে খুলে পড়ে কৃষ্ণচূড়ার জটা,
শিবিরে শিবিরে তবু শান্তির মায়া,
বৈকালী ঢেউ আমারও হৃদয়-পাড়ে,
তাই তো তোমার নাম গান করি নাম ।

লীলাপ্রাঙ্গণে পালা হয়ে এল শেষ,
পূর্বরাগের দিনগুলি স্মৃতি-পাথর,
অতনু অতীতে মধুমিলনের মাস,
মাথুরের জ্বালা চিকন কালের চন্দনে,

কখন হয়েছে নববাসন্তী বেশ
বার্ধক্যের শুভ্রে চাঁদিনীবাস ,
তবুও হৃদয় মুখর প্রাচীন স্পন্দনে,
তবুও পোড়ে না আখর ॥

## হাওয়ায় যেমন

শক্তিকে বড়ই ভয়, শক্তি কিংবা শক্তির লুব্ধতা ।
অথচ এও তো জানি : শক্তির সাহায্য বিনা কিছু সাধ্য নয়
এ যেন বৃষ্টির মুখ চেয়ে থাকা,
শেষে যবে যদি বৃষ্টি হয় সে ভাসায় বন্যাস্রোতে,

কোথাও বা মৃত্যু আনে দানবিক অণুর খেয়ালে,
দুর্মূল্যের পণ্য জ্বলে, অগ্নিমূল্যে অতিবৃদ্ধ শিশু-দেশে
শস্তা থেকে যায় বহু পঞ্চবর্ষব্যাপী জীবন, জীবিকা।
শক্তির পূজারি নই কোনোদিন, শাসনের অর্থের ক্ষমতা
দূরে পরিহার করি,
একমাত্র মানুষে ব্যক্তিত্বে মনুষ্যত্বে কিনা
আমাদের মনের বিহার,
এমন-কী আচার্যের ভার—শিক্ষায় বা অধ্যাত্মেই
কোনো দিন করি না স্বীকার মুক্ত মনে।
মেনেছি মনের শক্তি, যত বিহ্বলতা থাক
মননে তো নেই বিভীষিকা।

অথচ এ মন, সেও ভয়ানক, শুদ্ধ মনের রুদ্ধতা
কম অত্যাচারী নয়, স্বাধীন মনের মোহ
কত অনাচার করে, কত না কর্তব্যে ফাঁকি দেয়,
স্বার্থে কত স্বপ্ন বোনে, ক্রমাগত নিজেকে বাঁচায়
অন্যকে বঞ্চিত ক'রে।
এমন-কী প্রেম, তা সে ব্যক্তিক বা মানবিক
যে ইস্পাতে প্লাটিনমে গড়া হোক
সেও তো আপন জোর অন্যের বা অন্যদের মনে
চাপায় ব্যক্তিত্বগর্বে প্রেমের পরম দর্পে প্রচণ্ড দাবিতে,
মানবিকতার নিষ্ঠুর সন্ত্রাসে, আদর্শের বিদ্যুতে ধারায়
শত বাধা শত শত্রুব্যূহ ভেঙে দেয়
নিজ মহিমায়, প্রেমের বিপ্লবী তেজে।
তারপরে, এক দিন, অন্যজন অথবা অন্যেরা
ভোগ করে যাকে বলে প্রতিক্রিয়া
প্রেমের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিত্বের মহাদ্বন্দ্বে জানায় বিদ্রোহ।
শক্তি বড় ভয়ানক, যে কোনো রকম শক্তি প্রয়োগের
যে কোনো সুযোগ।

শুধু বুঝি জড়ের উপরে যে কর্তৃত্বে
মানুষের একমাত্র প্রাকৃতিক জয় :
রেখা-রঙে কাগজে খাতায় কাঠে ব্রঞ্জে মাটিতে পাথরে
সুরে শব্দে ভঙ্গিতে বিন্যাসে,
সেই রচয়িতা শক্তি সেরা,
সেই শুধু ক্ষতিহীন ন্যায়নিষ্ঠ আত্মস্থ উদার।

নাকি সেও ভয়ানক আজ অতিবৃষ্টি কাল অনাবৃষ্টি সেও অভিশাপ ?
উৎস তার যৌবনের আত্মরতি, অন্তে শুধু বর্ধিষ্ণুর বৃদ্ধ অহমিকা ?

শক্তি বড় ভয়ানক, হোক যত আবশ্যিক, সিদ্ধকাম, দুর্নিবার ;
তার চেয়ে ভয়ানক অনভ্যস্ত শক্তির লুব্ধতা ।
শক্তিকে ছড়াব কবে জনে জনে ঘরে ঘরে দেশে দেশে
হাওয়ায় যেমন বাষ্প তাপ হিম থাকে স্তরে স্তরে !

# তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

সূচিপত্র

## তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ

তুমি কি কেবল-ই স্মৃতি, শুধু এক উপলক্ষ্য, কবি ?
হরেক উৎসবে হৈ হৈ
মঞ্চে মঞ্চে কেবল-ই কি ছবি ?
তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ
আর বাইশে শ্রাবণ ?
কালবৈশাখীর তীব্র অতৃপ্ত প্রতিভা,
বাদলের প্রবল প্লাবন, ·
সবই শুধু বৎসরান্তে একদিনেই নির্গত নিঃশেষ ?

অপঠিত, নির্মনন, নেই আর কোনো আবেদন ?
সাবিত্রীর ক্ষিপ্রকর বিভা
আমাদের দুস্থ চির গোধূলিতে ম্রিয়মাণ ?
তোমারই কি ছিল এই নিরানন্দ ভঙ্গুর স্বদেশ
আলোহীন অন্ধকারহীন আপন সত্তার থেকে পলাতক
নিস্তব্ধ থাকার ভয়ে একার সংশয়ে জনতার অপমানে
নিত্য রুচি ক্ষয়ে ক্ষয়ে অসুন্দর ?

কোথায় সে প্রতিদিন রূপের রচনা,
সেই নিরন্তর সুন্দরের ধ্যানের উন্মেষ,
অনাত্মীকরণে সদা নিজেকে সে উত্তরণ,
নিরলস জ্ঞানের নিয়ম
কঠিন শিক্ষার শ্রম,
বুদ্ধির নির্ভয় শুভ্র আলোকে আলোকে,
আত্মস্থের স্তব্ধতার শুদ্ধ অন্ধকারে
শূন্যে শূন্যে ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে দীপ্ত গীতে
চৈতন্যের জ্যোতিষ্কে জ্যোৎস্নায়
উদ্‌ভাসিত সুদীর্ঘ জীবন,
যেখানে পর্বত ওড়ে আশ্বিনের নিরুদ্দেশ মেঘ,
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের বাঁকা তলোয়ার,
নদীর নূপুরে বাজে নদীর জোয়ার,
শিহরায় দেওদার বন।

তোমার আকাশ দাও, কবি, দাও
দীর্ঘ আশি বছরেব
আমাদের ক্ষীয়মাণ মানসে ছড়াও
সূর্যোদয় সূর্যাস্তের আশি বছরের আলো,
বহুধা কীর্তিতে শত শিল্পকর্মে উন্মুক্ত উধাও
তোমার কীর্তিতে আর তোমাতে যা দিকে দিকে
একাগ্র মহৎ,
সে কঠিন ব্রতেব গৌরবে,
আমাদের বিকাবের গড্ডল ধুলার দিনরাত অন্যায়ে কুৎসিতে
শুনি যেন সুন্দরের গান
দেখি যেন একনিষ্ঠ দীর্ঘায়ুর প্রগতির এক ছবি,
সুন্দরের গান যেন শুনি, গাই,
দশটার পাঁচটার উদ্‌ভ্রান্ত ট্রাফিকে,
বস্তিতে বাসায় আর বাংলার নয়া কলোনিতে,
জীবিকার জীবনের ভাঙা ধসা ভিতে,
বোম্বাই সিনেমা আর মার্কিনি মাইকে অসুস্থ বৈভবে,
মরা খেতে কারখানায় পড়ি যেন জীবনের
সংগ্রামশান্তির স্পষ্ট উপন্যাস,
খুঁজি যেন সকালের সূর্য থেকে সন্ধ্যার সূর্যের হবি
শুনি যেন আমাদের কান্নার অতলজলে অমর ভৈরবী
প্রত্যহের সচেষ্ট উৎসবে,
সহজ অভ্যাস ফেলে সকালে সন্ধ্যায় বারো মাস
বছরে বছরে পড়ে যাই জীবনের স্বাধীন বিন্যাস,
নিভৃত ছায়ায় চৈত্রে শালবনে
তোমার বসন্ত গানে রক্তরাগে হৃদয় স্পন্দনে
আমাদের দিনের পাপড়িতে, জীবনের ফুলে ফলে
ভ্রমরগুঞ্জনে নব পল্লবমর্মরে
গড়ে তুলি আজ কাল, মাসে মাস, শত বর্ষ পরে
আমাদের প্রতিদিন, কবি ॥

## আঁখি

তোমার আঁখির পান্থপাদপে ঝারি
স্মৃতির প্রদাহে আনে জ্যৈষ্ঠের বারি,
শ্বেত কমলের কৃষ্ণ পক্ষ্মে হৃদয়
খুঁজে পেল তার আষাঢ়ের আশ্রয়,
নীলিম পাণ্ডু পটলে সূক্ষ্ম শিরায়
ওষ্ঠাধরের পথিক ক্লান্তি জিরায়,
এই ধরে রাখি মুহূর্ত আঁখিপুটে,
এই চেয়ে দেখি অনন্ত কনীনিকা,
নয়ানখালির মেঘ মেখে নিই মুখে—
হঠাৎ রৌদ্রে নিয়ে যায় সব লুটে,
দূরের স্বপ্ন হয়ে গেল সব ফিকা—
তুমি কোথা জানি কী ঘটনাকৌতুকে ॥

## বামী

বামীকে সবাই চেনো, ছোট্ট মেয়ে বামী
যে সেই তারায় ভরা চৈত্র রাতে ছাতে
কেঁদে বলেছিল, আমি
অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েছি, সেই ভীতু মেয়ে বামী
কী করে যে তারা-ভরা আকাশের
অসহায় আকুল বিস্ময়ে
অন্ধকারে ছাতে,
জীবনের অন্ধকারে কাটাবে জীবন
উপরে সিঁড়িতে নিচে কণ্টকিত ভয়ে,
যেখানে আরশোলা চাটে বই ছবি,
মাকড়শা ছড়ায় জাল,
আর টিকটিকি আরশোলা খায় ;
যেখানে নির্মাতা, স্রষ্টা, শিল্পী, কবি,
প্রেমী অবজ্ঞেয় ;

ভয়াবহ হেয় জীবনের ঘেঁষাঘেঁষি
সেই অন্ধকারে ভাবি আমি
ছোট্ট মেয়ে বামী কী করে যে বড়ো হবে,
বাল্য থেকে কৈশোরের যৌবনের পারে
প্রৌঢ়ের প্রশান্তি পাবে সম্পূর্ণ সংসারে,
আঁচল-আড়ালে দীপে ভাস্বর সত্তাটি
খাঁটি রেখে বর্তমান জীবনের অন্ধকারে কলুষিত দাবি
মেটাবে সে কী করে যে, ভাবি
কী করে সে অন্ধকার দীপান্বিত করে দেবে,
আরেক বৈভবে ॥

## দুরন্ত স্মৃতি

দিঘিতে তিনটি শাদা হাঁস,
ওপাড়ে সবুজ কচি ঘাস,
শরতের নীলের আকাশে
ছোটো ছোটো মেঘ কয় থোকা,

বামী ঘোরে আমাদের পাশে,
তুমি, আমি, আমাদের বামী—

দুরন্ত স্মৃতি কি যায় রোখা ?

## করেছ যে ধনী

সূর্য যেন আকাঙক্ষায় লাল ভালোবাসা,
জেগে ওঠে আমাদের জীবনের গ্রাম।
তবু জানি রৌদ্র করে রাত্রিকে প্রণাম —
কে-বা করে নির্বিশেষ নিত্য আলো আশা ?

সূর্যাস্ত গোধূলি নিত্য আর তারপরে
অমাবস্যা, নয়তো পূর্ণিমা।
সূর্য যেন ভালোবাসা প্রতি ঘরে ঘরে
তারায় তারায় গ্রহে সূর্যেরই মহিমা।

হে সূর্য ধরিত্রী, তবু যেয়ো না এখনই,
আমাদের দিনান্তের গান সবে শুরু,
একা-কে হারাতে আজও বক্ষ দুরু দুরু,
এই সবে বৈকালীতে করেছ যে ধনী ॥

ঈস্টর ডে, ১৯৫৫

## নবপ্রতিষ্ঠায়

দুঃখের অবধি নেই, তুমি জানো আমার কাহিনী.
থেকে থেকে অনুকম্পা দাও অন্য মনে আলিঙ্গনে,
কখনও বা স্মৃতির শহরে হান তোমার বাহিনী,
ভাবি বুঝি দিন যাবে ছদ্মবেশে একাকীর কোণে।

তোমারও প্রতাপ দেখি পৃথিবীর কাছে মানে হার,
দুপাশের দেশ কাঁদে, তোমার ও আমার স্বদেশ—
অনাহার অর্ধাহার আর অনাচার অত্যাচার,
সে বৃহতে হেরে যায় যন্ত্রণার একাকী আবেশ।
আমার ব্যাপক দুঃখ রূপান্তরে উন্মুখ নিষ্ঠায়
তোমাকেই চায় তাই যন্ত্রণার নবপ্রতিষ্ঠায় ॥

১৬ এপ্রিল, ১৯৫৫

## মরা গোলাপ

দুঃখ তো আমার জানা, মনে পড়ে গোলাপ বাগানে
সে কবে দুঃখের দিন এসেছিল, তুমি ছিলে পাশে,
তোমাকেই বলি তবু, শোনো চোখে-চোখে কানে-কানে,
মর্মভেদী গান যেন ফিরে যায় গায়িকার প্রাণে,
সেদিন আনন্দ ছিল দুঃখের সন্ত্রাসে।

বাড়ি আজ পোড়ো বাড়ি, দেওয়ালের ফাটলে শেওলা,
আজ কোথা সে বাগান, জঙ্গলে শেয়াল ডাকে বেশ,
বাথানে সাপের বাসা, ইঁদুরের অধিকারে গোলা।
যে দুঃখ জেনেছি আমি, সে দুঃখ কখনও যায় ভোলা ?
আমার সে দুঃখে আজ মেশে সারা দুঃখের স্বদেশ।

আজ মনে হয় সেই আমাদের অপার অতীতে
যৌবনের ঐকান্তিক চৈতন্যের স্বভাবেরই খাদ
সেদিন দিয়েছে দুঃখ, ওস্তাদের হাতে যেন তার
দুঃখের আঘাতে বাজে সৃষ্টিময় সত্তার সংগীতে
আজ মরা গোলাপের কাঁটা শুধু আমার বিষাদ ॥

## ২৯শে নভেম্বর

আজ সে আসবে পথে প্রকাশ্যের বিজয়-তোরণে,
হৃদয়স্পন্দন আজ অতিকায় হাজার মাইকে
গোপন প্রেমের মৃদু দীর্ঘশ্বাস আজ বিস্ফোরণে
আসমুদ্র হিমালয় ঢেকে দেবে নূতন স্ট্রাইকে
মজুর মালিক যাতে বাহুবদ্ধ মিটিঙে মিছিলে,
বিরোধীর কণ্ঠ রুদ্ধ বন্ধুত্বের মহাসামুদ্রিকে,
লালদিঘির ধূসরিমা ধুয়ে যায় পথে ঘাটে ঝিলে,
লাল তারা জ্বলে আজ সর্বত্র দেশের দশদিকে !

আজ সে আসবে, আজ রেখে যাবে বিরাট ইঙ্গিত,
ভবিষ্যৎ রেখে যাবে, কোটি কোটি হৃদয়ের মিলে,
সে আসে যে দেশ থেকে, সে ভূস্বর্গে জীবনের ভিত

আরেক পত্তনে পাকা, মানবিক প্রেমের নিখিলে
সেখানে মানুষ ন্যায়ে স্বাধীন ও নির্ভয় মানুষ ।
সেখানে উত্তরে তাই দক্ষিণের ফুলফল ফলে,
মরুভূমি গায় আহা বাংলাব আষাঢ়ের জলে ।
সে দেশের হাওয়া আজ এনে দেবে রুশের পৌরুষ ॥

## সূরজমুখীর প্রাণ

সূর্য তখন পড়ে গেছে পশ্চিমে—
ওরা কারা করে মৃত্যুর মিহি গান :
বন্দিনী কোন্ সুন্দরী মৃত হিমে
নিথর :—করুণ সুরে কারা করে গান !

কয়লাখনিতে সে কান্না ছায়া বাঁধে,
মায়াবী আকাশে স্তব্ধ বাতাসে গান
বলে যায়, সহমরণের মহাসাধে
তাই কি বিশ্ব বিষণ্ণ ম্রিয়মাণ ?

বিষাদে বিধুর আবেশে তীব্র বোলে
গ্রামের কাতর রাত্রির ঘরে ফিরি,
কানে আসে ও কি গ্রাম্য নাচের ঢোলে
আমনের খুশি চাষিদের দেশী গান ?

ও কী গান শুনি ? নাগ্‌ড়া মাদল ঝাঁঝে
কত কন্যাকে জীয়ায় সোনার কাঠি ?
প্রাণ পায় ভোরে মরেছিল যারা সাঁঝে ?
আমি বসে যাই এই পাঠে সহপাঠী ।

ভোরে প্রাণ পায়, পূবের পাহাড় জাগে,
পশ্চিমে টিলা কুমারীর স্মিতরাগে
চোখ মেলে, রাঙা নদী চলে ঝিরিঝিরি !
এনে দিলে বীর নির্ভয় কোন্ আসান্ ?
ফিরে এল বুঝি সূরজমুখীর প্রাণ ?
আসানসোলের উষার হাসিতে ফিরি ॥
৮ ডিসেম্বর, ১৯৫৫

## একটি বকুল

একটি বকুলে ফোটে দুজনার ছবি,
দুইজনে পুঁতেছিল একটি বকুল
আজ তার ফুল ঝরে নিঃসঙ্গের গানে,
পাহাড়ের গোধূলিতে ভাসে তার সুখ,
আকাশের পাখোয়াজে নিঃসঙ্গ বিধুর
শূন্য ঘরে ঘরে ওড়ে গন্ধময় সুর,
এ গাছে ও গাছে প্রশ্ন সারাটা বাগানে ।

বাইশটি শ্রাবণের চোখের তলায়
বকুল বেড়েছে, আজ ছেয়ে গেছে ফুল,
আর কত কাল বলো ব্যর্থ দিন গোনা ?
বকুলের মালা দিক এ ওর গলায়,
মুঠি-মুঠি তুলে নিক ঝরা ঝরা ফুল ।

ছিল দুইজন, আর একটি বকুল—
আবার দেখতে চাই আছে তিনজনা ॥

৬ ফেব্রুআরি ১৯৫৬

## একটি মেঠো কাহিনী

সদ্য সূর্য জাগছে, নদীর কুয়াশা
পাহাড়ের গায়ে লাগছে ।
তুমি একাধারে সূর্য এবং পাহাড় !

যদি ভেবে থাক ঝিঝির ঝিঝিট নশ্বর,
তাহলে সে ভুল.
বহু বছরের অষ্টপ্রহর কীর্তন ।

পথ দিয়ে তুমি চলে গেলে যেন
হালকা উজানি নৌকা।
নদী হয়ে যায় মাল্লার গান, তন্ময়।

তুমি ভাব বুঝি তোমার হাসির ঝরনায়
মেলাব চোখের নদীকে ?
অসীম ধৈর্য, ঝরনার মোড় ফেরাব।

তোমাকে দেখলে দিঘি হয়ে যায় নদী,
বৃথাই কেবল বাঁধ তোলা হায়, নদী
শুনেছে অথই সাগর জলের গান।

সঠিক খবর দাওনি, শুধুই বাতাসে
মনে হয় আসে আশ্বিন,
হৃদয় হয়েছে ঝক্‌ঝকে তলোয়ার।

অছিলার নেই অভাব,
এই যাই বাঁশ-সাঁকোর জোড়টা সারাতে,
এই যাই আল ভাঙতে।

সকাল বেলার ত্বরিত শিশির,
সারাদিন দেখা নেই,
কেনই বা আসা রাত্রির ঘুমঘোরে ?

স্বপ্নের কথা মেনেছি, নিত্য সাঁঝে
খুলে রাখি দ্বার, যদি বা হাওয়ার খুশিতে
ভিতরেই চলে আস।

তোমাকে জিতব জীবনের অধিকারে,
হাতে হাত বেঁধে গড়ব আরেক জীবিকা।
দয়িতা আমার, নির্দয় হোয়ো নাকো।

আমি যেন হিম মাঘের মাটিই,
তোমাতে হাজার বউল,
বৈশাখে আম নামবে।

হাটে গেলে আর সাধের অন্ত থাকে না,
এই ভাবি হই গালা-জোড়া চুড়ি
এই শাড়ি এই গামছা ।

সাঁচিপান নই,
আমার কথায় তোমার ঠোঁট কি রাঙবে,
এই ভেবে হই মাঠ পার ।

আমাব কী ভয়, আমার মুঠিতে
দীর্ঘ আশার বর্শা,
নেকড়েরা বৃথা হন্যে ।

তুমি ছাড়া গ্রাম মরা দেশ
তুমি না এলে যে
শহর শুধুই জড় কবন্ধ গঞ্জ ।

নাই থাক পাতা, তবুও রয়েছে
সজিনার শত বাহু,
আমিই কেবল হারব ?

বাতাস তোমার আঁচল ওডায় উতরোল,
নিঃশ্বাস নিই বাতাসে
শ্বাস প্রশ্বাসে তাল দিয়ে যাই বাতাসে ।

কেটে দিই এই আড়াল,
সূর্যে মেলাই চাঁদের লক্ষ তারাব
অভিন্ন যোগাযোগ ॥

## এ দেশ

তোমাতে পাহাড় আর সমুদ্রের বালুবেলা মেশে,
স্পষ্ট সুগঠিত রূপে কোমল সোনালি বিস্তারের
আদিগন্ত অসীমতা। আমার অন্বেষা এই দেশে
অবিরাম, অন্তহীন আকর্ষণে খুঁজে ফিরি ফের
যা পেয়েছি বহুবার—যেন কেউ নিজে তৃপ্তি পায়
নিজের সত্তাকে পেয়ে চৈতন্যের নিঃসঙ্গ আশ্লেষে !
এ যেন বাতাসে খোঁজা আকাশের সীমান্ত কোথায়.
যেন অগণিত সূর্যতারা ছোটে আকাশের শেষে
মৃত্যুর বিশ্রাম চেয়ে।

এ দেশ আমার চেনা দেশ,
আমারই আপন সত্তা, অফুরন্ত এর গাছে ঘাসে
আমার চোখের মুক্তি, প্রত্যহ টিলায় আনাগোনা,
ঝিবিঝিরি বালুকায় সর্বাঙ্গের নিত্য চেনাশোনা,
স্বচ্ছ ঝরনায় মুখ, পান করি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
আকণ্ঠ যে সুধা তাতে দিনরাত্রি মুক্ত, নিরুদ্দেশ
নিঃসঙ্গের মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত শরীরে শরীরে।

আমাব পৃথিবী তুমি বিশিষ্টার বিচিত্র গভীরে ॥

১৬ফেব্রুআবি, ১৯৫৬

## নব মুচিরাম বিলাপ

**শুনেছি নীলকে তিনি করবেন লাল !**
পণ্ডিতজিব **রুচি বোঝা আমার অসাধ্য,**
**অবশ্য জানি না কিছু, রাজায় রাজায়**
**যা চলে চলুক,** কী-বা বুঝি, **শুধু খাগড়া !**

জেনেছি তবিল কার্য এবং মারণ।
খামকা বিদেশী ডাকা, শহর সাজায়
আমাদের সঙ্গে যত জনসাধারণ !
জনসাধারণ ! যবে বিদ্রোহী নাগড়া
বাজাবে রাস্তার লোক গরিব, অবাধ্য ;
তখনও কি আমাদের দিতে হবে তাল ?

আমার বয়স খুব বেশি নয়, ষাট
বা সত্তর। খেটে খেটে মনেও থাকে না
জন্মেছি কখন কবে. মনে হয় আমি
জন্মমৃত্যুহীন, শুধু রয়েছে আপিস
সমস্ত আকাশ জুড়ে, সারাজীবনের
অফিসার মাত্র, মন্ত্রী নই, নই লাট।
গদি থেকে গিরিনদী সমুদ্র ডাকে না
আমাকে ছুটির টানে। পুত্র পিতা স্বামী
এই সব পরিচয় করে ফিস্‌ফিস্
বৃথাই আমার প্রাণে। আজও পেনসনের

কোনও লোভ নেই. খাটি এক্‌সটেনশনের
পরেও কত না দেখ একাজে ওকাজে—
দেশমাতৃকার পায়ে চাকুরে আরতি !
মিথ্যা লজ্জা ভোলায়নি আমাকে কখনও,
জেনে শুনে কর্মযজ্ঞ করেছি তদ্‌বির
ছেলে ভাগ্নে ভাইপোর—দু'দশজনের।
নিজের পরের জন্য করেছি যা সাজে,
মুচিরাম আমাকেই জেনো সেটা স্থির।

আর দেখি দেশ ব্যেপে একী বা দুর্মতি !
হরি বলো মন তবে পেন্‌সনটা গোনো ;
গোটা ছয় নাতি আজও লাগেনি যে কাজে ॥

## কবে পাবে

গাছের উপরডালে ঝিরিঝিরি হাওয়া ;
পাড়ে নয়, স্রোতে শুধু অবিশ্রাম গতির আভাস :
গাছের উপরে শুধু দুটি শ্যামা ডাকে,
স্রোতের কিনারে শুধু পাথরের বাঁকে চুপচাপ
প্রতিযোগিহীন দুই ঝাঁকে পাতিহাঁসের বিশ্রাম ।

অত্যন্ত এ অন্তরঙ্গ পৃথিবীর রূপ, প্রাণের বিন্যাস
এই স্তব্ধ মধ্যাহ্ন-প্রহরে মনে মনে নিয়ে যাই,
কাজ হয়ে ওঠে গান, রৌদ্র, হাওয়া, প্রতীক্ষা, বিশ্রাম
ছিন্নভিন্ন মুখর শহরে ।
প্রকৃতির মুখচোরা সচ্ছল বিজ্ঞানে
বিশৃঙ্খল মুহূর্তের কেন্দ্রে স্থির প্রত্যক্ষের ধ্যানে
কবে পাবে, কবন্ধ শহর কিংবা শহরের গ্রাম নয়, নিকট ও দূর
গ্রামে ও শহরে শহর-গ্রামের স্বচ্ছন্দ আরাম ।

টিলার ওপাশ দিয়ে তিতিরের ঝোপের সামনে
নেচে চলে তিনটি ময়ূর ॥

## পলাশ

না জানি কী দীর্ঘ সেই ভয়াবহ ইতিহাস ?
যেদিকে তাকাই
অনেক মাইল ব্যেপে পৃথিবীর রাঙা দীর্ঘশ্বাস
বিষাদে আহত করে থরো থরো সৌন্দর্যে আকাশ
যত দূরে চাই ।
লাখো লাখো বিষধর শঙ্খচূড় একদা এখানে
লড়েছিল পৃথিবীর সঙ্গে মত্ত মৃত্যুর আহ্বানে,
শস্যশ্যাম বৃক্ষছায়াঘন সেই পৃথিবীর টানে,
হৃদয় উদাস .

পাহাড়ে টিলায় চলে ডাঙা বেয়ে বেয়ে মন চলে,
আর দেখি আমাদের বিরিক্ত চূড়ায় ঠায় জ্বলে,
চৈত্রের আকাশে এক পরাক্রান্ত জীয়নকৌশলে
বিজয়ী পলাশ,
স্পষ্ট দেখি লাখোলাখো নাগনাগিনীকে পায়ে দলে
আর ধরে ধরিত্রীর ফুলন্ত ফলন্ত ধারাজলে
মাটির সংহত ইতিহাস ॥

## এখনই বিদায়গান

এখনই বিদায়গান ? শ্রাবণের থৈ থৈ প্লাবনের আগে
শুকাবে কি সোঁতা, বন্ধু, জাগাবে কি পাণ্ডু বালুচর ?
আশা-জিজ্ঞাসার স্রোত ডুবে যাবে নীরক্ত বিরাগে,
স্মৃতি শুধু রেখে শুধু প্রতিক্রিয়া নীরব ধূসর ?

এ নৈরাশ সাজে নাকো । মনে প্রাণে ইন্দ্রিয়ে সংগীত,
তোমারই অর্কেস্ট্রা সে যে বিশ্বময় বিরাট আসরে
আশার উৎসবে জ্বালে আনন্দের অস্থির সংবিৎ
যন্ত্রণার মীড়ে-মীড়ে মৃত্যু-লেখা প্রাণের আখরে—

তুমিই কি হার মানো ! বিজ্ঞানীর তন্ময় সংরাগে
কর্মীর একান্ত বেগে প্রেমিকের আবিশ্ব আশ্লেষে
তুমিই কি ক্লান্ত মূক কৌটিল্যের মায়াবী নির্দেশে
ঘৃণায় ঘৃণায় দীর্ণ, আত্মভুক্ বিচ্ছিন্ন বিরাগে !

এখনই বিদায়গান ? হে বন্ধু ফিরাও মুখ খোলো,
চোখ তোলো, মোহানায় জেগেছে কি মরা বালুচর ?
তবু তো ছুটেছে ঝরনা, উৎসের সত্যকে কেন ভোলো
অমোঘ প্রখর ক্ষিপ্র মুখর ভাস্বর,—

পাহাড়ে অমোঘ ক্ষিপ্র পাথরে কাঁকরে খরতোয়াই
মাঠের হরিতে দীপ্র প্রান্তরে সে উদার ভাস্বর—
চোখে তার সূর্য সোনা, স্রোতে স্রোতে ভাসায় খোয়াই
—কানে তার নীলে নীল দূর তবু ভ্রান্তিহীন সমুদ্রের স্বর ॥

## আজ এসো

কী তাকে বলব ভাবি, জানিয়েছে, আজ সে আসবে ।
বলব কি : শিমূলের বর্ণচ্ছটা আজ আর নেই,
অবশ্য গোলমোরে আজও সূর্য ধরে সোনা থোলো থোলো
তাই কি তোমার আজ আসার সময় শেষে হল ?

সে যবে প্রথমে মুখে, তারপরে দুচোখে হাসবে,
বলব কি : এলে আজ, আমার যে ঘর-বার নেই,
চৈত্র গেছে, বৈশাখের দীর্ঘশ্বাসে আমার আয়ুতে
কত পাক খুলে গেছে, তুমি কি দেখতে এলে তাই,

তোমার ও কৌতূহলে আছে কিছু আগামী আকাশ ?
ভাব কি অনেক কাল মুছে যায় এ জলবায়ুতে,
একটি বিকালে মুছে জীবনের সুদীর্ঘ প্রবাস ?
এ জীবনে যুগান্তর জান তুমি আমারই আশ্লেষে ?
মনে মনে নিত্য আস, আজ এসো প্রত্যক্ষ স্বদেশে ॥

## বোহিনিয়া

কোথায় গিয়েছে সেই দিন । তার স্মৃতি
আজ শুধু একাকিত্বে জাগে ।
অন্য যে, সে জীবনের যুদ্ধে বীর কৃতী ;
কৃতিত্ব কোথায় বলো স্মৃতির সংরাগে ?

সময়ের দুই পিঠে দিয়ে জোড়াতালি
একজনা আজও দেখে নিবিড় আকাশ,
সেই ঘর, জানালার পাশে বোহিনিয়া,
যে গাছে দুজন লোক এক অবকাশ
জোড়ে জোড়ে গেঁথেছিল।
আজ একজনা
সে গাছে খোঁজে না ফুল, ডেলিয়া জিনিয়া
সিঁড়ির দুধারে টবে রাখে তার মালী।

অন্য ঘরে সেই ফুল রাখে একজনা,
বেয়ারাই আনে খাসকামরায় ডালি।

আমার ঘরের পাশে ঝরে বোহিনিয়া ॥

## রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখা অভিভূত করেছিল ?

এ প্রশ্নের কী উত্তর ? এ যেন বা জিজ্ঞাসা সূর্যের
কোন্ ক্ষণ ভালো লাগে সারাদিনে প্রহরে প্রহরে,
কিংবা কবে কোন্ দিন ঋতুতে ঋতুতে বৎসরে
সূর্যের কী গান ভালো লেগেছিল প্রকাশ্য-উদ্যের
মধ্যাহ্নে উষার স্বচ্ছ বৈকালীতে সন্ধ্যায় করুণ ?
আশৈশব যে আলোয় রৌদ্রখর আভায় পাণ্ডুর
নিঃশ্বাসটেনেছি নিত্য অভ্যাসে সহজ, ব্যথাতুর,
কখনও বা হর্ষময়, সাতকোটি সবাই অরুণ
এক সূর্যরথের সারথি, সপ্তাশ্বের পদধ্বনি
আমাদের স্নায়ুতে স্নায়ুতে, চৈতন্যের কোষে কোষে ;
আমরা কেমন করে দূর থেকে ভিন্ন ভিন্ন গণি
কোন্ রবিরশ্মি কোন্ বাঁশি কোন্ তূর্যের নির্ঘোষে
কবে বা কখন কিসে করে দিলে রৌদ্রে রৌদ্রে ধনী !
আমাদের সূর্য-দেখা সূর্যালোকে প্রত্যূষে প্রদোষে ॥

## দশমিক

কর্মে আর ব্যক্তির প্রত্যহে,
সাধ-সিদ্ধি এপারে ওইপারে
বিচ্ছেদের দুস্তর বন্যায়
কান্না ফুলে ওঠে অহরহ,
হৃদয়ে জীবনে সংসারে
মিল চায় শুদ্ধ যন্ত্রণায়,
অন্তহীন দশমিক বাধা
অন্তরের বৃন্তে বাদ হানে।

ধ্যান কেন কখনোই কায়া
প্রত্যক্ষে পাবে না মনোমতো ?
আপতিক কেন এ অন্যায়,
কেন কাব্যে নেই সুরসাধা,
রঙ নেই খোদাই পাষাণে,
ছবি কেন নয় স্পর্শাগত ?
জীবনে মননে মাঝে বাঁধা
সর্বদাই অধরার ছায়া।

মন তাই অসাধ্যের গানে
অনন্যে বা কোনো অনন্যায়
কালোত্তর মুহূর্তের মায়া
খোঁজে নিত্য কালিন্দী বিষাদে
মহামান্যে অথবা কন্যায়
মানুষের মহাহৃদয়ের
মেটে না মেটে না অশনায়া,
তৃষ্ণা শুধু তিক্ত পারাবারে।

কেউ তাই মাথা নত করি
ক্ষণিকার শ্লিষ্ট শোচনায়,
কেউবা মাথুরে মাথা খুঁড়ি,
কেউ মাতি সক্রিয় সংবাদে
নিত্যপরাজিত বিজয়ের
অক্ষত সত্তার রচনায়,

যেখানে দ্বৈত সদা হারে
অদ্বৈত ভগ্নাংশে কোল নেয় ॥

৭ জুলাই, ১৯৫৫

## শিশুর নিশ্চিতি চাই

শিশুর কর্মিষ্ঠ খেলা, মুক্তি তার খেলে,
সে খেলে আপনমনে নিবিষ্ট মননে
খেলাঘরে, গড়ে ভাঙে, বলে প্রাজ্ঞ স্বরে ·
খুকুমণি ভয় নেই, তবে রে রাক্ষস
অমনি হাসিস দেখি, আরে হল একী,
ভয় নেই খোকাবাবু, একঘায়ে কাবু
এই দেখ জুজুমানা । কল্পনার নানা
রূপে নানান খেয়ালে খেলে যায়, সে কি
বয়স জানান দেয় ? শিশু ভরপুর
নিশ্চিত শক্তিতে তার । সুস্থ আত্মবশ
আমরাও জানাব না কেন : খোকাবাবু,
খুকুমণি, ভয় নেই, যত জুজুমানা
জয় করে দেব ফেলে সব অবহেলে
রাক্ষস খোক্কস যত হেসে অকাতরে
তুড়ি দিয়ে ছুঁড়ে দেব, এই দেখ,চুর্ ।

শিশুর নিশ্চিতি চাই বয়স্ক মননে ॥

## তুমিই সমুদ্র

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ
খুঁজি না তোমার শেষ কোথা, কোথা তল,
তোমার রহস্য তাই করি না জরিপ,

আমার জীবনে শুধু তরঙ্গ উচ্ছল
সমুদ্রের নীল তুমি, আমার সম্বল
রৌদ্রের তরল হীরা, রাত্রে শত দীপ
উপল হৃদয়ে জ্বালি,তোমার উজ্জ্বল
ঊর্মিল মুহূর্তে দুলি ডিঙি, শাল্‌তি, ছিপ্‌ ।

তুমিই সমুদ্র জানি, আমি অন্তরীপ,
তোমাতে আমার সীমা, অনন্ত চঞ্চল
কোথাও ভাঁটার খাড়ি, জোয়াবে প্রবল
কোথাও বা চতুর্দিকে তুমি নীলজল ;
ক্ষণিক রহস্যভরে করে দাও দ্বীপ,
চেয়ে থাকি মৌন পীত সৈকত উদ্‌গ্রীব ॥

২৩ মে, ১৯৫৫

## জ্যৈষ্ঠ স্বপ্ন

হবুচন্দ্র রাজাকে তো সবাই জানেন,
রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তিনি খ্যাতনামা,
নহুষের জ্ঞাতি তিনি ত্রিশঙ্কুর মামা,
রোমের নীরো ও তাঁকে গুরুজি মানেন ।
সেই মরুভূতে মহামন্ত্রী গবুচন্দ্র
খেয়ে দেয়ে ঘুম দিয়ে ব্যস্ত অতিশয়
আত্মপর ভুলে যান, জমান বিষয় ।
সে রাজ্যেও শোনা গেল আষাঢ়ের মন্দ্র ।
মহা চটে গবু দেন মন্ত্রিত্বে ইস্তফা,
মুখ্যমন্ত্রী মূর্খমন্ত্রী উপ-কূপো আর
অপমন্ত্রী বহু হল, বিপদ অপার,
বৃষ্টি হলে নষ্ট হবে সমস্ত মুনফা ;
সবে করে হাঁক ডাক : চাই অনাবৃষ্টি ;
না হলে দেশের ভাগ্যে রবে না যে রিষ্টি !

## শিল্পের আবেগে

মনে হল প্রেরণার প্রদীপ্ত আবেগে
অমাবস্যা মধ্যরাতে একা জেগে জেগে
এবারে ভেঙেছি বুঝি মানুষের অসম্পূর্ণ সীমা,
আজ বুঝি পরিপূর্ণ গড়ে দেব তোমার প্রতিমা
এঁকে নেব পরম ভঙ্গিমা—
প্রত্নের প্রতীক মাত্র ভেঙে গেল সূর্যোদয়ে লেগে !

এ জীবনে তৃপ্তি শুধু তোমাতেই দীপ্তি শুধু তোমাতেই
অশান্তি ও সান্ত্বনা তোমার,
একমাত্র যে লাঞ্ছনা সওয়া যায় যে নিস্তব্ধে দুঃখভার বওয়া যায়
অন্ধকারে সে তোমারই শুকতারা উপহার ।

অসহ্য তাপের শীর্ষে বৃষ্টি দাও যে নটভৈরবে
তারই অন্তে দাও ইন্দ্রধনু,
ভাবি স্বর্গমর্ত্য বাঁধো এইবার মানববৈভবে,
রৌদ্রে সেই মুহূর্ত অতনু ।

বাহুতে মেলে না তাকে, চোখের মণিতে
থেকে থেকে পড়ে শুধু ছায়া,
ভাবি তাকে বাঁধি কোন্ শিল্পের গণিতে
অধরাকে দিই নিজ কায়া !

এ আলাপ ঢোলকে পেটে না,
কথা তার অনির্বচনীয়,
এই কথা বলি গানে গানে ।
মূর্তি তার কোনোই স্থানীয়
রঙে বেঁধে সাধ তো মেটে না,
রূপের উদ্বৃত্ত কাঁদে প্রাণে ।

সকল জনম ভরে কাঁদো কি ? কাঁদাও মোরে
হায় ওরে দরদিয়া !
একি ঘোর আনন্দ আমার জীবন মৃত্যুতে একাকার—
কে যে কার দরদিয়া !

মনে হল কোজাগরী শশী পাশে আজ আমার প্রেয়সী,
কানাড়ার মূর্ছনার সুখে মুখ খুঁজি প্রেয়সীর মুখে,
রামকেলির বিলম্বিত লয়ে বাহু বাঁধি বাহুর আশ্রয়ে—
মুহূর্তেই আকাশে প্রেয়সী চিরন্তন প্রস্তরিত শশী ॥

**এক ও অন্য**

একের আনন্দ আজ অন্যের আকাশ
যে আকাশ রাঙা আজ স্মৃতির সপ্তকে
যে আনন্দে ইন্দ্রধনু পেয়েছে বিস্তার।

দিনান্ত ঘনায়, আর তার প্রতিভাস
সিঁথির সিঁদুর, সোনা আর অলক্তকে
দিগন্ত সংহত করে। তন্ময় চিন্তার

এই তো নিয়ম, সত্য জমে ওঠে ধীরে
অনেক বৃষ্টিতে রৌদ্রে অনেক হাওয়ায়
অনেক দুঃখে ও সুখে স্তব্ধ উচ্চারণে।

তাই একে দেখে মুগ্ধ আগামী তিমিরে,
তমসার জ্যোতি অন্য চোখের চাওয়ায়,
এর সত্তা কাঁপে ওর চলার ধরনে।

তাই একে ভরে দেয় অন্যের আকাশ
অদ্বৈত আবেগে স্থির দৈনিক মরণে ॥

১০ অগস্ট, ১৯৫৭

## সনেট

যন্ত্রণার নাট্যে মাতে, গান করে পূরবী বিষাদ,
বাহিরে ভিতরে দেখে হতাশ্বাসে সব একাকার,
মনে ভাবে সারাদেশে স্তব্ধ ক্রৌঞ্চ, বিজেতা নিষাদ ;
অথচ হৃদয় নিত্য মৃত্যুহীন, নিরাশ প্রাকার
পার হয় প্রতিদিন, পরিখার কোনো হাহাকার
বাঁধতে পারে না তাকে, সেতুবন্ধ সে অপরাজেয়,
তার স্বপ্নে বাস্তবের নিরাকার সর্বদা সাকার,
ফল্গুস্রোত করে তোলে সমুদ্রের সংগীতে গাঙ্গেয় ;
তাই বর্তমানে তার শেষ নেই, হতাশায় হেয়
এ বাস্তব কোনো মতে মন তার করে না বরণ,
কারণ মানুষ শুধু উত্তরণে পায় তার শ্রেয়,
কারণ বাঁচাই মানে সুখে দুঃখে নিত্য উত্তরণ ;
স্বাভাবিক মুক্তি জেতা দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে ;
সম্প্রতির গ্লানি অতিক্রান্ত তত্ত্ব সেই কালোত্তরে ॥

## মালার্মে : প্রগতি

মালার্মে ! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর :
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, সুরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর-কষায় ;
তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দ যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্র তনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য : খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে,
পাস্টেরনাকের দেশে, উর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে
নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

## সনেট

নিঃসঙ্গতা ভাসে নির্নিমেষে,
নীল ঘুমে তার স্বয়ম্বর,
সমুদ্রের নিস্তব্ধ প্রহর
নিস্তরঙ্গ, নাকি এ আবেশে
অন্তরঙ্গে নিঃসঙ্গতা মেশে ?

মনে শুধু ঘনিষ্ঠ আখর,
জপ করে যায় মৌনস্বর
শূন্যের শীতল বুক ঘেঁষে,
সাধনা কি দ্বৈতের উদ্দেশে ?

অন্ধকারে ডুবেছে ফস্ফর,
অগোচর সজল শিখর।
রুদ্ধশ্বাস কে টানে আশ্লেষে
স্বেদঘন শিলার নিষ্পেষে ?

মৃত্যু খোঁজে প্রেমে রূপান্তর ॥

## পরবাসী

দুইদিকে বন, মাঝে ঝিকিমিকি পথ
এঁকে বেঁকে চলে প্রকৃতির তালে তালে।
রাতের আলোয় থেকে থেকে জ্বলে চোখ,
নেচে লাফ দেয় কচি কচি খরগোশ।

নিটোল টিলার পলাশের ঝোপে দেখেছি
হঠাৎ পুলকে বনময়ূরের কত্থক,
তাঁবুর ছায়ায় নদীর সোনালি সেতারে
মিলিয়েছি তার সুষমা।

চুপি চুপি আসে নদীর কিনারে, জল খায়।
শুনেছি সিন্ধুমুনির হরিণ আহ্বান।
চিতা চলে গেল লুব্ধ হিংস্র ছন্দে
বন্য প্রাণের কথাকলি বেগ জাগিয়ে।

কোথায় সে বন, বসতিও কই বসেনি,
শুধু প্রান্তর, শুকনো হাওয়ার হাহাকার।
জঙ্গল সাফ্, গ্রাম মরে গেছে, শহরের
পত্তন নেই, ময়ূর মরেছে পণ্যে।

কেন এই দেশে মানুষ মৌন অসহায়?
কেন নদী গাছ পাহাড় এমন গৌণ?
সারা দেশময় তাঁবু বয়ে কত ঘুরব?
পরবাসী কবে নিজ বাসভূমি গড়বে?

## পাতা ঝরে গান করে মনে আর বনে

বালিতে পাথরে লেগে হাজার বাঁকের
অনিবার্য জলস্রোত,
ঐ পাড়ে বকের ঝাঁকের প্রতিনিধি শুধু
একটি দম্পতি, রবীন্দ্রনাথের সেই
উপনিষদের প্রিয় পাখির মতন, তবে একাধারে খায় আর দেখে।

ডাইনে গ্রামের মাঠ, আম আর মহুয়া বাগান,
আর ঐ টিলার নিটোল লালছাদ গোলাবাড়ি।
বাঁয়ে বন, উঁচু নিচু টিলায় পাহাড়ে এঁকে বেঁকে
পাহাড়ে পাহাড়ে আর প্রান্তরে টিলায়
ঘন বন, তিতিরের খরগোশের হরিণের বন,
হয়তো বা হঠাৎ কোথাও শোনা যায়
দুরন্ত চিতার কিছু ক্ষিপ্র দাবিদাওয়া।

আর চলে পৌষমাঘের হিমহাওয়া, গাছে গাছে বীজকম্প্র
অবিরাম উত্তরের হাওয়া।

ঘন বন গান করে হাতছানির হাজার মুদ্রায়,
গান করে হাজার হাজার চেনা আর বুনো গাছে।
পাতা ঝরে, সবুজ হলদে লাল পাতা ঝরে,
পাতা ওড়ে এদিকে ওদিকে
খরগোশের মতো ছোটে, তিতিরের মতো ঘোরে কাছে কাছে
নয়নাভিরাম আমার এ চেনা বনে,
আমার চেনা এ মনে পাতা ঝরে, পাতা ওড়ে, গান করে
উত্তরের হাওয়া মনে, আঁকশিতে অঙ্কুরে মনে, আর বনে ॥

১২ এপ্রিল, ১৯৫৬

## সনেট

যেই দূরে যাও, ওঠে বিচ্ছেদের অতল অপার
বঙ্গোপসাগরে ঢেউ, যেন নিত্য মাঘী পূর্ণিমার ;
আমার মুহূর্ত ঘণ্টা দিন কিংবা রাতে বারবার
অতলান্ত উপমায় তোলে মৌন নীল হাহাকার ;
কিংবা যদি আসে কিছু অন্যমনা বিপ্রলব্ধ বাধা
কিংবা কোনো মনান্তরে অমাবস্যা কালিন্দীতে আধা
বিশ্বব্যাপী হতাশার ত্রিকালজ্ঞ মরা অন্ধকার,
তখনই প্রশান্ত বিশ্ব বালিতে উপলে পাড়-বাঁধা
ডুবে যায়, ভেঙে যায়, ডেকে আনে অন্তিম জোয়ার !

তারপরে সূর্যোদয়, পূর্বদেশে পাণ্ডুর রক্তিমা,
তারপরে শিথিল সকালে শুভ্র তোমার মহিমা,
তারপরে শান্ত স্থির আরোগ্যে বিস্তীর্ণ তটসীমা :
বিচ্ছেদে অভ্যস্ত আমি, বাংলায় কোথা মালাবার ?
প্রশ্ন শুধু কেন বারবার এই মূঢ় হিরোশিমা ?

## দেশে কালে

গড়েছি ঘর, তাইতো এই আকাশ,
চিরন্তনে পলক ফেলে মন ।
ঘৃণা প্রবল, তাইতো ভালোবেসে
তোমাতে পাই মুক্তি প্রতিদিন ।

একাকিত্ব করে অট্টহাস,
তাইতো দেশ, দেশের সাধারণ ;
দুনিয়াবাসী মানুষ মনে এসে
মুক্তি দেয়, ব্যক্তি পায় দিন ।

মতান্তরে কোথা মনান্তর ?
পৃথিবী দেয় ধৈর্য প্রাকৃতিক,
বিরাট কাল, পেয়েছি বিস্তার,
দেশে ও কালে মুক্তি প্রতিদিন ।

মায়ের কাছে দিনে অবান্তর
শিশু দুটির দুরন্ত প্রতীক ;
তিনি জানেন নেইকো নিস্তার ;
রাতের কোলে মিলবে প্রতিদিন ।

যতই চলি, বালি নদীর মতো
স্বচ্ছ জল অজেয়, অবিরত !
গর্ব তাই অমর স্নায়ুশিরায়
আমাদের এ আদ্য গম্ভীরায়
বিপরীতের বাহুতে ভয়হীন
আমরা গড়ি মুক্তি প্রতিদিন ॥

## নিসর্গসুন্দরী

হঠাৎ ভেঙেছে মাটি ; লুব্ধ বিপর্যয়ে
যেমন সংসার ভাঙে শুনেছি ধনীর ;
হঠাৎ সবুজে লাগে, ধানের কুল্‌থির
অড়রের কাঁঠালের শালের সবুজে
গেরির হাজার লাল, কঠিন রেখায়,
যেমন শুনেছি লাগে কোনো কোনো দেশে
কবিদের আধুনিক হৃদয়ে গেরুয়া ।

তবে বুঝি এই কবিশিল্পীর কলোনি
বসতি ছাড়িয়ে ভাঙা তেপান্তর জুড়ে
প্রত্যেক বর্ষায় নতুন ফাটল ধরে,
নতুন ভাঙনে গেরি হৃদয়ের মাটি
ভেসে যায়, ময়ূরাক্ষী-জয়ন্তী-অজয়
কিংবা কোনো লাল নদী বেয়ে বেয়ে পড়ে
গঙ্গায় এবং শেষে সমুদ্রের নীলে ।

শুনেছি এ হৃদয়ের লাল অপচয়
বন্ধ করা যায়, বেঁধে, শিকড়ে শিকড়ে,
গাছে গাছে, যাতে লাল-সবুজের ভিড়ে
প্রতিটি সত্তায় গড়ে সংহত আভাস,
বাড়িঘরে, টিলায়, দিঘিতে, ঘাসে ঘাসে
পাহাড়ে, বাগানে, খেতে, উদার আকাশে
সঙ্গী আর নিঃসঙ্গের অক্ষয় বিন্যাসে ।

ধসে-যাওয়া ঢল্‌ দেখি দিগন্তে তন্ময়
সকালে সন্ধ্যায়, ভাবি চেনা উপমায়,
ভালো লাগে পৃথিবীকে, মাটি ও পাথর—
ডুবুরি পাতালে কোথা মনের আকাশ ?

১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

## একটি কাফি

"বন, গাছপালা, পাথর-টিলা আমায় সেই আনন্দ দেয়, যার
জন্য আমার মন কাতর। গ্রামদেশে প্রতিটি গাছ্ সবাক,
যেন আমার বলে, পূর্ণ! নিরঞ্জন!" বেঠোফেন

আমারও মন চৈত্রে পলাতক,
পলাশে আর আমের ডালে ডালে
সবুজ মাঠে মাঝবয়সী লালে
দণ্ড দুই মুক্তি-সুখে জিরায় :
মাটির কাছে সব মানুষ খাতক।

বিভোল মনে অবাক চেয়ে থাকে
সারা দুপুর হেলাফেলার হীরায়,
উদাস মন হাওয়ার পাকে পাকে
ঘুঘুর ডাকে গ্রামের ফাঁকা ক্ষেতে
মিলিয়ে দেয় দুস্কৃতার পাতক,

বিকাল তাই সন্ধ্যা-রঙে মেতে
শেষ, যে শেষ সারাদিনের পরে
একটি গানে গহন স্বাক্ষরে।

জানো কি সেই গানের আমি চাতক?

১৯ জুন, ১৯৫৬

## আশাবরী

আজকে আমার মন একরোখা আকাশে পথিক,

হাওয়া আর জল দেখি. শূন্যে শূন্যে জল আর হাওয়া
এ ওকে করেছে ধাওয়া অবিশ্রাম, দিশ্বিদিক ভুলে,
উল্লাসে চেঁচায়, তোলে থেকে থেকে কে কার সংগৎ।

সারাদিন গেছে এই, অন্ধকারে সেই নিশিপাওয়া
রেষারেষি চলে নাচঘরে, নাকি গানের আসরে !
এ জেতে তেলানা যদি অন্যে মাতে তেহায়ের ঘোরে ।

আজকে শ্যামলী গৌণ কাল তার হবে বিলম্বৎ
কালকে মাটির পালা, সদ্যস্নাত শুচি জলস্থল
গৃহস্থ বধূর মতো, সম্বৃত যে করে চাওয়া-পাওয়া
আপন সত্তায় পূর্ণ শ্যামকান্তি শান্ত মুখ তুলে ;

সবুজ প্রশান্ত স্থির একটি সে আলাপে পাখিরা
মুগ্ধ হবে, পল্লবে ও ঘাসে ঘাসে দুলবে যে হীরা
সে হীরা তোমায় দেব কালকে হে পৃথিবী, কোমল
মৃদঙ্গ বাহুতে বাঁধা আশাবরী গেয়ে যাবে অজয়ের ঢল্ ॥

## স্বরের আড়ালে শ্রুতি

আমার বাহুতে ভর দিয়েও যে পাহাড়ে
যেতে পেয়েছিলে ভয়,
আজ শুনি সেই পাহাড়ের ঘনশিখরে
একলা বেঁধেছ বাসা !

মনে আছে সেই উপরশিলার ঝরনার গলা রুপা,
নিচ্‌বাঁকে বালি স্রোতস্বিনীর সোনা ?
আজ নাকি তুমি একলা চূড়ায় সোনারুপা ফেলে দিয়ে
গেঁথেছ শূন্যে একটি তপ্ত হীরা ?

কালো কষ্টিতে আলোর শাণিত নগ্নতায়
অচেনা বনের ছায়ায় মুখর দিনগুলি
কোন্ বিরাগের নৈঃসঙ্গ্যের অন্ধকারে
মেলাও, সে কোন্ তারায় পেয়েছ প্রহরী ?

তাহলে রইব স্বরের আড়ালে শ্রুতি,
সাতটি রঙের তলায় শাদা—না কালো ?
অনুপস্থিতি দিয়ে ঢেকে রেখে দেব
সেদিনের চেনা হরিণীর চোখ দুটি ?

বেশ তাই হোক, তুমি থাকো একা সূর্যে,
আমি অদৃশ্য বাষ্পেব নীলাকাশ ।
তোমার হাওয়ায় চিতার দীপ্ত গর্ব.
আমি বই বাকি পশুপাখিদের কান্না ॥

১৬ জানুআবি ,১৯৫৬

## সময়ের ঘরে

সাবধান তুমি সাবধান
তুমি ওদের কথাতে কখনও দিও না কান ।
ভেবো, তুমি মাতা, চোখে চোখে হাতে হাতে
তুমিই বাছার প্রাণ ।
জীবনের মেয়ে জীবনের তুমি মাতা
ধরিত্রী তুমি ধাত্রী. তোমারই ভাব
জীবনেব এই সংকট থেকে ত্রাণ ।

কখনও ওদিকে খুলে রেখো নাকো দ্বার,
তোমার ঘরেই রয়েছে বাছাব প্রাণ.
তোমাতেই আদিঅন্ত সারাৎসার ।
ও মাঠে যেয়ো না লোভের বিলাসী হাঁকে,
ভুলো না তোমার সেবিকার সম্মান ।
বেঁধে নেবে জেনো অভ্যাসে শত পাকে
ঘুমভাঙানির ঘুমপাড়ানির গান ।

ও হাটে যে আছে সে সবার ভালো চেনা,
সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে ওর দেনা।
সময়ের ঘরে মিথ্যা লোভের ডাকে
কী করবে বেচা-কেনা ?
সময়ের থলি ফুটো ওর হাত সকলের কাছে পাতা,
রোগীর পথ্য ও কোথায় পাবে বেনামদারির ফাঁকে ?
মানুষের ঘরে কিছু নেই ওর দান ॥

## অথচ তোমায় জানি

আমি তো ক্ষমাই চাই,
ক্ষমা নিজের গর্বের কাছে এবং তোমারও।

আরো অনেকের কাছে আমি চাই ক্ষমা,
তৃতীয়ার পঞ্চমীর দ্বাদশীর পূর্ণিমার কাছে
সারা শুক্লপক্ষ ধরে থেকে থেকে ছড়াই যে গ্লানি
অমাবস্যা এনে মাঝে মাঝে ছোটোর সমাজে ছোটো
ছোটো হার মেনে,

পাছে ছড়াই অনেকদিন আরো
আমার গর্বের কোজাগরে পাছে বারবার
রাহুর কলঙ্ক মাখি
ভয়ে বা দ্বিধায়, প্রত্যহের অমনোযোগে,
জীবিকার দায়ে কোনো কিছু সুবিধায়
কোনো কোণে প্রতিপত্তি খুঁজে,
অথবা শিথিল স্বপ্নে স্থূল সম্ভোগের লুব্ধতায়
শিল্পের শিখরে
ঈর্ষ্যায় বিদ্বেষে অজ্ঞতায় নির্বোধের মেদের ঠেলায়
পাছে কেউ কোনো ক্ষতি করে।

বারবার হয়েছে বিচ্যুতি।
অহংকার'মৌল'মানবিক স্বয়ম্ভূ যা কবিমনীষী যা
থেকে থেকে হার মেনেছে এখানে ওইখানে
অযোগ্যের কাছে, গৌণ যারা যারা অবান্তর
যারা ভাসে কাঠ খড় কুটা
প্রাচীন নালায় বাজারের আনাচে কানাচে

অথচ তোমায় জানি মনসিজা তুমি প্রিয়তমা,
আজীবন ঊষার আভাস দেখি
চোখ মেল আমার প্রত্যহে,
সন্ধ্যার ছটায় দেখি ধ্যানমৌন তুমি শুচিস্মিতা
আমার হৃদয়ে স্তব্ধ স্নায়ুর শিখরে
যেখানে আরক্ত শুধু একটি তারকা

ইতিহাসে দীর্ঘ নীলাকাশে
আপন অপরাজেয় গর্বে জ্বলে
উমার হৃদয়ে জ্বলে ত্রিনেত্র যেমন,
'সৃষ্টিতে নির্মাণে বাস্তবতন্ময় মানুষের শিল্পের প্রত্যহে
মহা এক তৃপ্তিঅতৃপ্তিতে, সংহতির স্বচ্ছ আততিতে
যেখানে তোমার মূর্তি আমার মনন
একাকার একালের প্রজ্ঞাপারমিতা ॥

## রাজধানী

এখানে মৃত্যুর রাজ্য, রাজপুত সাম্রাজ্যবাদের
চারণ স্বপ্নের মৃত্যু রেখে গেছে উত্তরাধিকার,
সেই স্বপ্নে অতীতের অশ্রু ঝরে এখনও যাদের
তারা খুশি প্রত্নে পেয়ে নিজেদের মনের বিকার।

এখানে ঘোরীরা'খুঁজেছিল লুব্ধ শক্তির শিকার
কত তুগ্‌লক মদমত্ত দাস খিলিজি লোদীরা'
কত কিছু গড়ে গড়ে ঢেকেছিল মৃত্যুর চিৎকার—
মৃত্যুঞ্জয় সাধে সব খেয়েছিল মৃত্যুর মদিরা।

তাবা আজ কেউ নেই, আছে কিছু পাঠান পাথর,
বলিষ্ঠ সংহত রূপে। মরে গেছে মোগল বিলাস,
পড়ে আছে মরিয়ার ক্ষমতার শৌখিন স্বাক্ষর,
মরে তারা বেঁচে গেছে রেখে শুধু কীর্তির পিয়াস।

বিলেতি ঢাউস্ মৃত্যু রেখে গেছে কবন্ধ বণিক,
দিল্লি আজও সে নির্বোধ শ্মশানের খুঁজে মরে দিক ॥

## এবারের বর্ষা

শুধু জল আর হাওয়া, ঝোড়ো হাওয়া বৃষ্টি সারা রাত,
বাড়ির দক্ষিণে বুড়ো বট মাতে খ্যাপা সাইক্লোনে,
গ্রহ উপগ্রহ সূর্য তারা করে সমুদ্র প্রপাত
আবিশ্ব সাইক্লোট্রনে ক্রন্দসীকে ভেঙেছে প্লাবনে।

সাবা রাত জল আর হাওয়া, খ্যাপা ভয়ংকর শোক,
আকাশের শোক বুঝি, মাথা কোটে অনন্ত আকাশ,
বাংলার আকাশ বুঝি শোকে মরে, কেন মরে লোক,
মরেছে, প্রত্যহ মরে, কোটি কোটি, মরবে আকাশ ?

বলুক ওরা যা বলে : সমস্যাই হল আজ বটে ;
এ যেন পূর্ণিমা চাঁদ হাতে, তবু অমাবস্যা রটে !
মাঙ্গলিক মুক্ত দেশ, তবু ভাঙে উদ্বাস্তু আকাশ !
পৌষমাস কজনার, তাই এই ব্যাপ্ত সর্বনাশ ?

দুয়ারে হুড়কো কাঁদে, জানলার ছিটকিনি পালায়,
কোথায় শার্শির পাল্লা ইতস্তত ছোটে আর্তনাদে,
দুর্মূল্য দুর্দিনে যেন বাড়িঘর ভেঙে ভেসে যায়
শান্ বাঁধা হাওড়ায় শেয়ালদায় কলোনিআবাদে।

শুধু হাওয়া আর জল, অন্ধকার ঘরে একা জাগি,
শক্তির জুয়ার পাপে সকলেই কমবেশি ভাগী ;
প্রকৃতির প্রতিবাদে আকাশের প্রতীকী নির্ঝরে
শুনি ঐ ঝুরি বট স্বপ্নভঙ্গে উপ্‌ড়িয়ে মরে ॥

## দুঃসময়

যে ছিল গলিতে সঙ্গে সেই দেখি ফের
চৌমাথার মোড়ে, চলি
বাঁয়ের গলিতে, আঁকাবাঁকা আলোয় ধোঁয়ায়
যত বাঁক ফিবি দেখি সেই শৃগালের
উদ্‌গ্রীব একাগ্র লোভ গোঁফের রোঁয়ায় ।

শেষ করি সে গলি হঠাৎ
ডাইনে রাস্তায় ঢুকি, চলি চওড়া আরামে,
খাল থেকে যেন বা গঙ্গায়,
যদিই সাক্ষাৎ দেখা হয় এস্‌পার ওস্‌পার
এইবাব হবে ভাবি ।

হয় না তা । আলোর তলায় কালো থামে
সে তখন থমকায় হয়তো বা দেশলাই ধরায়,
যেন শার্টে বোতাম পরায়,
চমকায় আমার ছায়ায় ।
জানি না কিসের দাবি তার আমার উপরে ।

দেখি চলেছে আবার ।
পশ্চিমে ফটক দিয়ে সোজা ঢুকে পড়ি,
সিনেমাবাড়িতে দেখি অনেক পোস্টার,
তারপরে ডাইনের চা-খানাব মাঝ দিযে
চলে যাই পাশের রাস্তায় ।

নাচার !
নাস্তায় সে বসেই না, আমারই মতন
তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নেই ।

যেই ধরি পুবের বাঁধানো পথ, সেও চলে
ছায়া যেন, কার ছায়া ?

রবারের জুতা পায়ে
ফাঁকা হাওয়া দূর থেকে গায়ে ঠেলে ঠেলে।
দূরে যেন ওড়ে দলে দলে
গোখরো বা কেউটে—বা, হতে পারে হেলে।

কান মেলে চোখ খুলে
ক্লান্তির কিনারে এসে আলগা দরজা ঠেলে
শেষে এই তোমার চোখের মুহূর্তের মাঝে
তোমার আঙুলে বাঁধি হাত।

সকালের ফুলে অন্ধকার হয়ে আসে স্বচ্ছন্দ তন্ময়!
চলুক ঘড়ির কাঁটা, পথে শানে যারা ঠায় করে পায়চারি,
ক্যালেণ্ডারে যারা কথা কয়,

জীবন তাদের যাবে ভুলে
সমস্ত গলির শেষে সমুদ্রের বিস্তৃত সৈকতে
কালের চিন্ময় নীলে ভেসে যাবে ধূর্ত দুঃসময়॥

## ঘুমাবে সেদিন

চোখে জ্বলে ভিড়ের আরতি,
আশা তার সার্বিক সুখের
সচ্ছলতা, সব মানুষের;
যাতে বাঁচে সব্বাই স্বাধীন,
দুঃখে সুখে শুধু আত্মবশ,
ভাষা নয় দাসের মুখের,
পরবশ বুকের তুষের
নিরুপায় আগুনে নিকষ—

তাই রাজনীতিতেই গতি।
মুক্তি চায় ব্যক্তিত্বে সবার,
ঊর্ধ্বশ্বাস তাই তার দিন,
স্বপ্নহীন তাই তার রাত,

অতৃপ্তিতে উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
খোঁজে শুধু সমগ্রের জয়,
মুষ্টিবদ্ধ শপথের হাত
সে রাখে না স্নিগ্ধমৃদু গালে
কিংবা কোনো বুকের আশ্রয়ে ।
সন্ন্যাসী সে অথচ সাধনা
ইহলোকে মর্ত্য আরাধনা,
স্তব তার জনতার তালে ।

নির্মাতা সে, শিল্পী সে, ভাস্কর,
জীবনের মূর্তি পরস্পর
মানুষে মানুষে হাতে হাতে
গ'ড়ে দেবে প্রেমের সংজ্ঞাতে ;
কর্মে তার শিল্পীর আকৃতি,
সর্বদাই অতৃপ্ত জিজ্ঞাসা ;
প্রেমিক সে, বহু আলিঙ্গনে
নৈর্ব্যক্তিক একাত্ম বিভূতি
খুঁজে মরে ব্যক্তির স্বাক্ষরে ।
যেইদিন তার ভালোবাসা
ঘর পাবে, ঘুমোবে সেদিন,
ঘর পাবে, প্রতি ঘরে ঘরে ॥

## গান

ওরকম আমারও ঘটেছে,
যখন গায়ক নিজে অথবা গায়িকা হয়ে ওঠে গান কথা সুর
আর শ্রোতা হয়ে যায় অথবা সে গানের বিষয়
আধেয় আধার একাকার শরীর ও অশরীরী প্রাণ ;
তখন মুহূর্তে ধুয়ে যায় অবাস্তব বর্তমান সমস্ত জঞ্জাল ।

একবার মনে আছে একটি টপ্‌পার মধ্যে
উদ্‌ভাসিত হয়েছিল আসমুদ্রহিমালয়
প্রাচীন বিশাল ভারতবর্ষের অন্তরের ঘনিষ্ঠ আকাশ
মালতী ঘোষাল তাঁর স্পষ্টস্বরে গাইলেন যখন এই
পরবাসে রবে কে এ পরবাসে—
আজীবন দীর্ঘ পরবাস।
সেদিন দেশের সত্তা রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘশ্বাসে
সুরের সত্যের নিঃসংশয় উদার অক্ষরে
চিরতরে মূর্তি পেল পেল থেকে থেকে একা ভিড়ে
আবৃত্তির বাণী।
রবীন্দ্রনাথের গান হয়ে গেল দেশ সারাদেশ
বিস্তৃত যন্ত্রণা নিজবাসভূমি  এই পরবাস দেশ।
সেই থেকে একা একা ভিড়ে অনুকূল হাওয়া ডাকে
আমাকেও, পরবাসী চলে এসো ঘরে।

গানের বাস্তবে মাঝে মাঝে এরকম ঘটে,
মনে পড়ে একবার কয়েকটি পড়া-শোনা কথা
দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত গলায় একাত্মীকরণে
কী দরদি ঢেউ তুলেছিল এক সভাঘরে সভ্যভব্য মনে,
গায়কের দুই চোখ অন্তরঙ্গ, সমগ্র চেতনা শুধু গানে,
কথার গলার বৃষ্টিতে বিদ্যুতে সুরে একাকার,
বাইশে বা অন্যকোনো দিনে হয়তো বা দোসরা শ্রাবণে
আকাশ যেমন মাতে অর্ধনারীশ্বর নৃত্যে, তেমনি ধরনে।
আর সমস্ত জীবন সমস্ত অতীত
চৈতন্যের দীর্ঘ তেপান্তর পেয়ে গেল জল, জ্বলদর্চিশিখা
বিশুদ্ধ স্মৃতির তীব্র প্রখর সম্বিৎ,
সব কিছু অবান্তর কথা চিন্তা ধুয়ে গেল,
আর চোখে জল এল নৈর্ব্যক্তিক দুর্নিবার—
কথা কও কথা কও অনাদি অতীত :
তুমি আর তুমি আর তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটেলিখা
ওই যে সুদূর নীহারিকা যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড় ওই যারা দিনরাত্রি
আলোহাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও ?
হায় ছবি তুমি শুধু ছবি ?
যা কিছু এখন নেই অতীতে বা ভাবীকালে সবই শুধু ছবি ?

এরকম আমাদের অনেকেরই ঘটে,
দুঃখের বিষয় ঘটনাটি প্রায়ই আমরা ফেলে দিই,
মারা যায় দিনের ট্রাফিকে,
দিশাহারা গোলমালে আমাদেব প্রত্যহই ধ্যান ভাঙে,
অথচ ধ্যানের নীল আকাশই তো চাই লালদিঘিতে এসপ্লানেডে,
মন চাই জ্ঞানে কাজে আপিসে বাজারে কলে মিলে
দপ্তরে চত্বরে উল্লাসে সংকটে গান চাই
প্রাণ চাই, গান চাই শেয়ালদার শেডে ॥

২২ অগস্ট, ১৯৫৭

## চিরঋণী

পৌঁছলুম ভোরের আকাশে,
তখনও জড়ানো রাত্রি গাছে ঘাসে মাটিতে পাথরে ।

নিস্তব্ধ বাতাসে বাজে নুড়ির স্বরদ আর জলের সেতার
নানান কলিতে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোমলে কড়িতে পাশ কেটে
আশাববী যোগিয়া টোড়িতে ।

ডাইনে ঝোপের ডাকে ঢুকে দেখি একটি ঝলক
শুধু দুটি চোখে জ্বলে, আসন্ন সন্ন্যাসে স্থির
ঘৃণায় ও ভয়ে নিষ্পলক সংবৃত চিতার দুটি চোখ ।

সাবাদিন জরিপের অরণ্যরোদন ।
বাংলোয় ঘনায় রাত্রি,
তামা দিয়ে লোহা দিয়ে গড়া অন্ধকার,
অথচ ভিতরে ছোটে সরীসৃপ হাজার সংশয় ।

চলে গেছে খিদ্‌মদ্‌গার তার দূর গ্রাম্য ঘরে ।
আমি একা বসে আছি পরিশ্রান্ত
ঘুমের নদীর যাত্রী কণ্টকিত অরণ্যের নানা নৈশস্বরে ।

আর থেকে থেকে মুহূর্তের অবশ অসাড় স্তব্ধতার অতল সাগরে
ডুবে যাই আর ভেসে উঠি, তাকাই দুয়ারে খিল কিনা।

যখন ঝিঁঝির বীণা মাঝরাতের মৈহারী রাগিণী
ধরে ধরে প্রায়,
অন্তরঙ্গ এক ডাকে গরাদের ফাঁকে দেখি
আশ্চর্য ঘনিষ্ঠ একটি হরিণ আর একটি হরিণী
কাচে নাক ঘষে আর মানবিক চোখ মেলে দেয়
উদ্বাস্তু নির্ভরে উপহারে।

জীবজগতের কাছে সেই থেকে আমি চিরঋণী ॥

## ভয় পাই মনের মুক্তিতে

হেসো না, কারণ ক্ষুরধার হাসির নখর
তোমারও গলায় পড়ে, কারণ তুমিও চাও,
আমরা সবাই চাই স্বস্তি বা বিশ্রাম
চিন্তার খাড়াই গহন পাহাড় থেকে নিরাপদ জনপদে
অভ্যাসের পাকা শানে, খিল-তোলা দ্বারে
প্রাসাদে কুটিরে, নিজের অন্যের মইদেওয়া ধানে ধানে।

মননের নিঃসঙ্গ যন্ত্রণা কেবা বলো চায়,
যখন মন্ত্রীরা সব মন্ত্রণার সোজা পথ বাৎলায়, তখন কেন-বা
নিজে নিজে পথ খুঁজে মরা ? পরিশ্রম
তাতে যে বিস্তর, তাছাড়া কোথায় কোন্ কোণে কোন্
নির্মম বিপদ উঁকি দেয়।

আমরা সবাই চাই সংক্ষেপিত সুখ,
কারণ দুঃখও তাতে সংক্ষেপিত হতে পারে।
গড্ডলিকাবাদে মেলে স্বচ্ছ সুখ, সোজা স্বস্তি, অভ্যস্ত আরাম।

তাইতো আমরা এত ভয় পাই ঝুঁকি নিতে মনের জঙ্গলে,
যেখানে চোখের দাবি কানের ঘ্রাণের
সারা শরীরের দাবি দঙ্গলে দঙ্গলে ভিড় করে পাহাড়ে প্রান্তরে,
দাবি তোলে দিনরাত্রি অমান্যের আন্দোলনে ।
অথচ সাত্ত্বিক সভ্য জনপদে সরল ব্যবস্থা বিধি,
তাছাড়া মন্দির আছে, মসজিদ, গির্জাও, নানাবিধ ধুম,
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক—-
আঙিনা বা পাড়ার মণ্ডপে নুড়ির নানান রূপ ।
তাই একদিকে থেকে থেকে রূপধারী ভেবে বসে
হয়তো বা সত্যই সে নুড়ি, বুঝি দেবতা বা দেবী, চায় পূজা ঝুড়ি ঝুড়ি ।
অন্যদিকে আস্তিকেরও মনে হয় লোকগুলো অথবা লোকটা
ঠাকুর মহাত্মা কর্তা নেতা বা নায়ক ছোটো বউ অবতীর্ণ দেবদেবী
নুড়ি নয়, প্রকৃত মানুষ, নড়ে চড়ে, দোষে গুণে জড়িত মানুষ,
নুড়ি ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়, হয়তো বা আরেক নুড়ির লোভে ;
হয়তো বা নাস্তিক আবেগে মাথা কোটে, বলে, হায় হায়
নুড়িবাদ খুবই মন্দ, নুড়ি বরবাদ ।

এতে হাসির কিছুই নেই, তোমরা সবাই, আমরাও
স্বস্তি চাই সস্তা সহজের জনপদে গির্জায় ঢিপিতে সভায় মিছিলে
আইকে মাইকে সোনায় রুপায় খুঁজি গুরু, প্রভু, সাঁই
পথে পথে গড়াগড়ি দিই আজ কারো নাক কেটে কাল কারো কান জুড়ি
এই যুক্তি এই সংযুক্তিতে ।
মননে জঙ্গলে উৎরাই খাড়াই ব্যক্তিস্বরূপের আপদে বিপদে
বুনো মহিষেব পাল শখ করে কেই বা চরাই ?

আমাদের সাহস অভ্যাসে, আমাদের অহংকার
নিতান্ত সে শৈশবের পরে, বড়ো কম, বড়ো অসহায় ।
আমাদের সত্তা শত অশ্বত্থ তলায় বুলির বাতাসে নিত্য ঝুরু ঝুরু ।
ভয় পাই খাড়াই চূড়ায় গহন জঙ্গলে তেপান্তরে,
ভয় পাই মনের মুক্তিতে ॥

## অবর্তমানের দিকে

সত্যই, জীবনে দুঃখ প্রচুর প্রবল,
দুঃখ ঘরে ঘরে।
অভাব ও আতিশয্য দুই উচ্ছৃঙ্খল
দস্যু নানা স্তরে।

অভাব ও আতিশয্য ব্যক্তিতে ও দেশে
হৃদয়ে শরীরে।
তবু ভাবি অনন্য এ জীবনের শেষে
অন্ধকার তীরে
—যেখানে নদী বা ঘাট গ্রাম বা শহর
কিছু নেই, খালি
শূন্য, শূন্য অহরহ নিস্তব্ধ প্রহর,
শুধু এক ফালি
অর্থহীন সময়ের অমোঘ নিয়মে
জীবনের ছেদ,—
আমি নেই, জীবনের দুঃখের সে সমে
নেই হর্ষ খেদ।

তাই ভাবি জীবনের দুঃখসুখ থাক—
যতদিন থাকি।
তারপরে যবে হব নিশ্চল নির্বাক
থেকে যাবে বাকি
সমস্ত দেশের আর বিশ্বের জীবন।
আরেক অভাবে
মানুষের দুঃখ সুখ পাবে উত্তরণ
আপন স্বভাবে।
কারণ জীবনে শুধু মৃত্যু বাদ সাধে
মানুষ তা জানে,
আর সব অবান্তর, অন্ধ লোভে বাঁধে
মানুষ অজ্ঞানে।

তাই শেষ দিনে—আসে আসুক যেদিন,
ফেলি দীর্ঘশ্বাস
অবর্তমানের দিকে, যখন মে-দিন
প্রত্যহ প্রকাশ ॥

## আমি বাংলার লোক

আমি বাংলার লোক, ছিন্ন ভিন্ন আমার জীবনে,
রৌদ্রময় সামুদ্রিক এই রক্তে, এই নদী এই মাঠ আমজাম বনে
ক্ষিপ্র স্বচ্ছ বর্ণাঢ্য ভাষায় নূতন নূতন হর্ষে বলিষ্ঠ বিস্তার ।

চোখে কানে ঘ্রাণে দেহে
মনে প্রাণে একান্তিক আমার স্নায়ুতে
এ রাঢ় দেশের রঙ তোমাব প্রতিমা হল
প্রায় শত রবিবর্ষে লক্ষ লক্ষ সত্তার আয়ুতে ।

সামুদ্রিক এই ছন্দ অস্বীকারে বিপ্রকর্ষে
রবিরশ্মি পুড়ে যাবে,
শুধু পাবে কৌটিল্যেবা
ধূর্ত অন্ধকারে ঘৃণ্য মৃত্যুর ধিক্কার ॥

## জ্বর

কমেছে জ্বরের তাপ, মাথায় শরীরে
গিটে গিটে, এখনও দেখছি, নামেনি অঘ্রান ;
স্নায়ুব আরোগ্যস্নান ঘুমের শিশিরে
কানে কানে শোনাযনি প্রসাদের প্রত্যূষেব গান

হয়তো, এ জ্বরের আবেগ থেকে যাবে চিন্তায়, স্নায়ুতে
জীবনের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে রোগের মোচনে
শেষ হবে হয়তো-বা ; হতে পারে, রেখে যাবে মনে
মৃদু এক সুরভি নম্রতা সবলের প্রশান্ত আয়ুতে।

মনে হয়, হয়তো-বা জ্বর আর জ্বরের জীবন
কোনো এক প্রচ্ছন্ন হিমের নিদাঘ-নির্ঝরে
গঙ্গায় যমুনা খোঁজে, সমতলে। তাই মন
স্তব্ধ আজ বিচ্ছিন্ন প্রয়াগে, নির্জীব, নির্জ্বর ॥

## মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার

জীবনে প্রচুর লাভ, বাঁচা, বন্ধু, প্রেম, কাজ, আশা ;
মৃত্যুও উদার লোক, দু হাতে দিয়েছে বহু স্মৃতি।
এদিকে অতীতে তাই লোভ, তবু সর্বদা পিপাসা
আজ থেকে কাল আর কালান্তরে। তাই তো সম্প্রীতি
আশৈশবে পেয়ে আসা, এ দেশের হৃদয়উত্তাপ
প্রাচীন মননে তীব্র বর্তমানে আর ভবিষ্যতে।

এ উত্তাপে মৃত্যু ভোলে হেমন্তের বিলাতি বিলাপ,
সমুদ্রহাওয়ায় ওড়ে শুধু স্মৃতিরেণু বনে মনের পর্বতে।

তুলেছি যে উপহার আমি নিজে, মৃত্যুর বঞ্চনা
বন্ধ করে বার বার মৃত্যুকেই করেছি উদ্ধার,
যখন মৃত্যুকে দিয়ে যাব সব-কিছু বসুধার,
তখন মৃত্যু বা আমি কেবা-কাকে কী দেব গঞ্জনা ?

## প্রেম আসে

প্রেম আসে অঘ্রানের সূর্যোদিয়ে, আসে
বনের স্তব্ধতা আর বহুবিধ ক্রৌঞ্চের উল্লাসে,
আকাশে বাতাসে তার থরোথরো রক্তিম স্পন্দন ।

প্রেম আসে মাধুর্যের যন্ত্রণায়, হাসে
প্রবাসীর প্রত্যাগত ঘরের বিস্ময়ে,
জীবনে মৃত্যুতে আসে প্রেম, মুক্তি প্রেমের বন্ধন,
দিবারাত্রি প্রেমেই কেবল মেলে শ্রেয ও শ্রেয়সী।

প্রেম আসে আনন্দের সূর্যোদয়ে, আসে
প্রহরে প্রহরে, আসে খরতর তেজে,
আশ্বিনে সূর্যাস্তে প্রেম সম্পূর্ণের মধুর বিষাদ,
আবার প্রেমেরই আলো অন্ধকার ভয়ে
দুরুদুরু দীপান্বিত বৈশাখীর শেজে ।

সূর্যের উদয়ে অস্তে প্রতিষ্ঠিত শাশ্বতী প্রেয়সী,
প্রেমেই সমগ্র তুমি, হেরে যায় কালের নিষাদ ॥

১৩ এপ্রিল, ১৯৫৬

## পরবাসী চলে এসো ঘরে

আপন লাগে কি এবারে গ্রামের গলি ?
হাওয়া অনুকূল, প্রবাসীও ফেরে ঘরে,
ফেরে নিজবাসে শান্তিতে ঘুমে হৃদয়,
অনঙ্গ ঘুমে সকল অঙ্গ ভরে ।
পরোক্ষে দেখি মাধুরী, চন্দ্রাবলী !

তবুও মাথুর দেশে কালে সন্তত,
জন্মপ্রবাসী কেন আমাদের হৃদয় ?
আমি অন্তিমে, অঙ্গনে অন্তত
তোমারই প্রসাদ বিলাও, চন্দ্রাবলী ।

দুহুঁ কোরে একি দোঁহে কাঁদা বিচ্ছেদে,
বিপুল পৃথিবী এবং একটি হৃদয় ।
সাধে ও সাধ্যে একে-দশে ভেদাভেদে
সারাটা দেশে কি মাথুর, চন্দ্রাবলী ?

দুজনেই আছি একটি আশায় বাঁধা,
এক সাধনায় গেঁথেছি অনেক হৃদয়,
সকলেই জানি প্রবাসে মেলে না রাধা ।
ঘুচুক বিরহ, মিলনে সাধ্য-সাধা,
তুমি আমি দোঁহে দেখব, চন্দ্রাবলী ॥

৩০ জুন, ১৯৫৭

## মন যেন নিভন্ত অঙ্গার

শেলির কথাই বলি, কবিদের মন
যেন নিভন্ত অঙ্গার, কবিতার শিখা জ্বলে
কমবেশি হাওয়ার দমকে ।
হাওয়ার দায়িত্ব জেনো তোমার আমার,
কোন্ দিকে হাওয়া দিই, শুকনো কি ভিজা,
ধীর বা অস্থির, এলোমেলো অথবা নির্দিষ্ট ।
কবিতা চক্‌মকি নয়, জ্বলে না চমকে,
কবিতা অঙ্গার, জ্বলে আমাদের মনের হাওয়ায়,
দেশের ও দেশের হাওয়ায় ।

আর যদি হাওয়া নাই থাকে, একেবারে বায়ুশূন্য
শ্বাসহীন রসাতলে ?

এসো তবে হাওয়া তুলি, শুচি স্থির মানবিক হাওয়া,
অঘ্রানে উত্তরে হাওয়া, বৈশাখে দক্ষিণা,
আষাঢ়ে পুবালি আর আশ্বিনে পশ্চিমা,

মেটাই যা কিছু আছে মানুষের এ জীবনে
প্রকৃতির, জীবনের মুখ্য চাওয়া-পাওয়া ।

কবিদের দাবি জেনো বড়ই কঠিন, অথচ সরল,
অত্যন্ত সহজ আর তাই তো কঠিন ।
তারা চায় মানসের স্বচ্ছ মুক্ত হাওয়া,
দেশে বা সমাজে সমব্যথা, সততা, বিনয়, প্রেম,
ব্যক্তিক ও মানবিক, জীবে প্রেম, প্রকৃতির প্রেম,
নির্লোভ শুচিতা, আত্মীয়তা--
তবে না বইবে হাওয়া, মনের অঙ্গার
জ্বলবে হীরাব মতো
অক্ষরে অক্ষরে মনে মনে উজ্জ্বল কবিতা ।
না হলে তো মুক্তি নেই তোমার আমার ।

এ বুঝি অদ্ভুত যুক্তি ? অথচ সহজ, অত্যন্ত সরল,
এতই সরল যে আজকে বাংলায় অদ্ভুত :
যেমন ধরো-না তুমি, ভাব বেশ আছ তুমি
হিম-হাওয়াভরা ফ্ল্যাটে কিংবা বিরাট প্রাসাদে
—কথার কথাটা বলি, তা না হলে এদেশে একালে
প্রাসাদ কোথায় ?

ধরো আছ বেশ সুখে, সচ্ছল, প্রবল,
ভাব তুমি জীবনের সেয়ানা শিকাবি,
ভাবাটাই স্বাভাবিক ;
ভাব আছ এদেশের পক্ষে বেশ,
লাখপতি বা রাজাব আরামে, নিদেন মন্ত্রীর ।
যখন ট্রাফিকে থামে গাড়ি কিংবা বাধ্য হয়ে ভিড়ে নাম
হাওড়ায় কিংবা শেয়ালদায় কিংবা কোনো নির্বাচনে,
তখন তো ভাব এই গৃহহীন দল
প্রতিবেশী এমনকি স্বদেশীয়, তবুও ভিখারি,
এরা সব দেশের আহুতি, নিতান্ত অঙ্গার—
ভুল ভাব,

হাওয়াব ঘূর্ণিতে সময়ের চোখে চোখে আঁধি লাগে,
ভুল দেখ,
কারণ তুমিও ঐ ভিখারিই, পয়সার ওপিঠ,
আঙুলে বাজিয়ে ফেল, কোন পিঠ পড়ে তা কি জান ?
যদিচ সেয়ানা হাত তবু ভিখারিই, অচেতন বা অর্ধচেতন,
কিংবা ভিখারিও নয় জীবনের দ্বাবে ।
মনুষ্যত্ব বড়োই কঠিন ব্রত . সূচীমুখে তাব
ক্ষুবধার পথ নেই, থলিপেট ঘাডউঁচু উটেরও যাবার ।

অবাস্তব কার্যকারণেব ঝডে এলোমেলো হাওয়ার ধুলায়
তুমি ভাব পথে নয় ঘবে আছ,
ভেবেছ অন্যেব শুধু উদ্বাস্তু শিবির ।
ভুল দেখ আঁধির আঁধারে ।
দমবন্ধ জমাট গভীর বুকচাপা অন্ধকারে কবে
নিভিয়েছ মনের অঙ্গাব, মানবিক সমস্ত আগুন,
সেই কথাটাই জানা নেই আর ।
এক সে হাওয়ায় আমরা সবাই জ্বলি, আমাদের মনে মনে,
খডকুটা, কেউ ঘুটে, কেউ বা অঙ্গার,--
অবশ্য সবার আর নেই মন, কবির অথবা অকবির ।
মন্বন্তব কারো মনে কাবো বা জীবনে মারে ।

হাওয়া চাই লক্ষ্যে স্থির ॥

৯।৯।১৯৫৭

## আমাদের মেয়েরা

ছোটোখাটো বীরত্বের প্রাত্যহিক নিষ্ঠার জীবন
সূর্যের জাগার সঙ্গে ভোরে ওঠা, দিনরাত্রি
নিয়মিত নম্রসুরে বাঁধা ।

বাসরের বাসি অঙ্গ মেজে সদ্যস্নাত চুলে গিঁট,
সংসারের কাজকর্ম সারা, চায়ের জোগান দেওয়া
কাঁদা নয় ধুঁয়ার ছলনে বাঁধা তিন-চার পদ,
তারপরে ছেলে-মেয়ে খাওয়ানো-পরানো,
অসুখ-বিসুখ, সেবা,পথ্য দেওয়া,
তারপরে বাকি কাজ শেষ করে
খাওয়া কিংবা উপবাস—ব্রত-পূজা-মানতের,
দু-চার মিনিট রৌদ্রে চুল মেলা,
সেলাই অথবা এলো খোঁপা বেঁধে ঘুম,
হয়তো বা ঘুম নয়, জীবনের নভেলের স্বপ্ন দেখা
ঘনপক্ষ্ম চোখ বুজে। তারপর আবার সংসার।
বৈকালী প্রস্তুতি ফের, বারান্দায় কিংবা ছাদে
বিনুনির দীর্ঘ ইতিহাস, একটু বা ঝুঁকে দেখা
কী-বা যায় ফেরি, কারণ সেকালে ছিল নানান ডাকের
হরেক মালের নানাদেশী ফেরিওলা, কলকাতায়
পাড়া ছিল, পাড়ায় পাড়ায় গন্ধ ছিল স্বাদ ছিল,
ছিল বিশিষ্ট চেহারা, ছিল প্রতিবেশী।
তারপরে কিছুটা বা ঘষামাজা, ওরই মধ্যে
যাই হোক শাড়ির বাহার।

তোমরা দেখনি বুঝি এইসব, তোমরা করেছ দেরি
চাকুরে সে মরস্বর্গে, বাংলার বুর্জোয়ার রেনেসান্সে,
মধ্যবিত্ত বাঙালির সুবর্ণযুগের মধুর জীবনে,
দিঘির মতো যা স্বচ্ছ, সীমা যার জানা।
এখন জীবনে বহু দূর স্রোত মেশে, তোলপাড়
নানা পাড়ে, বিষম ঝঞ্ঝাট, ভুলত্রুটি, জ্বালা ঢের,
উত্তেজনা, দুঃখও প্রচুর, আরেক গৌরব।
এখন তোমরা শুনি জঙ্গি, কেবল গৃহিণী নয়,
জীবিকার লড়ায়ে তোমরা রঙ্গিলারা
আমাদের পাশাপাশি, প্রতিবেশী, সহকর্মী
কিংবা বলো প্রতেযোগী, তোমাদের চলায় বলায়
জীবনের দাবিদাওয়া তাই তীব্রতর অন্তর্যামী হয়ে ওঠে,
তোমরা ভ্রূকুটি হান, তাই আজকে আওয়াজে
অবশ্যম্ভাবিতার বিদ্যুৎ ঘনায়। সুখ-ও অনেক,
মাধুর্যের অন্য সুরে অন্তরঙ্গ আপিসের ভিড়ে কিংবা ক্লান্ত রাত্রে

এমন কী মেয়েলি মিছিলে, শাড়ির বিন্যাসে,
তোমরা এনেছ আজ অমিত্রাক্ষরের
বিপদসঙ্কুল সমৃদ্ধির জের পয়ারের মিলে।

তোমাদের বৈচিত্র্য বহুধা। মুগ্ধ চোখে দেখি
দু-যুগের বাঙালি মেয়েকে। এপারে ওপারে গঙ্গা, বহু লাভ
কৃতজ্ঞ বৃদ্ধের ॥

১৫ জানুআরি, ১৯৫৭

## এবারের গরম

১

অনাবৃষ্টি অনিদ্রায় দিনরাত্রি কাটে, নিষ্পলক
শাদা চোখে চেয়ে থাকে আমাদের বিভক্ত আকাশ,
সৌভাগ্যবশত তবু ঘরে থাকি, বিজলি বাতাস
খাইদাই, কাজে যাই, চোখে পড়ে বহু পলাতক
বিহারি সংসার পাতা পথে শানে, করে বসবাস
বৃদ্ধবৃদ্ধা, দম্পতিও, সদ্যশিশু, যুবক, বালক,
মোতিহারি সীতামারি ছেড়ে আসে—কে প্রতিপালক?

এদিকে আকাশ শাদা শুকনো চোখে কাঁপে রুদ্ধশ্বাস,
আকাশের আশা নেই পুনর্বাসনের আর, জীবনের শখ
কে তার মেটাবে ভাবে, দেউলিয়া উদ্বাস্তু অভ্যাস
সারাটা দেশের মনে চোরাবিষ, ধূর্ত নাগপাশ
ছিঁড়ে কেবা আনে মুক্তি বৈশাখীতে একটি ঝলক?

হে সমুদ্র হিমালয়! অসহ্য এ শুকনো অবহেলা,
অশ্রু দাও বৃষ্টি দাও, বেয়ে যাব বেহুলার ভেলা॥

২

পানিতে পিয়াসি মীন, কবীরের পেয়েছিল হাসি,
আজ আর হাসি নয়, আজ রাগ, হে সন্ত কবীর,
পানি আজ কাদা, ধুলা, যত নদী দিঘিতেই ভাসি
শুধু পাঁক, স্বচ্ছ জল কোথা পাব? চৈতন্যে গভীর
কাদার প্রভাব লাগে। আজ শুধু কূপের প্রাসাদে
মণ্ডূকেরা পঞ্চমুখ। তাই মরি শতনদী দেশে
আমরা তৃষ্ণার্ত মীন পানিতে পিয়াসি ভেসে ভেসে।
কারো ছাতি ফাটে কারো পোয়া বারো বলেছে প্রবাদে

৩

রাত্রিদিন একাকার, ঘুম নেই জলের প্রলাপে,
অস্থিসার কলকাতায় শোখাতুর মরুভূমি,
জল কেন গণ্ডূষ গণ্ডূষ, মারোয়াড় গ্রাম যেন,
আকাশ বিবর্ণ, মনস্তাপে সূর্যোদয় রক্তহীন,
প্রত্যহ অভ্যাসে প্রতিদিন আকাশে তাকাই,
পথে গাছে সবসতা খুঁজে মরে মন
বৃথাই, বৃথাই নীল সমুদ্রের দাক্ষিণ্যে বাতাস।

আনন্দ বা যুগান্তর দিয়ে যায় সাইকেল পিওন।
চায়ের প্রভাতী স্নান তারপরে।
পশ্চিম বঙ্গের বসবাস
দুর্বিনীত বঙ্গবাসী কেন চায় জান?
নটা বাজে,
বাজারে যাই না আর, মাছ আলু পটলের চায
উঠে গেছে ভঙ্গ রঙ্গভরা বঙ্গদেশে।
খাওয়া পরা ব্যাপারটাই বাজে,
সংসার অনিত্য অতি মঙ্গলময়ের দেশে,
জীবনকে মৃত্যু কি জীয়ায়?
শীততাপনিয়ন্ত্রিত আইনে চালাবে নাকি জনতাসন্ন্যাস?
ভবঘুরে ডাকঘরে আমাদের সকলেরই গতি নাকি শুনি বেতিয়ায়!

৪

আকাশে নীল নেই, বিবর্ণতা
যেন বা জামশেদ বার্নপুর :
অথবা শ্বেতকণার প্রাচুর্যে
রক্ত যেন মরুভূ পাণ্ডুর ।

দুঃখে তো কান্না স্বাভাবিক,
দগ্ধ শাদা চোখে মেটে কি শোক
অশ্রু উবে যায় এ সূর্যে,
কেন এ প্রকৃতির অন্যথা ?

বেতিয়াপলাতক দেশের লোক,
সারাটা দেশ বুঝি বাস্তুহীন,
কবে যে বাংলার এ দুর্দিন
ক্ষান্তি মানবে ও নামবে জল ।

নামবে কবে জল, বজ্রগান
বৃষ্টি করতালে শুনবে দেশ,
মেলবে লাখে লাখে চিৎকমল,
মুক্তি স্নান সেরে পরবে বেশ
নতুন জীবনের, সারাটা দেশ
সাবিত্রীর প্রেমে সত্যবান ॥

## শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড়

ব্যক্তির বয়স বাড়ে দিনে দিনে বছরে বছরে,
পৃথিবীর আকাশের সময়ের পরিক্রমা দীর্ঘায়িত থেকে যায়,
এই জানা ছিল এতকাল । আজ দেখি আমারই মতন
আকাশ জরিষ্ণু শাদা, ভাবি এতকাল
আনন্দে আনন্দে মন বেঁচেছে কেমন

প্রচুর আনন্দে, আর বিচিত্র বহুধা
আনন্দে বেঁচেছে মন, প্রকৃতির মতো, দুঃখেসুখে
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো। আনন্দিত বছরে বছরে
গাছে ঘাসে খেতে মাঠে বাগানে প্রান্তরে বনে
পাহাড়ে সমুদ্রে আর নদীতে দিঘিতে
আকাশে আকাশে নিত্য প্রহরে প্রহরে,
শুদ্ধ প্রকৃতির মতো, আনন্দই দিয়েছে বসুধা,
মনে মনে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে, একা একা, নিস্তব্ধ মুখর,
কিংবা দুইচার প্রিয়জন অথবা প্রিয়ার
সাহচর্যে, গান বই ছবির আনন্দে উপলব্ধ।
অথচ জীবনে আজও মেলে না আনন্দ,
ইংরেজি অথবা দেশী জীবনে যে একা নই,
সে কথা কি একদণ্ড ভোলা যায়?
প্রায় সকলেই জীবিকার বাজারে বাজারে ক্রীতদাস,
চতুর্দিকে দাসত্বের গ্লানি আজও চতুর্দিকে দ্বার বন্ধ,
যদিও মর্যাদা আজ দূরের আকাশে আসন্নসম্ভবা,
এখনও জীবনে ব্যাপ্ত দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য, অপমৃত্যু,
অসত্যের অন্যায়ের নানা বিভীষিকা,
একদিকে অকর্মণ্য নানা খেলা, মৃত্যুময় অহমিকা।
অন্যদিকে অনাহার, অর্ধাহার।
জীবনের পৃথিবী কি এরা চায় হয়ে যাক ভিক্ষুক বিধবা,
আকাশ কি এরা চায় মরুভূমি—উন্মাদ লিঅর?
আমার বয়স হল, মৃত্যুর গোধূলি ছাড়া
জীবন ও মন আজ এ জীবনে মিলবে কি আর?

এখানে ঢেমনা ঢোঁড়া বৃথা ভাবে তারা বিষধর,
শ্রীযুক্ত শ্রীযুক্তাদের ডুগডুগি বাঁশির এ কী খেলা,
শৈশবে দেখেছি পথে খেলা করে ভালুক বানর,
এখনও শিশুরা দেখে মুগ্ধ চোখে দুদণ্ডের মেলা।
কিন্তু কার ভালো লাগে বর্ষে বর্ষে দপ্তরে দপ্তরে
অমুকের ভাগ্নে ছেলে তমুকের ভ্রাতুষ্পুত্রী ঢোঁড়া
দেশের দুর্ভাগ্য নিয়ে খেলে যাবে নির্বোধ স্বাক্ষরে,
মুরুব্বির জোরে, ভাবে—যেন শঙ্খচূড় চন্দ্রবোড়া;

না, আমার মনে হয়
আশা আছে,

ঘুরেছি অনেক গ্রামে কিছু বা শহরে,
বেঁচেছি অনেকদিন,
আশ্চর্য করেছে বার বার
কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ কেল্লা মাঠ খেত সমুদ্র পাহাড়
এদেশের মর্মভেদী অন্তরঙ্গতায়,
রক্তের স্পন্দনে অনেক নদীর ছন্দ
ভাঁটায় বন্যায় সমানে তুলেছে ঢেউ
চৈতন্যের রোমাঞ্চিত পাড়ে পাড়ে।
তাই তো বিশ্বাস আশা
মাঠের আকাশ যেন মর্মে মর্মে নীল,
মরিয়া গর্বের জোরে,
এদেশেও হবে জানি এদেশেই আমাদের রাত্রি হবে ভোর।
আজ বটে অবান্তর বিপরীত অশুভবুদ্ধির জয়-জয়,
আজ শুধু ভবঘুরে ডাকঘর মুদ্রার বিপ্লব-ব্যঙ্গ
মানুষের হাতে দেয়, অসহায় হাহাকারে
জনতার ট্রেনে আজ সিনেমার শীতল উৎসবে কঠিন ঠাট্টায়
মানুষের যাতায়াত পশুর ভিড়ের চেয়ে পরাধীন ;
এদিকে রাস্তায় লোক ঘর পাতে, বস্তিতেও ঠাঁই নেই,
অথচ জিরাফ ওঠে নয়াবাড়ি আকাশে তাকায় নির্বোধ তামাশা,
মনে হয় মানুষের আশা নেই,
এই দেশে ভাষা নেই সাধারণ মানুষের।

অথচ এ দেশে ইতিহাস দ্বৈতযুদ্ধ চিরকাল
শক্তি-শান্তি মালিকে-মানুষে
অবান্তর বাগ্মিতায় সেই সত্য বারে বারে
গৌণ মনে হয় আজ দিল্লিতে বা কলকাতায়।
অথচ সবাই জানে মূর্খেই ভাবতে পারে
এই মর্ত্য পৃথিবীতে শক্তিধর শুধু বুঝি কীর্তির মালিক,
কীর্তির ভাস্কর যারা কীর্তির মজুর যারা তারা নয়,
ভাবে মানুষ নগণ্য ভাবে মানুষ গড়েনি
সংঘাতে সংরাগে।
নির্বোধ নিষ্ঠুর, ভাবে মানুষের সত্য নেই
সবার উপরে ! আসমুদ্র হিমালয় এই দেশে বাংলায় মালাবারে।
আমরা দেখেছি দেশ দেখেছি মানুষ পারে
দেশের মানুষ দেশ আমাদের আমরাই দেশ,
বাসুকির শক্তি ধরি,

কুঁড়ে কোঠা মন্দির মসজিদ কেল্লা বাঁধ সাঁকো
মাঠখেত আমরাই, আমাদের রক্তে হাড়ে সমুদ্র পাহাড়

তুলে ধরো বাসুকির ঘাড় ॥

আমার স্মৃতির মর্মে আহত বধির প্রতিভার
অবাক মনের অগোচর
তবু শ্রুতিধর সমগ্র সত্তার দুর্নিবার আনন্দ সংগীত।

কলকাতায় নিশুতি ঘুমের মধ্যে ঘর-মুখোর টানে
রাত্রির মায়ায় শুদ্ধ প্রশস্ত উদার পথে
জীবনের সচ্ছল ময়দানে
নিস্তব্ধ বাড়ির ছায়া পাশে ফেলে,
মনে হল চলে গেছি অথবা এসেছি
ঘরমুখোর টানে সেইকালে,
যেখানে সমস্ত আণবিক অতীতের স্বপ্ন মিশে যায়,
সেই দেশে যে দেশে সন্তত এ দেশের পৃথিবীর
দীর্ঘ ইতিহাস,
আমাদের হৃদয়ের গ্রানিটে যে গান
ইতিহাস গড়েছে ভাস্কর সত্তায় সত্তায় মানবিক
সংলগ্ন অথচ অন্তহীন আমাদের ভবিষ্যতে।

তাই অসংগত ময়দানের ঘুম পাশে রেখে
মুমূর্ষু বাড়ির ভিড় পাশ কেটে বেঁকে
ঘরমুখোর বেগে চলি,
আর কানের গভীরে বাজে মনের অতলে
তূর্যে বাঁশরীতে আর নাকাড়ায়
বেহালার দীর্ঘ লয়ে ভিয়োলার অস্থির স্পন্দনে
চেলোর গম্ভীর ছন্দে সেদিনের সজল আলোয়
গ্রাৎসিযার লাবণ্যের সহিষ্ণু দূরতা।

সজল পথের ক্ষিপ্র আভার ইস্পাতে বেগের বন্ধনে
মুহূর্তেরা মূর্তি ধরে সংগীতের চিন্ময় ত্রিকালে,
স্থানের বিশেষ বিশ্বে,
আর, মনে হয় অর্থময়তার কঠিন প্রসাদে ঘরে ঘরে
ভরে দিলে অর্থহীন সাম্প্রতিক জীবনের গ্লানি ও মূঢ়তা,

মৃন্ময়ীর মধ্যরাত্রে, নিশিভোরে কর্মময় সকালে বিকালে,
কলকাতার এসফল্টেই আনন্দের রূপান্তরে
চৈতন্যের উন্মুখর অশ্রুর আভায়।

আমাদের পাহাড়ের শুকনো হাহাকার
রুক্ষ পৃথিবীর, অশ্রুহীন,
মাটিতে ফসলের নিয়ত চেষ্টার
সাধনা আমাদের রাত্রিদিন।
আমরা চাই জল বাষ্পময় বায়ু,
আমরা মানবিক অর্ধমানবিক
লড়ায়ে অস্থির, যদিবা ভুলি দিক
ক্ষণিক সেই ভুল, ঢেলেছি সারা আয়ু :
পাহাড়ের পাথরের মর্ম থেকে কবে
তুলব জীবনের স্বচ্ছ জল,
শুকনো হাওয়া কবে মেদুর বৈভবে
নামবে বেড়া ভেঙে হাজার ঢল।

ক্ষুরধার পথে যেতে যেতে
প্রত্যহের যাত্রার সংকেতে
কঠিন মননে উঠি মেতে
ভাবি তুমি আমার অতিথি।
ক্লান্ত তুমি পথের ধুলায়
তাই বুঝি করি হায় হায়,
অক্লান্তের লোভ যে ভোলায়!
আমার কাননে ছায়াবীথি
তুমি এসো, চিহ্ন দেবে এঁকে
গাছগুলি তোমাকে প্রত্যেকে।
স্বচ্ছ জল তুলি বাপী থেকে
পট্টবাস খুলি ঝাঁপি থেকে
তিলকরেখায় কাটি সিঁথি।
এইবারে পুরেছে সাধনা
ধন্য হল দীর্ঘ আরাধনা,
কেন্দ্রীভূত সংহত যন্ত্রণা,
যুগান্তে কি এল জন্মতিথি ?

তোমাকে প্রত্যক্ষ কবে পাওয়া
আজীবন শুধু চেয়ে যাওয়া!

জাগো জাগো নিঃস্ব উপবাসী,
ভেঙে দাও অভাব শৃঙ্খল,
গর্জে ন্যায়বিদ্রোহের বাঁশী,
ছিন্ন হোক যুগব্যাপী ছল,
চূর্ণ করো জীর্ণ সংস্কার,
জাগো জাগো ওঠো জনগণ,
দূর করো সব অত্যাচার
জীবনমরণ করে পণ ।

রাতের অঙ্গারে দিনের হীরাতে
কঠিন আকাশের পাহাড়ে প্রদাহে
দগ্ধ বালুচরে স্তব্ধ প্রবাহে !
পারব শ্রাবণের মায়া কি ফেরাতে ?
অথচ পাণ্ডুর রুক্ষ আকাশের
তলায় চেয়ে থাকে হালকা বাতাসের
একটু ছোঁয়া লেগে ফুলের সাতনরি
গন্ধে রঙে ভরে হৃদয় মরি মরি !
আকাশে কেন চাও নিজের তুলনায়,
কেন যে গ্রীষ্মের অজেয় ফুল নও !

যে ব্যথায় আমি জর্জর
চোখে জল নেই সে ব্যথায়
সে ব্যথায় শুধু মহাভয়
হারাব আস্থা নির্ভর
যত কিছু আশা আশ্বাস ।

যতই পাকাক নাগপাশ
তবু তো এ নয় মরণের
গোপন ছোবল, শোক নেই
এ ব্যথায় নেই কাদাজল
হেলে ঢোঁড়া কেঁচো জোঁক নেই ।

এ জীবনে তোমার আমার
বেঁচে থাকাটাই আকস্মিক,
জঙ্গি পথে সবাই পথিক,
সকলেরই এক খোলা দ্বার ।

শুধু আজ ভেদ এক পথে :
নির্বুদ্ধিরা এদিকে নিড়বিড়,
অন্যদিকে একাকার ভিড়—
সমুদ্র যে মেলাবে পর্বতে ।

সূর্যে আজ আনত পাহাড়
এদিকে পাথর গড়ে হাড়—
অগস্ত্যের ফেরা হবে নাকো,
বিন্ধ্য ! যত আশা করে থাকো ।
অনিবার্য ক্রান্তিতে গম্ভীর
সমুদ্রের বেগে হিমালয়
উৎসারিত নবাগত বীর,
পরাবর্তে নেই পরাজয়,
ধৈর্যে সে যে শ্রমিকের মতো,
সহিষ্ণু সে প্রাণের গ্রানিটে
মাটির মজ্জায় তার ভিটে
একদিনে বর্ষ গড়ে শত ।

আজ হোক হিমশিলাপাত
বিন্ধ্য হোক বিন্দু বিন্দু ক্ষয়,
এ জীবন তোমার আমার
এ জীবনে জীবন অক্ষয় ।

মোহানার মুখে নয়, বিহারে বাংলায় বাঁধে নয়, সমগ্রের স্রোতে,
কিংবা স্রোতের অভাবে পাহাড়ের উৎস থেকে দীর্ঘ ব্যাপ্ত
আমাদের দুর্ভাগ্যের ভিত্তি জেনো গোটা ইতিহাসে,
সিপাহি বিদ্রোহে নয়, বিদ্রোহের ব্যর্থ প্রয়োজনে,
নবাবি সূর্যাস্তে আর সাহেবির কালো সূর্যোদয়ে
কলকাতায় জন্মগ্রস্ত আমাদের সন্ত্রাসে সংশয়ে,
বিদেশীর কবন্ধ শোষণে বিরাট দেশের
ছত্রভঙ্গ বিশৃঙ্খল যুগের মিশ্রণে এলোমেলো অদলবদলে,

ঐশ্বর্যে না, সাম্রাজ্যের কুম্ভীপাকে বহু ক্ষতিপূরণের
নানান সজ্জায় ; তাই ধনীদরিদ্রের যোগ
এ দেশে হল না, ছোটোখাটো বেনিয়ার বণিকের
অবশ্য উদ্ভব হল ; দারিদ্র্যের বিস্তারও হল
ব্যাপক গভীর ; তাই গান্ধীজিব রামরাজত্বের
স্বপ্ন থেকে গেল মরীচিকা, ধনিকেব দায়ে
দবিদ্রের হল না কিছুই রূপান্তর. সংখ্যা বা বিন্যাসে ;
অনাবাদী ভূমি-দান হয়ে গেল গোরু মেরে জুতা-দান প্রায় !
দরিদ্রের অছিবাদ ভারতের অর্থের অনর্থে
জন্ম থেকে অসম্ভব, সাম্রাজ্যেব আস্তাকুঁড়ে নিজ বাসভূমে পরবাসে
সে কোন্ কুকুর হবে অন্যদেব অছি, হবে যন্ত্রেব মালিক ?
তাই একদিকে অনাবৃষ্টি এবং মড়ক,
অন্যদিকে বন্যা আব মারী আমাদের নিত্য সঙ্গী,
এদিকে অভাব আর অন্যদিকে অপচয়
কখনও বা লোভের স্বেচ্ছায়, কখনও বা অকর্মার অনিচ্ছায়—
এই আমাদের ছবি, বুর্জোয়া বিকাশে
লাভে আর লাভের দাযিত্বে আমাদেব দেশ
ল'ড়ে গ'ড়ে চলেনি অনেকদিন, কয়েক শতক ।
আজ তাই সকলেব পাহাড় খোঁজাব পালা
সময়ের চূড়ায চড়ার, সাধারণো সমুদ্রে ডোবাব, অরণ্য গড়ার,
সংগীত যেমন গড়ে স্বর পরস্পর, সেইভাবে
সমগ্রের সমতলে. মোহানাব মুখে, যেমন গড়েছে
মালাবার উপকূলে শতমুখ নদী খাড়ি সমুদ্র পাহাড় ॥

# স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

সূচিপত্র

## স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত

তোমরা নবীন, এ উদাস
বিষাদ কি তোমাদেরও চেনা ?
স্মৃতি হানে আদি মহীদাস,
ভূমিদাস স্মৃতির যন্ত্রণা
আমাদের চৈতন্যে আকাশ ।

তোমরা নবীন, আনাগোনা
কালান্তরে বাঁধে কি চেতনা ?
বিশ-বাইশের ইতিহাস
করেছে কি কালের গণনা
তোমাদের সদ্য সুখে মানা ?

তোমরা নবীন, জানাশোনা
তাই বুঝি হয়নি প্রবাস ?
নিজবাস একান্ত অজানা,
আজন্মপ্রবাসী, তাই নানা
স্বদেশীয় স্মৃতিই বিলাস ?

দুনিয়ার হাটে হাটে কেনা
আধোচেনা প্রবল উচ্ছ্বাস,
অনাত্মীয় নব্য প্রতিভাস—
তবু জেনো, আমরাই চেনা ।

হঠাৎ উঠেছে দেখ ষোলোতলা,
হয়তো পনেরো হতে পারে, কে জানে সতেরো,
আকাশকে মাটিকে তামাশা,
জিরাফ তুলেছে যেন গলা কিংবা এক টিরানোসরাস,
আশেপাশে জলহস্তী, কুমির, গোখুরা, হায়েনা, শেয়াল
পেতেছে দপ্তর গদি গোমস্তা ফরাশ খাসা,
বেখাপ্পা বেয়াড়া বিশ্রী,
কলকাতার কপালের গেরো ।

এইদিকে নকল গথিক ওইদিকে করিন্থি আয়ন ডোরীয়
কে'লসনের ইংরেজি খেয়াল ।
তবুও যাহোক কালের পলিতে আহাম্মক সাহেবি শখের গায়ে
পড়েছিল অভ্যাসের কিছুটা প্রসাদ,
বাঙালের হাইকোর্ট, গাঁওয়ারের জাদুঘর,
এমন-কী লাটনি-প্রাসাদ এসেছিল চোখে সয়ে,
এবং চোরাই সাম্রাজ্যের দেশজ রাস্তায়
অলিতে গলিতে আজগবি ঘিনজির বাহারে
জমেছিল নয়ন না হোক কিছু মনোহর
আলালের দুলালের হুতোমের বুড়ো বুড়ো শালিকের কাটাবায
পক্ষীবাবুদের কায়দায় কেতায় সচ্ছলতা অসচ্ছলতায় ।

সরু ফালি কলকাতার জোলো মাটি দিয়েছিল তবু কিছু রস, কিছু রেঁ
শচীশকে বিনয়কে, তবু গোরা আরো বহু স্বদেশী ছেলেরা
কলকাতাকে চিনেছিল, সুস্থ হতে চেয়েছিল সম্পূর্ণ স্ববশ ।

আজ শুধু একদিকে মুমূর্ষু বিকার
আর অন্যদিকে নাটুকে প্রলাপ নির্বোধ নিষ্ঠুর অমানুষিক অভদ্র ।
কে দেবে ধিক্কার কাকে আঠারো তলায়
সারাদেশে চতুর্দিকে যত অবান্তর
উন্মাদ বিলাসী খেলা ।
রৌদ্র হানো, বান দাও, হে সূর্য, হে চৈতন্যআকাশ
এই নিত্য অপঘাত দূর করো,
এর চেয়ে দগ্ধদিনে এনে দাও সালানপুরের যুগান্তের ভূশণ্ডী প্রান্তর ।

প্রাণ খুলে যে ঘৃণা করব এমন দেখি উপায় নেই,
প্রাণের পাড়ায় নেই তো তার ঠাঁই,
চোরাগলিতে ঘোরে যখন তখন বুঝি দেখি তাকেই,
ঘরে কিংবা সভায় সে নয় চাঁই ।
শহরবনে হঠাৎ যবে দেখি সে অমানুষিক চোখ
মানতে হবে চমকে উঠি ভয়ে,
তাই বলে যে ঘৃণা করব এমন আমার সাধ্যে নেই,
হার কোথায় বন্য পরাজয়ে ?
জন্তুই তো জন্তুটা সেই, যতই তার হোক না রোখ্,
মনের বিশ্বে কোথায় তার ঠাঁই ?

মৃত্যু তার নখরে বটে অর্থহীনতায় অসহ,
আকস্মিক, জয়ও তাই চাই ।
জয়ের ছবি তাই তো মনে, জয়ের গান তাই তো রটে,
ঘোচাতে চাই আকস্মিকের পাপ ।
তাই বলে কি করব ঘৃণা সমানে সমান বিনা ?
পায়ের পাশে ঘুরতে পারে সাপ,
আশেপাশে চৌকাঠে বা ঘরের কোণেও বিছা বা জোঁক,
প্রাণের লোকে নাই থাকুক বাসা,
এটাও ঠিক যে সাপ মাড়ালে ঘৃণায় শরীর রীরী করে,
পড়তে পারে জুতার চরম চাপ,
তাই বলে কি বিছাটাকেই বসতে দেব ঘৃণার আসন,
জোঁককে শেষে ডাকব সভাঘরে ?
ঘৃণার পাতা হাওয়ায় ঝরে, ঘৃণার মাটি প্রখর ভালোবাসা
সেই শিকড়ে জীবন বাঁধি, তাই—
মানুষ তো ছার, সিংহও নয়, মানব কাকে, শিরদাঁড়া নেই,
দেব না ওকে ঘৃণারও অভিশাপ ।

এ নবকে

মনে হয় আশা নেই জীবনের ভাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ সে কোনো গ্রামও নয়, শহরও তো নয়,
প্রান্তর পাহাড় নয়, নদী নয়, দুঃস্বপ্ন কেবল,
সেখানে মজুর নেই, চাষা নেই,
যেখানে রয়েছি আজ মনে হয় আশা নেই,
বাঁচবার আশা নেই, বাঁচাবার ভাষা নেই,
সেখানে মড়ক অবিরত
সেখানে কান্নার সুর একঘেয়ে নির্জলা আকালে
মরমে পশে না আর, সেখানে কান্নাই মৃত
কারণ কারোই কোনো আশা নেই
অথবা তা এত কম, যে কোনো নিরাশা নেই ।
চৈতন্যে মড়ক ।

এখানে অভাব মৃত্যু অনাহার অপঘাত সকালবিকাল
মাসে মাসে মারীর চড়ক,
এখানে অরণ্য নেই, হিংস্র পশু নেই, নেই আদিম মানুষ,
বানপ্রস্থবাসী উদাসী সন্ন্যাসী নেই,

এখানে সভ্যতা নেই, হৃদয়-শুকানো দিঘি,
বুদ্ধি মজা খাল, চোখ-কান সব বোধ চোরাইমালের চেয়ে বাসি,
এখানে হয়তো নেই আপামর কোনোই নরক ।
কেউ বা হিন্দির হন্যে, কেউ ইংরেজির হাঙর,
নানা অবান্তর, নানা শিকারি শিকার
অথচ সবটা গৌণ অচেতন বা অর্ধচেতন,
নরকেরও ব্যঙ্গচিত্র, মৃত্যুরও বিকার ।

নরকের দাহ দাও নরকের আত্মগ্লানি হে যম জীবন
অশ্রু দাও প্রাসাদে প্রাসাদে বসতিতে মজ্জায় মজ্জায় অবসাদে
যন্ত্রণার বাণী দাও মর্মে দাও সজল শিকড় ফুলে ফলে শাখায় পল্লবে
রূপান্তরে প্রাণ দাও অভ্যস্তের তিক্তের ক্ষুব্ধের
চৈতন্যের ক্ষুরধার ক্ষিপ্র প্রতিবাদে স্পষ্টবাক
জীবনমৃত্যুর এ গোধূলিই স্বচ্ছতা পাক
বৈশাখী রৌদ্রের আর কালবৈশাখীর আন্দোলিত রবে ।

রাজার মেয়ে আজ আপিসে খাটে
রাজার ছেলে খোঁজে কাজ,
ভালোই জানে তারা রাজ্যপাটে
কিছুই নয় তারা আজ ।
তবুও বয়সের ঊষার সংকটে
ছেলেটি ভাবে ধাপে বসে,
মেয়েটি সত্যিই রাজার মেয়ে বটে
রাজার ছেলে নয় তো সে ।
পার্কে বেঞ্চিতে অথবা পথে শানে
দুজনে বলে প্রায়ই কথা,
বহুরই ভাগ্যে যা বর্তমানে
তাদেরই বেলা অন্যথা ।
তাই তো মাঝে মাঝে রাজার ছেলে
মিছিল করে কলরবে ।
রাজার মেয়ে তাই হৃদয় দেয় মেলে
ধর্মঘটে গৌরবে ।
এরা যে ভালোবাসে, তাই তো ঘৃণাতে
আগুনে জ্বালে দেহমন ।
এদের অভাবের অগ্নিবীণাতে
জীবন পেল যৌবন ।

ক্লান্তিতে কিসের ভয় ?
ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ সেরে তুরপুন র‍্যাঁদার কিংবা তাঁতের
মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি ।
ধ্যান আর বাস্তবের খেয়াপারাপারে
সম্মিলিত এক দলে
আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, মহাশয় ।
তারপরে সূর্যের আত্মীয় যেন সূর্যের মতন ফেরা ঘরে ।
বাঁধের পথের বাঁয়ে, হাসপাতাল ডানপাশে ছাড়িয়ে,
মাসে মাসে ভিন্ন ভিন্ন ঝরা ফুল ঝরা পাতা আলতো মাড়িয়ে,
পাহাড়ের মুখোমুখি দিনের কিনারে,
পাখির সংগীতে পরিতৃপ্ত ক্লান্তিভরে যে যার সংসারে
কেউ গান কেউ অন্য আমোদপ্রমোদে,
বিজলি আলোয় পাঠে কিংবা শুধু স্নিগ্ধ অবসরে ।
হয়তো বা বারান্দায় বসে কিংবা শুয়ে, খাটে, তক্তাপোশে
চাঁদের বিকাশ দেখা দিকচক্রবাল থেকে আকাশের বুকে—
কেমন কাস্তের চাঁদ অমাবস্যা পূর্ণিমায় পঞ্চদশী প্রাকৃত কৌতুকে ।
ক্লান্তিতে কিসের ভয় ? মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,
ভবঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের ক্লান্তি বড়ো ক্লান্তিকর ;
জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমরা সবাই ওরে ভাই
চাই সেই ক্লান্ত অবসর ।

রবীন্দ্রনাথের গল্প সবাই জানেন :
সকলই প্রস্তুত, ম্যারাপবাঁধানো উঠান প্রাঙ্গণ,
ভিয়েনে আগুন জ্বলে, দেউড়িতে সানাই
বাতাস ভরপুর করে বিশ্বব্যাপ্ত শুদ্ধ সুরে সুরে,
ভাঁড়ারে বোঝাই ভোজ্য, নানা সাজ আয়োজনে
অন্দরের ঘর ভরা, যৌতুক বিস্তর,
আত্মীয় পড়শি সব মুখর অস্থির,
বহু শিশু খেলে ঘোরে, নিশ্চয় পাত্রীরও বুক দুরু দুরু
আবেগে আগ্রহে, বিবাহের সকলই প্রস্তুত ।
এমন-কী বরযাত্রী এসে গেছে, সভায় জমাট,
শাঁখ প্রায় বাজে বাজে, হুলুধ্বনি

এয়োদের পানরাঙা মুখে মুখে সমুদ্যত,
শুধু বর নেই—

রবীন্দ্রনাথের গল্প, আশ্চর্য রূপক দিয়ে এঁকেছেন কবি
আমাদের সকলের জীবনের ছবি,
মর্মভেদী ভীষণ অদ্ভুত—
বিবাহেব সকলই প্রস্তুত,
এমন-কী বরযাত্রী এসে গেছে, শুধু বর নেই—
কিংবা হয়তো বা ওরা বরযাত্রী নয়, সব বরযাত্রী নয়,
ওই ভিড়ে আছে চোর, জুয়াচোর, গণ্যমান্য অথবা নগণ্য,
ভিখারিও নানান রকম, কেউ বাবু, কেউবা সাহেব,
আত্মার দুয়ারে, মনের রাস্তায়
সমাজের আঁস্তাকুড়-সাফাই লরিতে সত্তার ভিখারি,
দুস্থ, তবে বস্তিবাসী নয়, গদিয়ান আড়তে দপ্তরে,
দেহে মনে প্রাণে দুস্থ, হয়তো বা অর্থে নয়, ক্ষমতায় নয়—
বরযাত্রী নানান রকম, শুধু বর নেই ।

বর খুঁজে ফেরে সত্তা আত্মপরিচয়
মাঠে গঞ্জে শহরে বন্দরে খোঁজে সে আপন সত্তা, শনাক্তিকরণ
দশের দর্শনে, সমাজের আতশি ফলনে
পায় না আপন সত্তা, যা শুধু ফুলের মতো
ফুটে ওঠে রৌদ্রজলে ছায়ায় মাটিতে
শিকড়ের শাখাব পাতার প্রাকৃতিক অর্কেস্ট্রায়,
সত্তা যার নিহিত মাটিতে রৌদ্রেজলে শিকড়ে শাখায়
এমন-কী ফুলদানিতে সাজানো হলেও ।
তাই আজ আমাদের সত্তা নেই, ঘরে সঙ্ঘে বৈঠকে বা চাখানায়,
ফুলদানির মননেও হাজার চেষ্টায় ।

এ উপমা বহুমুখ, স্তরে স্তরে প্রয়োগে সরল
ব্যক্তিতে, সমাজে, দেশে ।
দেশ, ভাবো, সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতা দেশ,
ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী
প্রজ্ঞায় সংহত স্মৃতির শিকড়ে ধন্য কালের বাগানে ।
অথচ বিচ্ছিন্ন ছারখার, হাজার দাগায় আহত বিকল
যেন বা দেহের সব আছে, শুধু স্নায়ু স্নায়ুকোষ,

অভুক্ত, অসুস্থ, কাটা, পঙ্গু শতশত স্নায়ু স্নায়ুকোষ,
তাই আমাদের মনে, বাস্তবজীবনে কবন্ধের ছড়াছড়ি,
বাংলায় হাজার রূপের হাজার রাক্ষস, বহু ছল ক্ষমতাব হরেক কৌশল।
তাই আত্মপরিচয় নেই, ব্যক্তি নেই সত্তা নেই,
লালনীলকমলের দেশে আজ বর নেই,
বিধবার দেশে অরক্ষণীয়ার সুন্দরীর বর নেই, সত্তা নেই,

যে সত্তার স্বপ্ন দেখে মানবসভ্যতা চিরকাল
আদিম গোষ্ঠীর যুগ থেকে সাম্রাজ্য অবধি।
এরই ব্যথা এনে দেয় মিথ্যা লোভ, ভুল আত্মঅভিমান,
অসামান্য ক্ষমতার পায়ে, যেমন সাম্রাজ্যমরিয়া জার্মানি
রিল্‌কের নিঃসঙ্গ যুগে করেছিল নাৎসিদের দুঃস্বপ্নের পায়ে,
সেই সব লোক যারা যন্ত্রণায় লিখেছিল দুর্জয় সুন্দর সিমফনি কোআর্টেট
যন্ত্রণাবধির কত বেঠোফেন্,
উন্মাদ বরণ করে নিয়েছিল কত না নীট্‌শে কত হোয়ল্‌ডেরলিন্
কত শত হ্বাখনারের আর্ত নাট্যনাদে

এরই লোভে সেকালের ইতিহাসে দেখা যায় বিলাতে গড়েছে
বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের কল্পতরু ছায়ার একতা।
কল্পতরু আজ শুকনো, তাই ইংলণ্ডের উত্তরে পশ্চিমে স্বায়ত্তশাসন চায়,
তাই অনেকেরই মনে হয় জনন মৈথুন মৃত্যু এই তিনে ইংলণ্ডেও শান্তি নেই,
ভাবে তারা হরিজন, উদ্বাস্তু বা নির্বাসিত, দায় নেই দায়িত্বও নেই।
অন্যপক্ষে, আজ তাই দেখা যায় সত্তার সমস্যা,
সংহতির সীমিত সত্যের, সাম্যের সখ্যের মধ্যদেশে
এদেশে ওদেশে, দেশের দশের মধ্যে ব্যক্তির মুকুলে।

আমরা সম্রাট নই, বিলাতের বনেদি দুর্গতি
স্বপ্নেও কপালে নেই, এমন কি ফরাসিস্ মান্দারিন-মন্য সুখ
নির্দিষ্ট যা মোটামুটি এক শয্যা থেকে অন্য শয্যার বিলাসে
আলজিরীয় অবসাদে অস্তিত্বের কাকবিষ্ঠা খোঁজা,
তাও নিতান্ত অসার এই পাপপুণ্যহীন দেশে
দগ্ধ দিনে বিষণ্ণ রাত্রিতে।

আমরা নরকে আছি, অথচ সে জ্ঞান নেই মনে,
তাই বিবাহসভায় প্রচ্ছন্ন নরকে আজ বর নেই,
অথচ রাজার মেয়ে এবং রাজার ছেলে নরকের দেউড়িতে
রাস্তায় প্রস্তুত আছে স্বাগতের প্রতীক্ষায়,
শুধু স্বভাবে প্রতিষ্ঠা চায় প্রতিবাদে
প্রাণ মন চায় বরাভয়, তারাই যে বরকনে ॥

## ভুবনডাঙায়

তোমার শরীরে পাই প্রকৃতির প্রতিটি উপমা
তোমার মনের মধ্যে মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস :
তবুও, অথবা বুঝি সে জন্যই তুমি নিরুপমা ;
অনন্যা, শোনাই নিত্য একঘেয়ে পূরবী বিভাস।

হয়তো বা শোন তুমি, কোনোদিন/হয়তো শোন না,
প্রতিদিন সূর্য রাঙে, প্রতিসন্ধ্যা সিঁদুরে রাঙায়,
হয়তো মাটিতে বাষ্পে শূন্যে ধুয়ে যায় তার সোনা,
তোমাতেই তবু রাত্রি ভোর করি ভুবনডাঙায় ॥

১৯৫৫

## বৃথা স্মৃতির পাহারা

বৃথা স্মৃতির পাহারা,
বৃথা দ্বার বাঁধি, যদি একবার জানলাটা খুলি
দিনরাত্রি পলাতক অন্ধকার কালের পাহাড়ে।

যৌবনের নিঃসঙ্গতা আজ বাজে বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে,
হৃদয়ের চেরাপুঞ্জি নব্যন্যায়ে বর্ধিষ্ণু সাহারা।

আমি যে একান্ত শূন্যে, কবে ছিলে স্বদেশে তা ভুলি।

তবু যদি আস, দেখি বাড়ে সেই বকুলের চারা ;
তোমারই বাগান করি, যদি আস, নিত্য ফুল তুলি।

অস্তে যায় সূর্য, আসে প্রতিদিন আকাশে গোধূলি,
বিবাহের রঙে রাঙা কপালে একটি লাল তারা ॥

১৩ আগস্ট ১৯৫৬

## সে কবে

সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
কৃতার্থ দোহার ।
পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে ;
স্মৃতি আছে তার ।

রৌদ্রে-জলে সেই স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
দুরন্ত লোহার ।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে
মরচের বাহার ॥

১৯৫৬

## আকাশে তাকাও

বৃথা আর ঘুরে ফিরে
বিপাশার শূন্য তীরে আকণ্ঠ কান্নায়
কী-বা লাভ ?
মুক্তি নেই শোকের অতীতে,
মাটিধোয়া পাড়ভাঙা স্মৃতির গতিতে ;
ক্ষোভ শুধু অপলাপ ; আর নয়,
পাশে নয়, আকাশে তাকাও ; স্নান করো .
ডুব দাও বজ্রে ও বিদ্যুতে,
আষাঢ়ের আমন-বৃষ্টিতে,
বীজকম্প্র শ্রাবণধারায়, কার্তিকের কুয়াশায় নবান্ন ভূষায়
মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে, জেলায় জেলায়, দেহমনে,
সারা দেশে, যেখানে হারায় বিপাশার অশ্রুজল
কপিল গঙ্গার আলোনা নয়নে,
মুমূর্ষুর রূপনারায়ণে,
প্রাথমিক সত্তার উষায় ॥

## কোণার্ক দেউলে

এখানে শূন্যের ভার যেন মহাক্ষয়ে
আসমুদ্র অন্ধকার আবিশ্ব হৃদয়ে
সত্তাকেই চেপে ধরে বর্ণহীন গ্লানি
বুঝি মানবিক বাণী বুক চেপে মরে ।

এখানে সকলই শূন্য অন্ধকাবে নেতি
আনন্দের আত্মদান প্রেম সখ্য প্রীতি
শিল্পের নির্মাণ কিংবা কর্মের আরতি
জীবনে যা কিছু পুণ্য বিশ্বস্ত বাস্তব
সব কিছু ক্ষতি ক্ষয়ে শূন্যগর্ভ নেতি ।

কোথায় আরতি স্তব ? একাকী বিভেতি !
সমস্ত নির্মাণ অন্তে স্তব্ধ নৃত্যগান !
জীবনেব শেয প্রান্তে বিপুল বৈভব
ভঙ্গুর, গলিত শব, প্রত্নের নির্বাণ ।

অথচ বাহিরে সূর্য মেঘ বজ্র জল,
পূর্ণিমা ও অমাবস্যা, বাতাসও চঞ্চল,
বাহিবে সহস্র মূর্তি প্রাণরঙ্গে সাজে
বাঁশি করতালে তূর্যে খোলে পাখোয়াজে ।
বাহিবে জীবন বাঁচে প্রস্তব সত্তায়
কর্মের স্ফূর্তিতে যাচে প্রাণের প্রত্যয় ।

ভিতরে কিছুই নেই, মৃত্যুও বিলীন ।
জীর্ণ দীর্ণ দেউলেব এ অসূর্যম্পশ্যা
বেদীর নিষ্প্রাণ গর্ভে স্তব্ধ মনপ্রাণ ।
জীবন বাহিরে বুঝি জন্ম মৃত্যু কর্মে
আনন্দে আঘাতে খুঁজি জীবন স্বধর্মে ।

মরিয়া জীবন তার প্রতিষ্ঠায় ধীরে
মিলাবে শূন্যের ভার কালকে বাহিরে ।
জানি কাল কেটে যাবে এ শূন্যেব খাদ
আবার চৈতন্য পাবে প্রত্যক্ষ প্রসাদ ।

আজ এই অন্ধকার মর্মে পরাক্রান্ত
শূন্যের এমন ভার শিল্পের ধিক্কার
প্রেম নয় মৃত্যু নয় শূন্যের উদ্‌ভ্রান্ত
দেশব্যাপী অন্ধকার কার প্রতিবাদ ?

## স্বহস্তে বাজাবে

জেনো, হয়ে গেছে বহু দেরি ।
ফেরার সময় বহুকাল
কেটে গেছে, সদাগরি ফেরি
ঘরে গেছে, এখন শৃগাল
ভাবে তারা নেকড়ের পাল ।
জেনো হল ফেরার সময়,
মাটিতে ফেরার এল কাল—
শিকড়ে শিকড় বেঁধে যাওয়া,
মজ্জায় মাটিতে তাল তাল
নিজের সত্তাকে প্রাণদান ।
কাদায় হৃদয় সঁপে ভাবো,
চৈতন্যের মাঠে চাও ধান,
লোভ ছাড়ো দূর করো ভয় ।
ভাবো তুমি গ্রাম, তুমি দেশ,
গ্রাম্য মহাদেশ, লক্ষ গ্রাম ।
মেনে নাও উদ্বাস্তু স্বদেশ,
বুভুক্ষু, বিবিক্ত, অক্ষয়
অমর সে কোটি মুখে কান
দাও, শোনো, বলো : ভালোবাসি ।
তুমি নও ইংরেজ ফরাসি,
পাশ্চাত্ত্যে পাবে না নামধাম ।
জেনো হয়ে গেছে বহু দেরি ,

মেলাও অশ্রুকে আজ মেঘে,
রৌদ্রে রৌদ্রে পুড়ে রাত জেগে
একাকার মাটিতে হাওয়ায়
দগ্ধ হয়ে বৃষ্টিজলে ভিজে
বীজের আবেগে কেঁপে নিজে
পৃথিবীর ছয় রাগ শোনো
মাটিতে জীবনে প্রতিদিনে।
তবে কোনো দিন শুভক্ষণে—
অবশ্য করেছ বহু দেরি,
বিশ্বকে মেলাতে পারো ঘরে
নবান্নের মতো আড়ম্বরে।
বৃথা ছোটো ছিন্নভিন্ন মনে
কালের পিছনে, ফেরো ঘরে,
বোল্ দেবে স্বয়ং ত্রিকাল,
স্বহস্তে বাজাবে তুমি ভেরী ॥

## ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে,
যেখানে বালির নীলাচল ভাঙে মহানীলিমায়
শরীরের প্রায় পাড়ে—
প্রায় বুঝি মানসের মুক্ত সীমানায়,
অথবা আকাশভেদী অথচ আকাশ নয়, চূড়ায় চূড়ায়,
শরীরের সাড় ঘেঁষে নিরুদ্দেশ পাড়ে পাড়ে ঘোরা,

ঘোরা কিংবা ওড়া, যেন চিল, বাজ,
গগনভেড় বা যেন সোনালি ঈগল,
শিকারের খোঁজে নয়, স্বভাবে তৃপ্তিতে ভাসা
দুই ডানা মেলে দেওয়া, যেন শুদ্ধ পিলু বা খাম্বাজ,
যেন জীবনের সমস্ত শিকল, যা কিছু বিকার
সব কিছু ফেলে দেওয়া, পূর্ণ সব আশা ও হতাশা,

মনের আকাশে মুক্ত, বলা যায় নিরুদ্দেশ,
রুজির চিন্তায় নয়, মুনাফার দায়ে নয়,
থীসিসের চাহিদায়, খ্যাতির আস্বায় নয়,
নিছক মনের মাঠে, শরীবের প্রায় পাড়ে,
যেখানে শান্তির বিষাদের খাদে সুর তোলে অক্লান্ত নিখাদে
ফ্যুগের বিস্তারে অর্গানের অনন্ত আওয়াজ,

ঘুম নয়, ঘুমের কিনারে মুক্তিব আবেশ,
স্মৃতিব স্তম্ভিত নীলাচলে যেখানে সচল স্বপ্নে
মননেব প্রবল হিল্লোলে,
যেন পবজের আলাপে গমকে তানে অনির্বচনীয
কথা ওঠে, ছোটে, ডোবে অতলের তালে তালে
তরল হিন্দোলে ফৈয়জের মৈনাকমন্থিত স্বরে
অগাধ ঊর্মিল,
তারপরে ঘুম, শান্তি, নীলে নীল,
তারপর শুধুই হবি ওঁ, সমুদ্রের তম্বুবায়
আকাশের রেশ ॥

## আমিও তো

আমিও তো, শুধু চোখে নয়, সাবা মনেপ্রাণে
মেঘের কাঙাল ।
দগ্ধ মাটি হাহাকারে আমাবও স্নায়ুতে আনে
মুমূর্ষু আকাল,
আমারও সম্বিতে ধরে কেউটের হাজার ফাটল,
সূর্যের অসূয়াঘাতে ভেঙেছে আমাবও আলবাল ।
দেখেছি মানুষ থাকে চেয়ে,
দেখি মাটি চেয়ে থাকে একদৃষ্টি পাংশুল আকাশে ।
কারণ জীবনে আজও মাটি আব সহস্রাক্ষ আকাশ প্রবল ।
আমিও চেয়েছি অহর্নিশ ধাবাজল ।

তাই আজ দূর্বাদলশ্যাম অভিরাম বৃষ্টি শুনি,
বৃষ্টি দেখি, ছাটে ছাটে গন্ধে গন্ধে ভরে নিই ঘ্রাণ,
মনে মনে আমিও সত্তার পোড়া খেত কই, বুনি
হয়ে যাই থরোথরো ফসলের শিষ।
আমারও স্নায়ুতে আজ মাটির আষাঢ়
পাকে পাকে হয়ে ওঠে বর্ষার উৎসব ,
হৃদয় ভাসায়, নামে ঢল,
মুক্তাবিন্দু গেঁথে গেঁথে লাবণ্যে চৈতন্য ভরি,
গলায় পরাই তাকে যার বাহু আমার গলায়।
শরীরের অন্ধকার হয়ে ওঠে মেঘময় গান,
তীব্র ছটা সূর্যোদয়-সূর্যাস্তের স্তব।
অঙ্কুরে অঙ্কুরে তাই আজ
আমারও কবিতা দোলে প্রসন্ন হাওয়ায়
আসন্ন আশ্বিনে আহা ধানের মঞ্জরী ॥
৭ ফেব্রুআরি, ১৯৫৮

## সূর্যাস্ত-বেলায়

গরমের পোড়া দিন, গিয়েও যায় না।
জারুলের ফুলে ফুলে শিশুদের খেলা
থামেই না, বলি আহা হোক না বায়না,
এখনও তো আমি আছি , ফুল আর ঢেলা–
এই তো খেলনা, আর সূর্যাস্তের আলো—
আর কিছু পাকা চুল আমার মাথায়।
খেলুক না, মা বাবারা নিজেদের ভালো
বাসুক না নির্ভাবনা, বাসার হাতায়
আমি আছি, চেয়ে আছি চোখ-মন মেলা ;
ওই দুটি শিশু দেখি, গাছের পাতায়
ফুলে ঘাসে একাকার ; সূর্যাস্ত-বেলায়
এই বুঝি মানুষের জীবন্ত আয়না ?
১৪ ফেব্রুআরি, ১৯৫৮

## অভিন্ন স্বস্তিতে

স্বর্ণচাঁপার কান্তি অঙ্গে অঙ্গে আভায়,
শিরীষের বহুমর্মরে সেই কথাটি জানাই,
কৃষ্ণচূড়ায় প্রাকৃতিক মনে প্রিয়াকে রাঙাই ।

পলাশ কি তার পাপড়ি ছড়াল নখের মূলে ?
প্রবালফুলের ছোঁয়াচ লেগেছে ওষ্ঠাধরে ।
আরো রঙ চাই ? গাজনে কী হবে শিমুলতলার আবির তুলে ?

আকাশনিমের তারাখচা পথে বৃষ্টি পড়ে,
চালতার ফুলে ফলের বাগান মদির করে,
কদম শিহরে রথের মেলার পথের ঝড়ে ।

শরতের ছুটি কাটাই ধানের গন্ধ মেখে,
সবুজে সুনীলে দৃষ্টি সারাই রাসের সুখে
গোলাপ কাঁটায় মাটির দুঃখ আঙুলে চেখে ।

*

সে আনন্দে স্বাদ নেই বিষাদে যা তীব্র তীক্ষ্ণ নয়,
আনন্দের খাদে তাই ঘনীভূত অভিন্ন স্বদেশ ।
শহুরে স্বস্তিতে সুখে মেশে গ্রাম্য শত বিঘ্নভয় ;
রাজধানী কবন্ধ কেন ? পঙ্গু দুস্থ সমস্ত প্রদেশ ।

অদ্ভুত জীবন দেখ, আমাদের কয়েক পুরুষ
খুঁজে মরি নিজবাসভূমি, আছি আপন দেশেই ।
নির্মম নির্বোধ মন, দাবি শুধু চাকুরে জৌলুস,
ভাবি দেশ আমাদেরই, কিছুমাত্র ভালো না বেসেই ।

গ্রাম আসে শহরের ভিড়ে, ভাবে অসহায় হাতে
হাত বেঁধে প্রাণ দেবে বুদ্ধিমন্ত ইংরেজি-নবিশ ।
গ্রাম কি বোঝে না আজও, মনে প্রাণে মেরে দিয়ে ভাতে
উধাও ইংরেজি ঘোড়া রেখে গেছে হাজার সহিস !

কবে শেষ হবে বলো গ্রামদেশে এই চড়িভাতি ?
প্রকৃতিকে ঘর দেবে সাম্রাজ্যের অসুস্থ বস্তিতে,
গাঁটছড়ায় বেঁধে দেবে নিজেদের স্বদেশ স্বজাতি,
আনন্দ মিলবে গ্রামশহরের অভিন্ন স্বস্তিতে।

* *

পায়ে মাটি নেই, বৃথাই মাথায় আকাশ ধরা !
খনি ধসে বাঁধ ভাঙে ঘর রেললাইন খসে—
অসীম ধৈর্যে সর্বংসহা এদেশে জনতা বসুন্ধরা।

লাঙলফলায় চেতনাকে করো উর্বর,
তবে তো ফলবে জ্ঞানবিজ্ঞানে মনের ফসল,
তবে তো গড়বে যন্ত্র হাতের দরদে সচল।

দেরি হল ? হোক। দেহ গমহার, মন দৃঢ়
পাতা ঝরে গেছে, চারটে মেটেল পাপড়ির
মধ্যে একটি প্রেমের হরিৎ সম্ভার।

পরবাসী মন বিলাও গঞ্জে গণ্ডগ্রামে
তবে প্রকৃতির প্রতিশোধ শেষ হবে জেনো ঠিক এই শতকেই
অভিন্নমন মরা শহরেই ছেয়ে যাবে আমকাঁঠালজামে।

২৫ ফেব্রুআরি,১৯৫৮

## এরা ও ওরা

এরা মুগ্ধ ফাল্গুনের মহুয়ার জ্যামিতিবাহারে ;
দুর্জয় বিন্যাসে ওঠে ডালে ডালে পত্রহীন ফুলে,
যেন কোনো শ্রমিক বা কৃষকের দেশজ প্রতীক,
একতিল মেদ নেই, শুধু পেশী, পোড়া ভেজা হাড়ে
কঠিন মাটির শক্তি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে ওঠে ফুলে।

তাই এরা মুগ্ধ, এরা বসন্তের মাঠের পথিক ।
আর ওরা কী উৎসাহে ফুলফল বীজ তোলে ঘরে,
সমস্ত কুড়ায়, যাবে কটা মাস মহুয়ার বরে ।

এমনি বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ায় দেখেছি এক ক্রিয়া
আমরা বিহ্বল চোখে শরতের নবাবি আকাশে
সূর্যাস্তে নির্বাক মুগ্ধ, আর ওরা উদ্বেগে অস্থির
নবান্ন সবুজে পাছে রক্তমেঘ স্বর্ণস্রোতে ভাসে ;
আমরা নন্দিত যাতে ওরা তাতে অন্ধ বা বধির ।

অথচ সবাই এক, উভয়েরই একটি প্রকৃতি,
শুধু আমাদের শিল্প মূল্যদানে গেছে মূল ভুলে—
মহুয়ানির্ভর আর মেঘজীবী এদেশের স্মৃতি,
শুধু ছিন্নগ্রন্থি আজ, ভেদ তাই দপ্তরে প্রান্তরে,
কৃষাণ-কৃষাণী ওরা, আর এরা ভব্য চাকুরিয়া ॥
২৬ফেব্রুআরি,১৯৫৮

## আদিম-অন্তিম'

তার পায়ে অশোক পলাশ,
আমি বই বিবর্ণ শিশির ।
তার চোখে হোলির নিশির,
আমি মাঘী ভোরের আকাশ ।

তার গায়ে আদিম গৌরব,
আমি বই অন্তিম তুষার,
তার হাসি অলকা-সম্ভার
আর আমি স্মৃতির রৌরব ।

আসবে কি পেরিয়ে আশ্বিন,
আমি যাব ফের কি ফাল্গুনে ?
কাল-কে জিতব কাল গুনে,
এক রাত্রি পাবে অন্য দিন ?

১২ মার্চ, ১৯৫৮

## সহযোগী

তুমি আর আমি সহযোগী এই কথাটা শহরে রটে ।
তুমি রূপকার রূপসী, তোমাতে প্রাণ পায় সুন্দর ;
আমিও রূপের কারিগর, আঁকি দেয়ালে কাপড়ে পটে,
তোমাতে আমাতে মান চায় সুন্দর ।

তোমার তারিফে হাতে পাই গতি কাজ শেষ হয় দ্রুত,
তোমাকে দেখতে খুশি লাগে বেশ নিছক দেখার খুশি ।
রূপসী গায়ের হাওয়ায় আমার মন চলে সম্ভূত ।
তোমার শতেক ভক্তজনকে কোন্ মুখে আমি দুষি !

অভিযোগ শুধু তোমারই জন্যে, আজন্ম পেলে মাল্য,
তোমার মায়ের রূপের সঙ্গে দৈর্ঘ্য দিয়েছে পিতা ;
শিশুর মাধুরী আদর পেয়েছ, সহজে ফুটেছে বাল্য ;
তাই অভিযোগ, আজও হতে চাও পথে-ঘাটে ঈপ্সিতা ।

তুমি আমি নাকি সহযোগী বলো, তোমার রূপের বৈভব
অপাত্রে কেন বিলাও হাজারে হাজারে ?
দেখ দিকি সহকর্মিণী, আমি রূপশিল্পীর গৌরব
কখনও কি বই চৌরঙ্গির বাজারে ?

১৩ মার্চ, ১৯৫৮

## পল রোবসন

মানুষের, যেন প্রকৃতিরই জয়-জয়
প্রাণের সূর্যে জয় করেছে সে বর্বর অপচয়,
দেশের দশের সমাজের যত বাধা যত ক্ষতিক্ষয় ।

মানুষেরই সে যে প্রকৃতির জয়গান,
শরীরে রৌদ্রে রঙিন কষ্টি-পাহাড়ের সম্মান.
কণ্ঠে যে তার মহাসমুদ্র মেঘে মেঘে একতান ।

প্রকৃতির জয়ে শুভ্র হৃদয়ে সে ধরেছে ইতিহাস,
রক্তের লালে সারা বিশ্বের পেয়েছে সে আশ্বাস,
অভয়ংকর গুণীকে বাঁধবে কোন্ ভীরু ক্রীতদাস ?

প্রাণের আলোয় বহুকর্মা সে দেশে দেশে তার ঘর,
তার নাট্যের রূপকে শিল্পী ভরেছে চিদম্বর,
তাব মুক্তিতে মুক্ত আকাশে মানব-কণ্ঠস্বর ॥

১ এপ্রিল, ১৯৫৮

## বন্য দোল

মনে হল যেন দাউ দাউ জ্বলে আগুন,
টিলায় টিলায় ছুটে গেল জোড়া বাঘ ;
প্রাচীন রক্তে কিংশুকে লাল ফাগুন,
প্রকৃতির সাধ । সুন্দরে এ কী মৃত্যুর অনুরাগ !

শালে ও সেগুনে সিসুতে ও গম্‌হারে
সরকারি বনে কার সাড় ভাঙে, কারা ভাঙে আড়মোড়া
তীব্র বিধুর রূপের এ সম্ভারে
নিঠুর দরদি গোখুরা চন্দ্রবোড়া !

তবু গাছে গাছে মৃদুল ফুলের গন্ধ,
ঝোপে ঝাড়ে চুপি সাড়ে ভরে যায় ঘ্রাণ,
হরেক পাখিতে চোখেকানে লাগে ধন্ধ,
হরিণের ডাকে স্পষ্ট পুলকে মৃত্যুর সম্মান।

এ যেন দেশের দশের প্রাকৃত তুলনা
স্মৃতির তাড়সে আশা-আনন্দ খিন্ন,
এ যেন দেশজ প্রেমেই দশ-কে ভাবতে হয়েছে ঘৃণ্য,—
সমাজেই বুঝি প্রকৃতির মৃত তুলনা ?

মনে হল রাতে পাহাড়ে পাহাড়ে নাচে আগুনের মালা,
কানে এল কত অগ্নিচক্ষু আরণ্য পদপাত,
এদিকে দূরের বসতিতে হল ফাল্গুনী মাতোয়ালা
নাগড়াবাঁশিতে ভাঙে গড়ে প্রেমে পূর্ণিমা সারারাত ॥

১৯৫৮

## যে কথা

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল মোলায়েম
রোদের নীলায় ছায়া ফেলেছিল শতমেঘ
মৃদু মুক্তার, জরদাফুলের কুঞ্জে
রাগ করেছিল অনেক নিকষ ভোমরা,
কথার অভাবে আমি গেলুম না সঙ্গে
যখন বাগানে দল বেঁধে গেলে তোমরা।

কখনও কখনও চোখে চোখ পেলে মনে হয়
সব চিরচেনা হল পলকের ভঙ্গে।

বেশ মনে আছে, তোমার চাউনি বরাভয়
তীক্ষ্ণ দুপুরে ছায়া মেলেছিল শতমেঘ,
খর মুহূর্তে আঙুল বিছালে মোলায়েম,
অথচ বাগানে যাইনি সবার সঙ্গে
অথচ তোমার খোঁপার আঁধার পুঞ্জে
খুঁজিনি ভোমরা, দাবিও করিনি কায়েম।

বেশ মনে আছে। তোমার মধ্যবয়সে
আজ বলা যায় দীর্ঘ চেনার রঙ্গে
যে কথা সেদিন বলতে পারিনি রভসে।
সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে
আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম ?

## প্রথম কদম ফুল

তোমাকে যে দেব জীবনের সন্ধ্যার
শ্রাবণ মাসের প্রথম কদম ফুল
আশা ছিল নাকো, তবুও রংবাহার,
তবু বৈকালি আকাশে ঘনাল ঘটা।
শুনি আজকাল আমাদের বাংলার
বর্ষাই নাকি উধাও ফারাক্কার
কিংবা অমনি সুদূর নামের আড়ে,
শুনি আজকাল ছিঁড়েছে শিবের জটা,
শুধু মাবী আর অনাহার অনাচার ;
কপিলগুহার ভীষণ অন্ধকার
আবার চেপেছে আমাদের এই রাঢ়ে
গঙ্গায় শুনি অনেক চোখের লোনা,
কত কোটি চোখ মনেও যায় না গোনা !
তাই নাকি আজ অনেকদিনের চেনা
বর্ষাই শুনি দিল্লিতে পলাতক !
শিবদুর্গার মিলনই নেই, তা ঘটা !

আজকাল আশা যে কোনো বিষয়ে কঠিন
আশা ছিল নাকো, কুণ্ঠিত সারাদিন।
তবু বৈকালি-আকাশে ঘনাল ঘটা,
বর্ষাই প্রায়, হোক কালবৈশাখী,
কিংবা শরৎ, আকাশে রংবাহার
বুঝিবা উমার কৈলাসছাড়া আঁখি।

নামল বর্ষা, কলকাতা পেল মুক্তি,
ছড়াল নদীতে মাঠে-ঘাটে প্রান্তরে,
একাকার হল নবজীবনের ঐক্যে,
গ্রাম শহরের মরুশাপ বুঝি চুকল,
দুর্গম গিরি দুস্তর মরু পার হয়ে প্রেমে সখ্যে
নটরাজ বুঝি নামল নীলিম শুক্ল
বাহুর ভঙ্গে গৌরীর বর-অঙ্গে।

সেই দৃশ্যের কিছু নেই সমতুল।
সেই নৃত্যের বিগলিত সুখসঙ্গে
সব বেলি জুঁই সজল হাওয়ায় ঝরে,—
মনে হয় বুঝি ধুয়ে গেল যত ভুল,
শুধু উঠানের কদম স্বতই শিহরে।
তোমাকেই দেব প্রথম কদম ফুল ॥

১২ জুলাই, ১৯৫৮

## জন্মদিন

আজকে তার প্রদীপ জ্বালা, কপালে মার হাতের ফোঁটা,
গলায় বেলফুলের মালা, নতুন আর কোঁচানো ধুতি পরনে
দিদিরা দেয় বই খেলনা চুমাও গোটা গোটা,
মাছের মুড়ো, পায়স খেয়ে জন্মদিনে জয় করে সে জীবন,
আজকে আর এই অভাগ্য বর্তমান থাকবে কার স্মরণে ?
মনে হয় সে দেশের বীর, কালের বীর-পুরুষ ছোট জীবনে
তার হাসিতে বৃদ্ধ মুখে নিছক সুখে হাসি,
শৈশবের জন্মদিনে নিছনি শুচি স্বপ্নে ফিরে আসি।

জানি চাল্‌শে জন্মদিনে শোকসভার হাওয়ার হিম বয়,
এমনই দিন এমনই দেশ দুনিয়া ব্যেপে এমনই হাল চাল,
চল্লিশের পঞ্চাশের জন্মদিনে নানা অভাব নানারকম ভয়,
সমাজ বেয়ে সংসারের গলির পাশে দাঁড়ায় আজকাল।

তাই তো চাই বুড়োর বহু-জমানো খুশি হার-না-মানা হাসি,
তাই মেলাই সেইদিনটি শৈশবের আশায় ঝক্‌মকে,
চাই যে নিজ বাসভূমিতে প্রবীণ পরবাসী
দেখব লাখো শিশুর হাসি, আপনমনে ব'কে
খেলবে তারা পড়বে তারা, কারণ আজ জীবনে আর মরণে
লড়াই নেই, প্রেমের মতো, প্রাকৃত শুভ প্রেমের মতো
তোমার মতো, আমার-ও মতো শুভ্রবেশ পরনে,
একাল আর সেকাল মেলে কালের বিষহরণে,
স্বপ্ন যবে জন্ম আর মরণে এক দ্বন্দ্বাতীত হাসি ॥

১৮ জুলাই, ১৯৫৮

## মুখ তো দেখিনি

মুখ তো দেখিনি, দেখেছি কেবল চলা,
দেখেছি পৃথিবী মমতায় স্মিত আদরে উন্মুখর,
শুনেছি কেবল পায়ের দশটি পাপড়ির মৃদু ভাষা ।

মুখ তো দেখিনি, দেখেছি মালতী লতা,
দোলে শরীরের আপন আবেগে ; সে যে প্রাণ-উচ্ছলা ।
আমার প্রাজ্ঞ পিয়াল তরুতে থরোথরো সে কী আশা !

প্রথম যখন মুখে তাকালুম,—সে দিন জাতিস্মর,
মুখ তো দেখিনি, দেখেছি আয়ত দৃষ্টি,
মহা অম্বরে তারার মতন, না সে আমাদের সূর্যই !

শুনেছি সৌরজগতের গান মর্ত্য আমার স্বপ্নে,
দুকান রেখেছি আপন হৃদয়ে, বেনেডিক্‌টুস তূর্য
ভরেছে আমার জীবনে আকাশ, প্রতিটি দিনের সৃষ্টি ।
দেখেছি সে মুখ, তাই তো আজকে সত্য আমার স্বপ্নে ॥

## দিবানিশা

তবে কি অশেষ থাকবে তোমার নিশা ?
কপিলগুহায় কৈলাস বুঝি চিরকাল চোখ বুজে
স্বরূপ হারাবে অসীমে অন্ধকার ?
মিটবে না আর আকণ্ঠ নীল তৃষা ?
অন্ধ তমসা ছুটবে, ছুটবে মরিয়া কৃষ্ণসার,
আলোর উৎস সিন্ধু মরবে খুঁজে
বিশ্বব্যাপ্ত মরুভূমি পার হবে বৃথা শতবার ?
মিলবে না অম্বার
দেশে, কোনো দেশে সুমনের দেখা আর ?

তোমার শরীরে রৌদ্রের হাতে আর
জ্বলবে না বুঝি হৈমবতীর সোনা,
মুখের আভায় আনবে না উষা-উষসীর অরুণিমা,
মাঘের হিমের হিরায় তোমার দুচোখ কি দেখব না ?
বৈশাখী খর বিদ্যুতে প্রাণব্যাপ্ত অন্ধকার
মহামুহূর্তে ভাঙবে না বুঝি, ওগো ভৈরবী ভীমা,
গড়বে না বুঝি দৃষ্টির নব সীমা ?
আমি চাই তুমি দিবায় মেশাও মহিষ-মলিন নিশা,
আশ্বিনে হাসো আবার স্বচ্ছ সুখে ;
আবার আষাঢ়ে ঘনাও মেদুর মায়া
তোমার কোমল সচ্ছল স্নাত মুখে
ভেসে যাক মন, চোখ উড়ে যাক মাঠে মাঠে পাক দিশা,
বিশ্রাম পাক হরষে সরস বনানীর গৌরবে
শাঙন গগনে দেয়া গরজনে আলোয় জড়াক ছায়া ।

তোমাকে সাজে না এ একা অন্ধকার,
শূন্যের ঘন নিশা
তোমাকে সাজে না তন্বী-শোভন শূন্য হতাশ্বাস ।
তোমাতে অতীত পরিণত মনোহর,
সদ্য সত্তা স্মৃতি আর আশানৈরাশে ভাস্বর ।

তোমাকেও কেন কুজ্ঝটি বাঁধে যান্ত্রিক অভ্যাসে,
তুমি ছাড়া পাবে ধূর্জটি কোথা ত্রিনয়ন মেলে তার
ঈশান-বক্ষে বিলীন আপন ঈশা ?

২৬ জুলাই, ১৯৫৮

## জ্যৈষ্ঠের স্বপ্ন

এ দিকে দোলে সোনালি সুখে আমনধান,
ও দিকে চলে অঘ্রানের নহবতের
দীর্ঘ লয়, পাহাড়ে ঢেউ পেরিয়ে যায়,
থমকে ভাবে বালির পাড়ে চক্রবাক ;

উদাসী মন দিগ্‌বলয় ধরতে চায়,
কারণ বুঝি সোনালি ধান নীল হাওয়ায়
আরামে দোলে, কারণ বুঝি স্বচ্ছ জল
চরের পাশে ধরেছে তার তরল গান ।

উত্তরের প্রবাসী হাঁস হাজার ঝাঁকে
আকাশে রেখা সরল ছবি, চীনের রেশ,
চলেছে রোজ দক্ষিণের বাংলা দেশ,
ওদিকে তোড়ি অঘ্রানের নহবতের ।

উদাসী মন বিধুর তবু অচঞ্চল,
অঘ্রানের সূর্য যেন অস্তে যায়,
কিংবা ওঠে, রং ছড়ায় জহরতের
এ দিকে ডাকে অঘ্রানের সোনালি ধান ॥

## ভাষা

ভয় নেই, মনে রেখো আশা,
মমতায় ব্যাপ্ত করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে তনু শালবন,
তিতিরের ডাক শোনো ঘুঘুর কূজন
হাঁসের ঝাপট আর ময়ূরের নাচ,
এখানেই খুঁজে পাবে ভাষা ।

এখনই কি ভয় ? রেখো আশা
প্রাত্যহিকে মগ্ন করো মন,
এখানে নদীর পাড়ে চলেছে বুনন,
খামারে খামারে ধান, বাগানে গুঞ্জন,
পরবের দিনে বাতে মাঠে ঘরে নাচ,
এখানেই ভিত গড়ে ভাষা ।

ভয় কেন, কবি ? আছে আশা,
সততায় স্থির করো মন,
স্থির লক্ষ্য চলেছে পিস্টন্
লেদের আবর্তে গড়ো নানা আয়োজন
ক্রেনের বাহুতে দেখো বিশ্বব্যাপী নাচ,
সে দেশজ নাচে গাঁথো ভাষা ।

রেখো না বিলাসী কোনো আশা,
নববাবু-ভাষা ছাড়ো মন,
অথবা মিলাও সে কূজন
সাঁওতালি-ধনুকের টানে টানে ঝনন্-রণনে
লাঙলের ফলায় ফলায় সুতীব্র স্বননে,
সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
গ্রামে ও শহরে, পাবে কবিতার ভাষা ॥

## পরিণতি

কিশোরের অসহায় কামনার গ্লানি,
সদ্যযুবকের স্বপ্ন বিনিদ্র অস্থির,
সকলই কৌতুকে হানি আমরা দুজনে ।
তোমার বেদীতে আজ উত্তাল হাসির
ঝড় তুলি প্রবীণের ঘনিষ্ঠ মিলনে ।

মধুযামিনীর স্মৃতি আজকে সেতার
আজই তা জমেছে জোড়ে ঘনিষ্ঠের খাদে,
আয়ুর ভাণ্ডার আজ খুলেছি দুজনে,
সুতীব্র নন্দনতত্ত্বে বয়স্ক বিষাদে
ঝড় তুলি প্রবীণের প্রবল ইমনে ।

এমন কি শৈশবের নির্মোহ মহিমা
মা-বাবার পরস্পর স্মৃতির কাহিনী
আজকেই পায় তার মধুময় সীমা,
আমাদের পরিণতি আমরাই দুজনে
মমতায় দুঃসাহসী ঘনিষ্ঠ মিলনে ॥

২৭ অগস্ট, ১৯৫৮

## এ-গলি আরেক গলি

এ-গলি আরেক গলি, এ-গ্রাম সে চেনা গ্রাম নয় ।
এদের জানি না ঠিক প্রত্যেকের কিবা নামধাম,
অথচ চেনাও বটে, প্রতিদিন জীবনযাত্রায়
চেনা যায় : আল ভাঙে আল গড়ে, জলের মাত্রায়
কম বেশি রাশ টানে, কুলথি অড়রে কিছু হয়,
বধূরা আনাজ তোলে, পুজোতেই জোটে ভালো দাম,
রাখালশিশুরা সারাদিন ঘোরে প্রান্তরে প্রান্তরে ।
মোটামুটি চেনা, ছুটি এখানে কাটাই প্রাণ ভ'রে—
কারণ সর্বত্র এক দেশ, এক যন্ত্রণা—আরাম ।

তাই এও চেনা লাগে, অথচ আত্মীয় ঠিক নয় ।
দিন যে কাটাব ভাবি টিলায় টিলায় সেই টিলা
এখানে মেলেনি আজও,তরঙ্গিত টিলার সন্ধানে
মন তাই মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ প্রাচীন বন্ধনে
মুক্তি চায়, খুঁজে ফেরে খরতোয়া ঘনিষ্ঠ উর্মিলা
সেই নদী, সেই হাট, সব শুধু বেচাকেনা হয়
যে চেনা হাটের ভিড়ে সব কিছু দর-দাম নয়,
নিসর্গে মানুষে সেই গ্রাম ঠিক এই গ্রাম নয় ;
এখানে সুন্দর নেই ঘনিষ্ঠের ব্যথিত নন্দনে ॥

২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

## বিম্ববতী নয়, তবু

বিম্ববতী নয়, তবু প্রথম উন্মেষ
প্রথম মমতা জাগে এরই তো মায়ায,
স্বচক্ষে নিজেকে দেখে দেয়ালে ছায়ায়
আয়নায় জলে দেখে সুবেশ বিবেশ ।
এই বুঝি মানবিক আদিম ক্ষমতা—
আপন শরীরী স্বপ্নে আত্মস্থ মমতা ?

তাই ভালোবেসেছিল দেহের মন্দির,
প্রকৃতি যেমন বাসে প্রাকৃত-সত্তাকে,
নিজেই অবাক হয় নিজেরই গম্ভীর
স্বরূপে স্বপ্নের ঘোরে, খুশি বা লজ্জায় ;
অথচ অভ্যাসনীতি মজ্জায় মজ্জায় ;
কোথায় বাঁধবে ভাবে হৃদয়বত্তাকে ।

আর আজ ? আজও সেই প্রথম মমতা
মরেনি নিশ্চয়, আর অধিকন্তু জানে
অন্যেরও লেগেছে ভালো, দ্বিতীয় আদরে

দেখায় ছোঁয়ায় দিনরাত্রি মনে প্রাণে
এ দেহ-মাহাত্ম্যে স্থিত, আজ একা ঘরে
সে আদি মমতা ধরে ত্রিগুণ ক্ষমতা ॥
২৭ অক্টোবর, ১৯৫৮

## পাখির ডাক

একটি পাখির ডাক । সেই মুহূর্তেই,
পাহাড়ে পাহাড়ে চড়ে চতুর অন্তরা ।
আলোতেও বেজে ওঠে তারই ধর্‌তাই,
সূর্যোদয়ে চলে সেই সুরের লহরা ।

জানি না কী পাখি । আঁকা তুষারের পটে
কালোর একটি বিন্দু, শুভ্র শিবালিকে
যেন বা তৃতীয় নেত্র, ধবল সংকটে
নিজে স্থির, অগ্নিবেগ হানে চতুর্দিকে ।

ধ্বনিতে আলোতে মহাসংগীতে সংগতে
হেসে ওঠে, দুলে ওঠে, বুঝি মাথা নাড়ে
নন্দাদেবী, নীল শিলা, কালো কালো ঢিপি
খুশির শিশির শত দেওদার ঝাড়ে ।

অনেক পড়েছি পৃথিবীর স্বরলিপি,
সজল হাওয়ার পাড়ে উজ্জ্বল ভঙ্গিতে
সূর্যে সূর্যে জাতিস্মর সিন্ধুতে গঙ্গাতে
সম্বাদী স্বরটি তার মুহূর্তেই লিখি ॥
১৩ নভেম্বর, ১৯৫৮

## বরিস্ পাস্তেরনাক-কে

প্রকৃতিতে মুগ্ধ হও, কারণ প্রকৃতি মনোলোভা,
ভোগ্যা শুধু, উপভোগ্যা, পরকীয়া ; ভিন্ন, বাহির, সুদূর ;
অসম্বন্ধ ; মানবিক সামাজিক নয় । তাই নিসর্গের শোভা
দেখো, শোনো, মুগ্ধ হও, যেমনটি হত ডন জুয়ানেরা
নারীর বিচ্ছিন্ন সঙ্গে, যেহেতু সে সাময়িক বিস্মৃতি মধুর ।

এমনকি প্রকৃতির নিয়মনিষেধ—তাও সহজেই ভোলা যায়,
দূর থেকে, সূর্যাস্তের মেঘে তাই বন্যার ক্রন্দন ভোলো
অসংলগ্ন মুহূর্ত-সম্ভোগে, অন্তরঙ্গ প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ নয় ।
অরণ্যের শ্যামলিমা কিংবা শুভ্র তুষার মহিমা
তার মনে কখনো কি প্রান্তরের বাস্তুহারা দাবদাহ জ্বালে ?
বাঘের আগুনে ক্ষিপ্র খুশি লাগে, আবার তাকাও অন্যদিকে
হরিণের নাচ দেখো, অথচ হরিণ বাঘের শিকার ।

মানুষ হরিণ নয়, বাঘও নয়, ভাবাটাই কবিত্বের চূড়ান্ত বিকার ।

কী করে মেলাবে বলো দায়িত্বহীনের ব্যক্তি সভ্যতার লুপ্ত দায়ভাগে
বলো কোন লোভী ভোগী স্বার্থের আড়ালে
মানুষ নিসর্গ হবে, ফলফুল গাছ মাটি নদী বন
সমুদ্র পাহাড় সবকিছু হয়ে যাবে নিঃসঙ্গ মানুষ ?

অথচ এ প্রেমের তাড়না বাস্তবিক, খাঁটি বটে ।
প্রেমিক কি চায় না প্রিয়ার স্বরূপে মেলাতে
নিজেরই স্বতন্ত্র সত্তা ? যদিও মিললে আর নারী ও পুরুষ
থাকবে না, লুপ্ত হবে প্রেমিক ও প্রিয়া । চিরন্তন প্রেমের সংকটে
পেশাদার প্রেমে প্রেমে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে প্রেম-ই স্বয়ং ।
অবশ্য প্রেমের ব্রতে প্রেমের খেলাতে
ভুলচুক স্বাভাবিক, বেসুরে বেতালে আকস্মিকে

নদীই বাঁকতে পারে, শুকাতেও । ভল্গার, গঙ্গার, ইয়াংত্সির,
টেম্সের, টেনেসিরও । কিন্তু তাই ব'লে কেউ
চাইবে না পরস্পর দুইপাড়, চাইবে না পরস্পরা পাড়ে পাড়ে ঢেউ ?

জন্মিলে মরিতে হবে অমর কে কোথা কবে—
সুতরাং এ জীবনই ত্যাজ্য বলো ধ'রে কবিত্বের ফেউ ?

মুক্তি বুঝি জন্মের বিপ্লবে নয়, মুক্তি শুধু শবাগারে অজন্মা উৎসবে ?

এ আত্মবঞ্চনা, বন্ধু ।
জাতিস্মর বার্ধক্যের সতী নয়, পার্বতীর আছে স্বয়ম্বর,
বৃথা খোঁজো শতচ্ছিন্ন সতীর প্রতীক. কিরাত শঙ্কর তাকে
প্রকৃতিতে ব্যপ্ত ক'রে, সমাজে যে দগ্ধ আজ আসরের বৈঠকের দক্ষ পঞ্চশর ।

ভাবতে অবাক লাগে, এত দেখে এত ঠেকে শিখে
কেন যে অনেকে আজও পশ্চিমার দু-তিন শতকে ভাবি
সভ্যতার আদি আর শেষ ! কবন্ধের লোভে দেহমনে আত্মপরে
একক-অনেকে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন করি শূন্যে স্বয়ম্ভর ।
এ নাটে কুমার কোথা ? এতে নেই অর্ধনারীশ্বর ।

এ নন্দনসর্বস্বতা অসম্বন্ধ অন্ধতাই, এতে নেই পূর্বাপর,
পৃথিবীর মানদণ্ড, এ দ্বৈতে অদ্বৈত নেই, এ একে আরেক নেই,
একচক্ষু গবাক্ষে তো মনের আকাশ নেই, বিকাশ বিলাসে রুগ্‌ণ,
বিলাস বিকারে । একলষেঁড়ের এ খোঁয়াড়ে কোথা কারো চাবি ?
আত্মহা এ তত্ত্বের ছলায় শিল্প শুধু পথে পথে খেউড়, প্রলাপ ।
প্রকৃতি-মানুষে আর মানুষে মানুষে ভেদ অবশ্যসম্ভাবী ।
কুৎসিতের স্থিতাবস্থা চেয়ে কান্না শিল্পে মহাপাপ ।
মনের যা অগোচর নেই ॥

২০ নভেম্বর, ১৯৫৮

## রাত্রি হয় দিন

দুটি সত্তা, ভিন্ন রাজ্য দিনের আলোয়,
সীমান্ত হারায় রাত্রে, ঘনিষ্ঠ আঁধারে
একটি শয্যার প্রান্তে দুটি অসীমের
তখন কুলান হয় ; গরম-হিমের
ভিন্ন বিবেচনা দেখা গেছে বারেবারে,

তবুও কী অসহায়, দময়ন্তী-নল
যেন বা এরাও, অঙ্গে বিগলিত চীর,
মনের হরিষে কিংবা বিষাদে অস্থির,
হঠাৎ যে ছোঁয়া লাগে এ-গায়ে ও-গায়ে
—যদিও প্রত্যেকে এক এবং স্বাধীন
মানবিক অরণ্যের নির্বিশেষে লীন,
বিশেষের দিব্যজ্ঞানে তখনই উজ্জ্বল
হয়ে ওঠে চৈতন্যের তিমির সত্তায়,
অক্ষিস্থ ধূসরে যেন শাদায়-কালোয় ;
বৈদ্যুতিক বৈপরীত্যে হৃদয়বত্তায়
সূত্র মেলে, যোগাযোগে রাত্রি হয় দিন ॥

২৭ জানুআরি, ১৯৫৯

## প্রাকৃত কবিতা

মাসি, তোর কথা বেঁধে রাখ তোর খোঁপায়,
আমার ও কালো কম্বলই ভালো,
যতবার ধোবে রংছুট নয়, পাকা ।

মাসি তুই বৃথা বকিস্, আমের ঝাঁকা
মাথায় তুলে নে ঘরে জামবাটি ভ'রে
আমচুর খাস, থাকুক আমার কালো ।

কষ্টিপাথরে যাচাই করেছি প্রেম,
আমার রাত্রের কারার আকাশে জ্বেলেছে একটি তারা,
আমাকেই বলে তার দুচোখের একটি সন্ধ্যাতারা ।

নির্ভয় বীর, বিরাট আঁধারে সে আমার অমাবস্যা
ছদ্মবেশের চাঁদ,
আমাকে কি তুই করবি কথার বিজলিতে দিশাহারা ?

কোনো আশা নেই, মাসি তুই ঘরে গিয়ে
হাটের লোককে শোনাস্ জ্ঞানের কথা,
সে কানে মানাবে এসব কথার ছাঁদ ।

ছড়াস্ নে তোর মুক্তার মালা, হবে না রে অন্যথা,
সে যবে আসবে শহরের কাজ সেরে
তাকেই করব বিয়ে ।

আসবে অনেকদিনের হারের মধ্যে লড়াই জিতে
অনেক মিছিলে সঞ্চিত সংগীতে,
আসবে আমার সহিষ্ণু সংবিতে ।

উঠানের গাছ কেটে কচি কলাপাতে
খেতের ধানের ভাতে
ঘরে সরতোলা ঘি দেব একছটাক,

দিঘির পাড়ের নালিতা শাকের ব্যঞ্জন,
খাসের বাঁধের মৌরলা মাছ, পাটলীর দুধে ক্ষীর
ওরে মাসি আমি দেব সুখে নিজ হাতে,

দেখব অবাক চোখে,
খাবেন পুণ্যজন ।

আমার কথায় এখন যে দেখি মাসি তুই অস্থির ॥

৩০ জানুআরি, ১৯৫৯

## ছায়াতপ

দরজায় দাঁড়ায় যবে
মনে হয় সূর্য একরাশ, পিছনে দুপাশে
হিম অন্ধকার ঘর জ্বলে ওঠে আলোর বৈভবে ।

বাগানে সে ঘোরে ফেরে
পল্লবে পল্লবে ঘন সবুজের পটে ঘাসের সবুজে
সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতা——

জড়াব না মামুলি কথার ফেরে,
উপমা প্রকাশ করে শুধুমাত্র প্রকাশের দীর্ঘ আকুলতা।

বাগানে, সে শেষ মাঘী হিমে
হীবক আভায় একা অন্যমনে করে পায়চারি,
এই রৌদ্র এই ছায়া স্পষ্ট ছবি আধুনিক সরলে বঙ্কিমে।

শান্ত স্নিগ্ধ ঘন ছায়া পল্লবে শাখায়,
হৃদযের ছায়ায় সে স্থির।
সূর্য ঘোরে, পৃথিবীর শান্তি নেই অণুর চাকায,
সে দাঁড়িয়ে, বৌদ্র আব সবুজ মাযায়,
এলো চুল চুম্বকের হাজার রেখায
স্তব্ধ, ছায়াপ্রচ্ছন্ন গম্ভীর।

উপমায় স্থিতি নেই, রৌদ্রে বাজে সারঙ্গেব গৎ,
সে দাঁড়ায় স্ফটিক আঁচলে আব ইন্দ্রনীল অসীম আকাশে
মরকতে সারি সাবি গাছে আর ঘাসে।
পিছনে ছড়িয়ে দেয় মানুষের স্নায়ুচ্ছন্ন অস্থির জগৎ,
ছায়ায় সে ফেলে আসে অসম্পূর্ণ ইতিহাস কালান্তরে সমস্ত সংবৎ।

ছাযাখানি চোখে পাতি, আবেগের আগুনে বিছাই।
আবার রৌদ্রও ধবি হেমন্ত হৃদয়ে, নিজের এবং পৃথিবীর,
দরজায়, সিঁড়িতে কিংবা বাগানে যখন চলে, কিংবা ঠায় সূর্যাবর্তে স্থির ॥

১০ জানুআরি, ১৯৫৯

## ব্লাডপ্রেসর

এ রোগে চিকিৎসা নেই, দুরারোগ্য সত্তার ব্যারামে
ওষুধবিষুধ বৃথা, যথাযথ পথ্যে বা ব্যায়ামে
কিছুতে কি কিছু হয়! রাত্রি কাটে অনিদ্রার ডোরে,
বক্ত ক্ষেপে ক্ষেপে ওঠে, নাড়ি ছোটে মরিয়া বেঘোরে।

মেলে দাও রক্ত চক্ষু নীলাকাশে উদার প্রান্তরে,
চোখের চিকিৎসা নেই আপিসের গোপন দপ্তরে ;
পেশীর শিকল যদি খুলে দাও অবারিত মাঠে,
স্নায়ু যদি মুক্তিস্নান করে নিত্য নিঃস্বার্থ বিরাটে,
নিঃশ্বাস বিস্তীর্ণ করো আদিগন্ত নির্মল হাওয়ায়,
তবেই শরীর সারবে, উচ্চচাপ কমবে ; দাওয়াই
বৈদ্যদেব হাতে নেই । এ রোগের বিধান আকাশে,
পৃথিবীতে, বনস্পতি ওষধিতে, খেত মাঠ ঘাসে,
পাহাড়ে, নদীতে, বাঁধে, গোচরের অনন্ত প্রান্তরে,
প্রকৃতিতে হৃদয়ের সুস্থ স্বস্থ স্বপ্নে রূপান্তরে ,
চিকিৎসা লোকের ভিড়ে, বস্তির কুঁড়ের জনতায়—
জনতা বা পৃথিবীতে, একই কথা, অন্যোন্য সত্তায় ॥

৭ মার্চ ১৯৫৯

## কৌণিকে নয়

যেখানে পাহাড় জ্যামিতির নানা সাজে
হৃদয় ভোলায় প্রকৃতির মনটাজে,
সেইখানে ঠিক পাঁচটি টিলার মোড়ে,
চলে গেল আহা পায়ে চলা বাঁকা পথে ।

কোন্ গ্রামে গেল সে কোন্ টিলার পারে
সূর্যাস্তের সমের অন্ধকারে ?
ওখানেও ছোটে ঝর্না কি এই তোড়ে
পূর্ণিমা ঝরে একই পুলকিত গতে ?

কী হবে হৃদয়ে জ্যামিতিক রূপছবি ?
দেবে না সেতারে শেষরাতে ভৈরবী ?
এইখানে ঠিক পাঁচটি টিলার মোড়ে
ফিরবে না কাল ? নাকি সে ফিরবে জোড়ে ?

কৌণিকে নয়, বৃত্তের পরিপূর্ণে
শিল্পের শেষ শান্তি,—জানে কি তন্বী ?
নিঃসঙ্গের বিধুর গোধূলি শূন্যে
বছর বছর দাঁড়াব এমনি মোড়ে ॥

২৭ মার্চ, ১৯৫৯

## চলেছি দেশ-দেশান্তরে

চলেছি দেশ-দেশান্তরে মনের ঘোরে দূর ফেরার,
দু-দুপাশে ছোটে পৃথিবী তার আকাশ ছেড়ে বিপ্রযাণ,
যেন পালায় মরিয়া ভয়ে আকাল যেন তাড়ায় হেঁকে,
যেন পালায় মড়ক থেকে, ভোলে নিজের কি সম্ভার,
দুপাশে ডাকে আকাশমাটি দুহাতে দেয় কী সন্ধান !

চলেছে কোন্ প্রাণের দায়ে মানের দায়ে ঊর্ধ্বশ্বাস,
জীবনে সারা দেশের মনে কী মহামারী ঘর দুয়ার
ভেঙেছে সব ছন্নছাড়া হন্যে দিয়ে করেছে তাড়া
কত মানুষ ? গম্য কোথা, সব পাড়ায় বন্ধ দ্বার,
এ উন্মাদে কেই বা চায় কানের পাশে উষ্ণশ্বাস

অচেনা দাবি কেই বা চায় অনির্দেশ আত্মদান,
একটি মুঠি ভিক্ষা নয়, সারাজীবন বারংবার
প্রাত্যহিকে মিলনলয়, দৈনিকের বিসর্জন,
অতীতে দিয়ে স্বত্ব সব ভবিষ্যতে অবগাহন ?
তাই চলেছি শহর ছেড়ে গ্রাম্য মাঠে রুদ্ধ প্রাণ,

দুপাশে ঘুমে শান্ত দেশ ক্লান্ত দেশ মাঠ পাহাড়
বন্য নদী শান্ত দেশ শ্রান্ত গ্রাম ঘুমে অসাড়,
ছেড়েছি চেনা সকল আশা ভুলেছি সেধে সভার ভাষা,

খুঁজেছি নীল সঙ্ঘে ঘুম, তাই বুঝেছি অন্ধকার
তোমার ছবি পিপুলছায়া, আড়ালে জ্বলে নদীর পাড়,

তোমাকে দেখি, প্রাচীন সোনা-খচিত প্রেমে অন্ধকার
আকাশে দোলে শুচি তোমাব ছাযাপথের চন্দ্রহার ॥

## চড়ক ঈস্টার ঈদের রোজা

(শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের জন্মদিনে)

ঘৃণার গঙ্গায নিত্য স্নান কবা, অবজ্ঞায় ভাসা ।
চতুর্দিকে মতিচ্ছন্ন গৃধ্নুদের ধূর্ত হাঁকডাকে
স্বার্থান্ধের ক্ষমতায় অক্ষমেব নিত্য যাওয়া-আসা !
আকণ্ঠ ঘৃণার ঢেউয়ে তাই ডোবা আবিশ্ব বিপাকে ।

অথচ প্রেমেই বৃষ্টি বান ঝবনা স্রোতগা ঊর্মিলা,
হৃদযের পদ্মরাগে পার্বতীব কণ্ঠে দোলে নীলা ।

যন্ত্রণা অশেষ আজ প্রেমী খোঁজে প্রেমের আস্তানা,
আশেপাশে জঘন্যের নগণ্যেব মবিয়া উচ্চাশা.
সমস্ত কর্মের ক্ষেত্রে তুচ্ছতার অসহ্য পিপাসা,
ঘরে ঘরে জল চায, অথচ ঘরেই সব নোনা :

প্রেম মানে প্রকৃতই প্রাণ-দেওয়া প্রাণ-নেওযা মনেপ্রাণে মানা,
বিলিয়ে মিলিয়ে বুকে ঠাঁই দিয়ে প্রেমের মানেটা যায় জানা ।
প্রেমেই ফসল ফলে ফুল ফোটে পেকে ওঠে ফল
অথচ সকলই আজ পুড়ে-হেজে মরে অবিবল ।

ঘৃণার এ অগ্নিযজ্ঞে প্রেমের জটায় বান আনা !
পাড় ভাঙা-গড়া ! এ যে ঘৃণাতেই প্রেমেব ঠিকানা ॥

দুই

যেহেতু আনন্দরূপ তুমি আমিও বুঝিবা
দেখেছি হয় তো কোনোদিন
প্রাণ-কম্প্র অন্ধকারে নক্ষত্র বিশ্বাসে সেই বিভা
নীল নম্র রূপের বিভাস
দেখেছি হয়তো কোনো কৃশতী ঊষায়

উন্মোচিত বাহু-বক্ষ-গ্রীবা
পৃথিবীর সাবিত্রীভূষায় ঘুমভাঙা ভৈরবী দীপ্তিতে
আনন্দরূপের বিভা

অমৃত মুহূর্তে ক্ষিপ্র চির প্রতিভাস
হয়তো বা আমিও দেখেছি
আদিগন্ত বিরাট ছটায়
অনেক শতাব্দী ধরে মহীদাস আমরাও সন্ধ্যায় দেখেছি
সিন্ধুতে গঙ্গায় দীপ্র
হাহাকারে সারা দেশে চৈতন্যে স্মৃতিতে আশায় এঁকেছি
বহুকাল বহু আর্য-অনার্যের বহু মানুষের

সেহেতু যন্ত্রণা আজ তীব্রতম
দেহের আরামে প্রাণের তৃপ্তিতে মনের আনন্দে ।
দুর্মর স্মৃতির সপ্তাহের ক্ষুরে ক্ষুরে
দুর্জয় আশার হাওয়ায় ধূলায়
নিদ্রাহীন একচ্ছত্র স্বপ্নের তূর্যের উজ্জ্বল ঘটায়
শান্তি নেই দিনরাত্রি শান্তি নেই গ্রামে গ্রামে
শহরে শহরে হাহাকারে দেশে দেশান্তরে
অন্নের অভাবে বাসাবাড়ি বস্ত্রের অভাবে হাহাকারে
নির্বুদ্ধির দুর্বুদ্ধির স্বনামে বেনামে
অক্ষমের অসতের অনাচারে অত্যাচারে
বিশৃঙ্খলা শত-ভেদাভেদে জীর্ণ চৈতন্যের কুয়াশায়
মৃত্যুভয়ে

আনন্দরূপমমৃত তবুও মরে না
শত কঙ্কালের বিস্তীর্ণ কাঁকরে
সে অমর কুরুক্ষেত্রে

ইন্দ্রপ্রস্থে পাশা চেলে বেচাকেনা খেলে
ম্যানেজারি দাঁও মেরে প্রতিদিন
কদম্বকাননে শত শমীদাহ সেরে
কিছুতে সে শেষ নয় হৃদয়বত্তায়
স্মৃতির প্রতাপ আর আশার স্পন্দন শত হাহাকারে
ঈদের রোজায় আর চড়কের ব্রতে আর উপোসি ঈস্টারে

যেহেতু আনন্দরূপে প্রত্যহের বিভা সবাই দেখেছি
যেহেতু এঁকেছি ধ্যাননেত্রে দৈনিক সত্তায় ॥

তিন

যে কথা কানে পশে অহর্নিশি,
যে কথা পড়ি সকালে নিজ চোখে
যে অসত্যে রোজের কাজে মিশি,
ডোবাই মন ড্রেন-পাইপ পাঁকে,
কাটাই দিন সঞ্চয়ের রোখে,
সেখানে কোথা বাঁচবে ঝাঁকেঝাঁকে
মানসজীবী অসিত-শ্বেত মরাল ?

শত বলুক পাঁকেই পলিমাটি,
বলুক পচা নালার কাদা খাঁটি,
পাঁচসালায় লুটুক পরিপাটি,
স্বাধীনভাবে হাঁকুক দশদিশি,
প্রকাশ করে লোভের ফাঁকেফাঁকে
অক্ষমতা ; কারণ কালদ্রোহী,
তাই এদের অন্ধতাও ভয়াল ।

কারণ কাল নেই রে বাদশাহি,
দাস-মহিমা মানে না আর মহী,
কারণ যুগসত্যে দীন দয়াল
মহেশ্বর কঠিন আজ করাল,
লগ্নি আজ ইতিহাসের দাহে
দগ্ধ করে নগ্ন দিবানিশি ॥

## চার

গ্রাম কি শহর বলো সব তেপান্তর,
সময়ে মেলে না বৃষ্টি
মাটিতে বা মনে,
যদিই বা নামে জল নামে তা অকালে।
কিবা গ্রীষ্ম কিবা বর্ষা আশ্বিন অঘ্রান
সব অবান্তর সব রসিকতা বেসুরে বেতালে।
অনাসৃষ্টি গ্রামে বা শহরে বহুর জীবনে,
কোথা পরিত্রাণ ?
এতকাল দেশে দেশে জেনেছে মানুষ,
জীবন, তা হোক না সে একের বা অনেকের,
প্রেমের বর্ষার রৌদ্রে স্ফটিক আকাশে
জীবন স্বধর্ম পায়, মাটি পায় মনে,
হৃদয়েরা স্বর পায়।      পেলব পুরুষ,
তা সে বাংলাই হোক আফ্রিকা বা চিন কিংবা রুশ ;
ভ্রূকুটিতে আদরে আশ্বাসে
একের অন্যের আবেগের মননের হাজার ধরনে
জীবনে জীবন দিয়ে মৃত্যু দিয়ে হাসে কেঁদে হাসে।
আজ কেন হাসি পাঁক, রৌদ্র আজ কেন অশ্রুজলে,
আজ মরুভূমি সাজে সাগরে সাগরে
অথচ সমুদ্র মনে আজ ঘরে ঘরে।
জীবনে কি কিছু নেই প্রেমের কড়িতে কিংবা ঘৃণার কোমলে ?
অবিশ্বাস্য ছলে আমরা কি সবাই হাঘরে ?

## পাঁচ

চতুর্দিকে নির্বোধের ভিড়,
কেউ ভালো, কেউ মন্দ, এরা সকলেই
স্বার্থে বা পরার্থে ঢাকে বর্ষার নিবিড়
সজল বাহার, ঢাকে দুচোখের নীড়
কথার কালিতে নানা নির্বোধ কৌশলে।

পৃথিবী ঢেকেছে এরা জীবনের মাটি
করেছে শ্মশান পোড়া, পোড়ো ;
কেউ মন্দ, কেউ ভালো, অর্থাৎ কারো বা মন খাঁটি,

সকলে চালাতে চায় কল্কির ঘোড়াই,
অথচ অত্যন্ত স্বস্তি চায় পরিপাটি ।

চতুর্দিকে, মাটিতে আকাশে
এরাই করেছে ভিড়, শালিক ও কাক
কিছু বা শকুন, আর বিচালিতে ঘাসে
বাছুর, শিবের ষাঁড়, আর হাঁকডাক
করে বটে পাড়ায় পাডায় কুকুর আশ্বাসে ।

চোখ ঢাকো কান চাপো, বুকচাপা দুঃস্বপ্নের ভিড়ে
নৈঃসঙ্গ্য রোপণ করো, প্রতিরোধ অন্বিষ্টের ধ্যানে ,
অবজ্ঞায় ঘৃণায় নেতিতে, একান্ত সজ্ঞানে
প্রেম-কে লালন করো স্বপ্নশুচি নীড়ে,
অন্য অরণ্যের ভিড়ে, আপন সম্মানে,
গাছপালা পশুপাখি শিশুর কল্যাণে,
মানুষের, যত মেয়ে-পুরুষের গানে ॥

ছয়

কদিন গরম বেশ, কলকাতায পশ্চিমা রোদ্দুর,
তারপরে বৃষ্টি এল, কালবৈশাখীর বৃষ্টি, ঝড, শিলা, জল ।
ঠাণ্ডায সন্ধ্যায় ভাবি এই ক'টা দিন .
সমুদ্রের বাংলার সাবেক হাওয়ায়
সারা দুনিয়ায় কেন—বাংলায় এলোমেলো অকালে আগুন ঝরে
পশ্চিমা রোদ্দুরে ছাযাচ্ছন্ন আফ্রিকার ঘৃণার আগুনে
কালো কালো চোখ ভরে রক্ত ঝরে
ছায়ায় ছাযায় শুধু হত্যার রোদ্দুর ।
অথচ ঈস্টার এল ।
অথচ পাইলেট ।এখনও ঈস্টার আসে পশ্চিমের কারো কারো হৃদয়রক্ত
চৈতালি অশ্রুতে বাজে মানবিক উজ্জীবিত সুর
সে কোন্ মাতার
করুণ বাহুতে এল নূতন মানুষ,
আবিশ্ব নয়নে এল মমতার অশ্রুর প্রণতি ।
আজও তবু হেরডেরা সালোমের পসরা যোগায়
এশিয়ায় আফ্রিকায় স্বদেশেও লাভের ক্ষতির
দীর্ঘ ইতিহাসে, শিশুর হত্যায় ।

অথচ গির্জায় চলে গম্ভীর আরতি,
সভ্যতা সংগীতে তীব্র রূপ ধরে, ভেসে আসে দক্ষিণে হাওয়ায়।
তবু হেরডেরা অন্ধ গৃধ্নুর সত্তায়
সালোমের ভোগের পসরা দেশে দেশে মবিয়া যোগায়।
যেন বা পাইলেট আজও ন্যায়-দণ্ডধব, এ-হাতে ও হাতে
চেলে বণিক বন্ধুর।
যেন বা পশ্চিমা মরু একমাত্র সত্য যেন অক্ষয় অমব
ছায়াহীন বৃক্ষহীন শস্যহীন অকাল রোদ্দুর।

মাঝে মাঝে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি নামে, শিলাবৃষ্টি, জল পড়ে
স্নিগ্ধ ঘন ছায়ায় শরীবে নামে অখণ্ড সংবিৎ।
এদিকে গির্জায় একটি মাতার পবম মায়ায় বাজে
ইয়োহান সেবাস্তিআনের, হত্যা নয়, সৃষ্টিময় মহীয়ান সুর
দুর্গতের কলকাতায়, উদ্বাস্তুর বাংলায় এশিয়ায় আফ্রিকায়
বাখের আপন দেশে একটি সংগীত।
কদিন সন্ধ্যায় বইছে সমুদ্রের হাওয়া শিলাবৃষ্টি ঝড়ে।
মাথা হেঁট ক'রে নাকি শোনে হেরডেরা
শুনি নাকি পালায় পাইলেট ॥

সাত

তারপরে অন্ধকার শান্তি আর উন্মোচিত নিস্তব্ধতা।
ঘুমের সমুদ্রে কিংবা ঘুমের আকাশে মুক্তি প্রতিদিন।
ঘুম ভাঙে প্রতিদিন রুশদ্বৎসা রুশতী উষায়,
মনে হয় প্রাণ সত্য, এ নশ্বর জীবন অমৃত।
বিশ্রাম সচ্ছল,পরিপূর্ণ, মানবিক, চৈতন্যে বিস্তৃত।
মনে হয় কাজের সন্ধান আর কর্মস্থানে কাজ,
আর সকাল বিকাল যাওয়া-আসা
সব কিছু, মনে হয়, ঘুম থেকে জাগা যেন রাত্রি আর দিন দ্বন্দ্বহীন,
উভয়ে সমান-বন্ধু, উভয়েরই এক ভাষা, শুধু বিভিন্ন ভূষায।
এ দেয় নন্দিত ঘুম আব অন্যে কর্মের প্রবল
ছন্দময সার্থকতা, যেন এক পতিব্রতা প্রেমে ধৈর্যে
দৈনন্দিনে অন্নপূর্ণা আর রাত্রিতে প্রেয়সী, দুই একাধারে ধৃত,
যেন দ্যাবা-পৃথিবীকে বেঁধে রাখে সূর্যেচন্দ্রে আণবিক পৃথিবীকে
একটি মিলনে সাহচর্যে,
কিবা দিন কিবা বাত্রি, স্বদেশ-বিদেশ।

তারপরে ? তারপরে কর্মস্থলে ক্লান্ত যাত্রী ।
কর্ম শুধু ক্লান্তি, অসংলগ্ন অর্থহীন,
শত অর্থ খোঁজার পরেও অনর্থক ।
তারপরে ক্লান্ত ফেরা ।
গ্রামে কিংবা গ্রাম্য জীর্ণ অতিকায় শহরেই হোক ।
কোথায় সে রাত্রি যার হাসির পূর্ণতা
ঢেকে দেয় স্থূল অন্ধকার
ভাস্বতীর নিজ অন্তরের দীপ্র অন্ধকারে,
যে শান্তিতে গ্রাম্যবাসী অবিক্ষত
নি পদ্‌বন্তঃ নি পক্ষিণঃ
নি শ্যেনসশ্চিদর্থিনঃ— ?
তাই রাত্রি যন্ত্রণাই, অবসর অস্থিরতা, ক্লান্তিকর,
রাত্রি আর দিন যেন সতীনেরা
সদাই উদ্যত, ভবিষ্যৎ দুঃস্বপ্নে শূন্যতা,
স্মৃতি শুধু শোক ।
প্রতিদিন প্রতিরাত্রে
ঘরে ঘরে-বাইরেও কাতরায় শূন্যতার সেই একই রোখ ।
চাই অন্ধকার, অন্ধকার শেষ করি যেন প্রতিদিন দীর্ঘায়ুতে
ঊষসী-ঊষায়, সবিতার খড়্গে খড়্গে,
যে সবিতা পশ্চাৎ ও যে সবিতা পুবস্তাৎ
উত্তরের অধরের সর্বত সবিতা,
সার্থকের বরেণ্য ঊষায় রুশদ্বৎসা রুশতীর ভর্গে
জগৎহিতায় ঋণশোধে স্নায়ুতে অপার প্রাত্যহিক আত্মস্থতা
আবিশ্ব প্রসাদ ॥
২৭-৩০ মার্চ, ১৯৫৯

## চার স্রোত

এখনও গরম কম, ফাল্গুনের শেষ ;
পল্লবে মুকুলে ফুলে চোখ ভরে, ঘ্রাণ ভরে
আর পাখি,শত পাখি গান করে ।

অসহায় আর হিংস্র জন্তুজগতেও জাগে প্রকৃতির দেশজ আবেশ।
চড়া, বালি, ছোট বড় শাদা কালো শিলা
চতুর্দিকে ইতস্তত জ্বলে বাসন্তীর অনুরাগে ;
তার মধ্যে নয়নাভিরাম হিম স্বচ্ছ স্রোত।
পায়ে চলা পথ বাঁয়ে রেখে
ডাইনে বাঘোয়া টিলা ফেলে নেমে চলি জলে জলে,
স্ফটিক-শীতল জলে স্পর্শের আরামে নেমে নেমে চলি অবিরত।
ছড়ায় নদীর বাহু সমস্ত শরীব,
পাহাড়ের মাটির পাড় ঘিরে থাকে বিপুল বিস্তারে
অতিকায় নর্তকের মতো।
কানে আসে গভীর সংগীত।
চার স্রোতে ভাঙে নদী শিলায় শিলায়,
বিবাদীর ধ্বনি মেলে আত্মদানে প্রেমেব নিস্তারে,
ঝাঁপ দেয় প্রবল ঝোরায় প্রপাতের বেগে চারটি ধাবায় ;
নিচে বেশ দশ-বারো হাত নিচু স্তরে
তবল তন্ত্রীব ভিন্ন চাবটি পরদায়
অপরূপ সংগীতে হারায়,
স্বাতন্ত্র্য মিলায় যেন মৎসার্টের বরদা প্রসাদে,
একটি সংহতি পায় মধুর তরল নানা খাদে হরেক নিখাদে।

সুরেলা ঝোরায় ঢালি নিজেকেও,
গানে স্নানে ফেনিল ঊর্মিল তোড়ে ছেড়ে দিই,
ধুয়ে দিই শরীর, ডোবাই ফাল্গুনের শেষাশেষি সমস্ত সংবিৎ ॥

## অশ্বত্থ

গাছের স্তব্ধতা গড়ি দেহে মনে,
মহাপিপুলের, আকাশে রোমাঞ্চ মেলে রাখে
সহস্রাক্ষ যে পিপুল, অটল স্তব্ধতা দেখি তার সনাতনে,
মনে মনে গড়ি,
রাঢ়ের রুক্ষতা জয় করে যে পল্লবে
লক্ষ লক্ষ প্রাণময় সবুজ পল্লবে ঢাকে
আপন হৃদয়,

কঠিন সংহত স্থির সারাটা প্রান্তরে প্রাণের গঠন,
অজেয় উৎসবে কোনও উমার সন্ধানে
যেন বা এসেছে দেশে সতীর গিরিশ ।

পিপুলে তন্ময় দেহমন

ওদিকে তুলেছে কারা মহানিম আমজাম ছাতিম শিরীষ
নানা ফুল-ফলগাছ নানা শব্দ গানে
ঝিরিঝিরি নাচে
নরম হাওয়ায়,
সব ভালো খুব ভালো, মধুব মধুর, আনন্দ আবাম তৃপ্তি ;
তবু অতুলন এই বয়স্ক পিপুল, রৌদ্রে স্থির,
পৃথুল প্রবীণ পৃথিবীর বিপুল প্রণযে স্তব্ধ ।

কখনও বা অনেক কূজনে কচি কচি লক্ষ লক্ষ কোমল সবুজ
হাতে হাতে মৃদু পাতা শিহরে শিহরে দোলে,
যেন কোনও আন্দোলনে পরগনার সমস্ত মাতার
কোলে কোলে স্পষ্টে আর অস্পষ্টে অবুঝ শিশুদের ভিড়,
কখনও বা ঈশানের ঝড়ে
উদ্দাম উন্মাদ রাগে হাহাকারে মারে মরে
নুয়ে বেঁকে পড়ে, বাসা ছাড়ে, তালে তার তাল দেয়—
পাখায় পাখায়,

ভাঙে না, কারণ তার আবিশ্ব শিকড়ে সনাতনে
গভীর কঠিন প্রাণ, বড়জোর বহুদূবে পাঁচিলের ভিতে
উপড়িয়ে ওঠে তার দুর্মর আবেগ. ফাটল ধরায়.
ধসায় দেয়াল. বড়জোর ঝরায় পল্লব কিছু.
কিছু বা খসায় ডাল,
তারপরে আবার আত্মস্থ,
আকাশ ও নীড়,
স্তব্ধ স্থির আমাদের মাঠে আশ্চর্য অশ্বত্থ গাছ ॥

১৮ এপ্রিল, ১৯৫৯

## বাসাবাড়ি

বাসাবাড়ি রুক্ষ মাটি । শিকড় গজাতে লাগে
বহু গ্রীষ্ম বর্ষা বহু হিম ।
ভাবি কোন্ ঘর পাব কবিতার ভাগে,
কোথায় ছড়াবে মন, পুব না পশ্চিম ।

এখানে উত্তর খোলা, তবুও ফাল্গুনে রিমঝিম
মন আর হাওয়া দোলে গন্ধের বাহারে,
টুনটুনির মিহি গলা খুলে দেয় ঝুরুঝুরু নিম,
ঘুঘু, বুলবুলি বসে আর আসে মিছিলে আহারে

বহু টিয়া, মহাসুখে নিমফল তিক্ত ওষ্ঠাধরে
খায় আর চুপচাপ ভাবে,
তাছাড়া শালিক আছে আর কাক, যতই আদরে
অন্য পাখি চাও, এরা সমানে চেঁচাবে ।

বাসাবাড়ি, রুক্ষমাটি, অনাবাদি, ভূদানের মতো,
ভোগ্য বাসযোগ্য নয়, তাও পেতে হিমশিম,
দালালি সেলামে নানা দাবিতে বিব্রত আপাতত
উত্তরের ঘরে উঠি, ফুলে ছায় নির্বিকার নিম ॥

২৪ এপ্রিল, ১৯৫৯

## নিজস্ব সংবাদদাতা

খবরের কাগজের কাজ ।
খাদ্যাভাব, পূর্ববঙ্গত্যাগী ভিড়,
বাংলায় সমস্যা উগ্র, তাই চেয়েছে রিপোর্ট ।
ঘুরি তিক্ততায় দগ্ধ ক্যাম্পে, ছাউনি-বস্তিতে
গ্রামে গ্রামে, পোড়া মাঠে পোড়ো দেশে
যেখানে একালে, মনে হয়, চিরকাল বার্ষিক আকাল

মাথায় প্রচণ্ড রৌদ্র, পায়ে মাটি কোথাও চৌচির
কোথাও বা হাঁটু ধুলো,
জল নেই, মানুষের চোখে মুখে জল নেই,
শুধু ঘৃণা, অবিশ্বাস, দীর্ঘকাল বঞ্চিতের সন্দেহ সংশয় ।

বোঝাই : দেখতে ভদ্র এইমাত্র, কিন্তু শুধু রিপোর্টার,
কখনও নিই নি ভোট, দেশ স্বাধীন মস্তিতে
ভাঙি নি, কয়েক কোটি মানুষের দুর্ভাগা কপালে
হানি নি রাজ্যের লোভ ক্ষমতার কেরামতে সুখে ।
শুধুমাত্র রিপোর্টার, ভদ্রলোক এইমাত্র,
আসলে এদেরই মতো অসহায়, পরাধীন, রৌদ্রে পোড়া,
হয়তো পেটটা ভরে, অথচ হৃদয় ইতিহাসে অসহায় বলি,
একেবারে নিঃসম্বল, তিক্ত, পোড়া, খাঁটি ।
ছেড়ে দিই স্থানীয় বাবুর জীপ মুরুব্বির নতুন মোটর,
মফস্বলি বাস ধরি, ভাবি : যেখানে যেমন রীতি, হাঁটি ।

হাঁটি, এই গ্রাম থেকে যাই ওই গ্রামে
নির্জলা অভাব সারাটা জেলায়, সর্বত্রই এক উপবাসী জ্বালা ।
এদিকে গরম প্রায় পশ্চিমা মরুর ! আজও যদি ভাবি,
জ্বালা তার গায়ে লাগে । আমাদের আষাঢ়েও বৃষ্টি কই নামে ?
আমাদের উঠে গেছে বৈশাখীর বৈকালির পালা ।

মনে পড়ে একদিন, সে গ্রামে উনুনে
আগুন নিবন্ত, আগুন আকাশে তোলা আগুন মাটিতে ঢালা ।
যেতে হবে পুবগ্রামে, সদরালা নই, নই নায়েব নবাব,
সুতরাং সকালেই যাত্রারম্ভ । সে কী মাঠ ! মাইল মাইল
অনেক শতাব্দী ধরে হাজার হাজার খুনে
পৃথিবীকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে মেরে গেছে যেন,
আম-জাম-কাঁঠাল পিপুল কিছুই নেই, দিঘি কুয়া
খালবিল মজানদী কিছু নেই ।
শুধু নীরক্ত শ্বেতাঙ্গ রৌদ্র ।

তৃষ্ণার আবেগে চোখ ফাটে । সে সময়ে, আজও মনে পড়ে,
বাঁয়ে কাঁটা ডাঙার আড়ালে হঠাৎ মন্দির এক দেখা যায়
ছোট, ভাঙা, জনহীন । সে দিকেই চলি ।

জলের আশায় ক্ষুধা আর পিপাসায় ছায়ার আশায়
না ভেবেই উঁকি দিই ।

মনে পড়ে আজও মনে পড়ে সেই সর্বংসহ অন্ধকার,
আশ্চর্য কোমল ছায়া মায়ের চোখের স্নিগ্ধ অন্ধকার,
চোখ দেহ হৃদয় জুড়ানো আহা কালোর আরাম ।
চোখের জীবন ফেরে, দেখি নগ্ন যুগল বিগ্রহ
বেশভূষাহীন, শুধু কষ্টি পাথরের দেশী রাধা আর ঘনশ্যাম,
নেই পূজার গৌরব, অথচ কোথায় গন্ধ
আরতির শৃঙ্গারের পাথরে স্তম্ভিত কোথায় সৌরভ ?
বেদীর পিছনে দেখি বেঁচে আছে কালো পাথরের ধাপে
হিম অন্ধকারে একা কয়েকটা কাঠ-চাঁপা
মৃত্যুহীন গোরোচনা বাহারের গন্ধের প্রতাপে ।
আর বাঁদিকেব কোণে দেখি সজল মাটির একটি কলসি মুখচাপা ॥
৩ মে, ১৯৫৯

## বৈশাখী নয়

বৈশাখী নয়, মনসুন নয় । ঝড, হাওয়া,
আর বর্ষণ শুরু হয়েছিল তাণ্ডবে,
শহবেব গাছ, গরীবের ঘন টিন-ছাওয়া
খড়-ছাওয়া ঘর উড়িযে ছড়িয়ে উপড়িয়ে ।

তারপর থেকে আষাঢ়ের হাওয়া, ধারাজল
কদিন চলছে, পশ্চিমা তাপ গাণ্ডীবে
তাড়িয়েছে বীর । দিন ভাবি পাছে টঙ্কারে
আবার সে রাগ প্রলয় জাগায় ডাক দিয়ে
পাগলা হাওয়াকে তিব্বত থেকে সমুদ্রে
উড়িয়ে ছড়িয়ে উপড়িয়ে যত পাতাবাহার
শহরের গাছ, আর গরিবের যা সম্বল ।

বৈশাখী নয়, মনসুন নয়, অত্যাচার
অনাহার দূর করার নাকি এ পন্থা নয ।

এ শুধুই রাগ, প্রকৃতির রাগ, এ রুদ্রের
নিছক মেজাজ, তবু মনে হয় অন্ধকার
স্বপ্নে যখন সারথিকে ডাকে গাণ্ডীবে,
তবু মনে হয় নিত্য বৃহতে ও ক্ষুদ্রে
তিক্ত মরুতে খাণ্ডব তাপ সিক্ত হয়,
স্নিগ্ধ রাত্রি মনের হরিষে ঘুম বিভোর
রিম্‌ঝিম্ গানে খুঁজে পায় যেন আরেক ভোর ॥

মে, ১৯৫৯

## গাছ মরে

ঝড়ে নয়, জলঝড়ের অভাবে
বজ্রবৃষ্টি রুদ্ধ ব'লে
বৃক্ষ ইব স্তব্ধ মহাপুরুষ স্বভাবে
মারী লাগে, মড়ক লাগায়।
জল নয় ঝড় নয়, অনাবৃষ্টি অকালের বীজে
চোরা মৃত্যুর মরশুমে শিকড়ের মর্মে মর্মে
মাটির অন্দরে ভিজে উদ্ভিদের মনে প্রাণে
শ্মশান জাগায়। কে বা কারা?
তারাই কি লোভের পসরা
নিয়ে যায় লরিতে মোটরে ট্রাকে ভারে ভারে
যেহেতু তারাই গৃধ্নুর কারবারে করাত চালায়,
মরা কাঠ চায়।
তাই কৃষ্ণচূড়া তাই জারুল গুলমোরে
অশোক বান্দরলাঠি পিয়াশাল বিজাশালে হিজলে সোঁদালে
শিরীষে আকাশনিমে নানা বনস্পতি মহীরুহে
স্বদেশ আত্মার মূর্তি
যেটুকু বা প্রাণের স্বাক্ষর ছিল কুৎসিত শহরে
যেটুকু বাহার, সারাপথ ছেয়ে ফুলে বা পল্লবে
বাম দক্ষিণের অভিরাম সেতু, তাতে
ঘুণ ধরে, মরে যায়, ঝড়ে নয় জলে নয়
জলঝড়েরই অভাবে, বিষে লুব্ধ তাড়নায়
বাংলায় এসে পড়ে রুক্ষ মারবাড়।

মরে যায় সুপর্ণ পিপুল;
সনাতন বোধিদ্রুমে মারী লাগে সাহারার বিপুল জ্বালায়।
এদিকে রৌদ্রের চোখে ক্ষমা নেই,
রুদ্রের দাক্ষিণ্যহীন অসহ্য ঘৃণায় শরীরে হৃদয়ে।
রাজধানী খড়গাদা আস্তাকুঁড় গ্লানির পাহাড়,
আর গাছ রোগে মরে, চোরাঘায়ে সবুজ পালায় ভয়ে,
গোপন প্রভাবে গাছ মরে,
ঝড়ে নয়, বজ্রে বা বিদ্যুতে নয়,
বিদ্যুতের বজ্রের অভাবে ॥

১৮ মে, ১৯৫৯

## রাত্রিদিন ক্ষত বাহির ঘর

স্নায়ুর শতমুখে রাত্রিদিন
কাটাই, এই বড় যন্ত্রণা।
দুঃখ সুখ যাই বলো সে সব
সর্বক্ষণ একই তীক্ষ্ণতার
শরীরমনে এক বিরামহীন
চরম টানে বাঁধা সুরবাহার,

অথবা হরধনু ; আতত জ্যা
সর্বদাই হানে যে টঙ্কার,
সে ভরা বেগ সেই ঝনঝনা
শান্তিতেও আনে ক্লান্তিহীন
প্রখর আবেগের প্রব্রজ্যা,
ঘুমেও বিক্ষোভ ক্ষান্তিহীন।

সুখ তো নেই, বলো দুঃখে তবে।
আছে কে মানসের দূর্বাশ্যাম
আমার অশ্রুর স্নিগ্ধতায় ?
দুঃখ কোথা ? নেই কোনো আরাম
বিশ্বব্যাপী এই তীব্রতায়
উগ্র মানসের তুষোৎসবে।

স্নায়ুর শত চূড়া উর্ধ্বশ্বাসে,
প্রিয়ার বক্ষেও সুপ্তি নেই,
ঘুমেও খরতার মুক্তি নেই,
মুখর আগ্নেয় শত শিখর
ছেয়েছে সত্তার নীল আকাশ,
দগ্ধ ত্রিকালের শতেক শরে
রাত্রিদিন ক্ষত বাহির ঘর ॥

## একটি বৈঠকী নাটক

মনে আছে, সেবারে বেড়াতে যাওয়া সুবর্ণরেখায় ?
পাড়ে খুব তোড়জোড়, খিচুড়ির চড়িভাতি চড়ে,
আর আমরা কয়েকজন জলে জলে এঁকে বেঁকে চলি :
স্নান গান হই হই, হয়তো বা কারো কারো প্রেমালাপ
অন্তত চুপি চুপি নিচু গলা কিছু বলাবলি ।
তোমাদেরও মনে পড়ে ?
হঠাৎ বাঁকের শেষ আর আচম্বিত অভিশাপ
বালি আর জলে ?

আজও মনে পড়ে সেই চোরাবালি থেকে কোনোমতে
বিশাখা অনুপ আর সুরেশকে টেনে টেনে তোলা !
এদিকে তারা তো ডোবে, জল বাড়ে, ভয়ও ঘনায় স্রোতে,
নদীর ভূগোলে পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাসে দৃষ্টির অতীত রসাতলে,
যাবে কি অতলে তিনজন ?

কাল তাই হল । আড্ডাটা জমেছে দিব্যি, কথা হাসি,
চালাচালি, গোলদিঘির পোলো যেন,
হঠাৎ কি চোরাবালি ডাক দিলে, সমস্ত হাওয়াটা
রাগের ও ঘৃণার বিদ্যুতে হল ভারি,
অনুপের মনে হল সুরেশের মুখে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়াটাই
ভীষণ জরুরি, তাই উভয়ে চেঁচাল, কিংবা গলা চেপে
ছড়াল দুজনে, অন্তত অনুপ, শ্লেষের পিচকারি ;

একজন বেশি বুঝি ; অন্যজন কম, বালি পাঁক জলে
রসাতলে ডাক দিলে । উভয়েই ডোবে জড়াজড়ি
এর হাতে ওর পায়ে ।
অথচ ব্যাপার কিছু নয় আড্ডার সুখের মুখে কথা
কিছু মিঠা কিছু খাট্টা ।
সুবর্ণরেখায় চলা ছুটির মেজাজে সব
চলি বসি ভিজি হাসি আর উঠি-পড়ি,
হঠাৎ চমক হেনে চোরাবালি টেনে ধরে মৃত্যুর অতলে ।

জানি না কি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল ভালোর মন্দের
অপছন্দ পছন্দেব অবান্তর অচেতন
সুরেশের অথবা—এবং অনুপের বালি জলস্রোতে,
হঠাৎ আড্ডাটা হয়ে গেল ঘৃণায় চৌচির,
ঘূর্ণাবর্তে রসাতলে যেন প্রায় বৈপ্লবিক,
আলজীর বা মাউমাউ, কেনিয়াট্টা কিংবা যেন নাগা !

সহজে কি বোঝা যায় ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কেন ঠিক
ভালোবাসা জমে গলাগলি ঢলাঢলি, কেন ঘৃণা জ্বলে
কেন দপ্ ক'রে। রাগারাগি,কেন কোন্ জীবনবিকারে প্রতিশোধে
আত্মসচেতনতাই হয়ে ওঠে বেকুব বেল্লিক ॥

মে, ১৯৫৯

## ইন্দ্রধনু প্রতিবিম্ব

জাড়মুণ্ডি পার হয়ে আকাশের মেজাজ পাল্‌টাল্,
অশ্রুর লাবণ্য-স্নানে এল স্বচ্ছ হাসির প্রসাদ,
টার্‌মাক পথের বাঁকে, গাছে, মাঠে, ন্যাড়া কালো কালো
পাহাড়ে পাথরে রৌদ্র ; সত্য হল মামুলি প্রবাদ,
রুপালি সৌন্দর্যে ভিজা পৃথিবীর মেঘল শবীরে ।
নয়নাভিরাম পথে চলেছি কজনে, আঁকাবাঁকা
উঁচুনিচু বিস্ময়ের ক্রমাগত বৃষ্টিস্নিগ্ধ তীরে,
চোখের খুশির আর মনের খুশির স্রোতে আঁকা
দৃশ্যের নদীর পাড়ে, প্রকৃতির খেয়ালি কৌশলে ।

এ প্রকৃতি এ নিসর্গ ঘনিষ্ঠ সৌন্দর্য-চেতনায়,
আজন্ম এ তীব্র স্মিত সৌন্দর্য চেয়েছি ছলে বলে
প্রাত্যহিক সাধারণ্যে, সেই জলে রৌদ্রে বেদনায়
এল নেমে ইন্দ্রধনু, পরগনার পাহাড়ে পাহাড়ে ;
পাহাড়-আকাশ বেঁধে আদি সাতরঙের বাহারে,
আর তার পুনর্বৃত্তি বৃষ্টির শিশিরে সদ্য ধোয়া
সবুজ প্রান্তরে মুক্তা প্রতিবিম্ব মর্ত্যের দোহারে।
ননিহাট পাঁচপাহাড়, অন্যদিকে মহুয়াগড়ির
অনেক চূড়ার আভা দ্বৈত পায় পথের বাঁপাশে ;
মাটিতে আধৃত জোড়া ইন্দ্রধনু আনম্র আকাশে
তোমার দুহাতে বাঁধি, এ দৃশ্য যাবে না আর খোয়া ॥
জুন, ১৯৫৯

## গ্রাম্য কবিতা

গন্ধে চৈত্র হাওয়া সারাদিন ম'-ম,
তবুও কোথায় কোথায় যে প্রিয়তম !
কান্নার ঝোঁকে ঘুরিস যে কেন বৃথা !—
জানিস কি তোরা ওরে পার্বতী সীতা
কোথায় গিয়েছে মেয়েটা, এসেছে মিতা,
সারাদিন ধ'রে বন্ধ ঘর দুয়ার,
নতুন শাড়িটা পরেনি এখনও সিঁথি
রাঙায়নি মাঝে বাঁধেনি চন্দ্রহার !—
যাকে চাস সে যে ফিরেছে পথের শেষে
ঘরের ঘুমের প্রয়োজনে বীরবেশে,
ওরে হতভাগী কোথায় যে গেলি চলে,
যে এসেছে ঘরে তাকে চাস কোন্ চুলোয় ?

—যেতে দাও যাক সূর্য অস্তে চলে
তাবায় তারায় লক্ষ পায়ের ধুলোয়
একাকিত্বের গহন পথের শেষে
গ্রামশহরের কোলাহল মন্থনে
অমৃত ও বিষ পান করে জনে জনে
আসবে আবার যে যার আপন দেশে

প্রথম প্রহরে না হোক আসবে শেষে,
সহকর্মিণী আনবে সে প্রাণপণে
মর্মে মর্মে সহধর্মের আশা,
পুলকিত হবে চৈত্র অন্ধকার
সহিষ্ণু এই হৃদয়ে উঠবে জ্বলে ।
তবে যৌবন পাবে মিলনের ভাষা ॥
১৯৫৯

## বর্ষার নদী

কে বলে এ সেই নদী । চড়িভাতি করেছি সকলে,
পাহাড়ে বালিতে জলে কী আনন্দ, কোলাহল, স্নান,
এই তো ক-মাস আগে—কিছুটা বা সাহেবি নকলে
সকলে করেছি খাওয়া-দাওয়া, গীতবিতানের গান ।

হৈমন্তী হরিণ নদী আজকে সে মরিয়া মহিষ
প্রচণ্ড বন্যায় বন্য, নেমে আসে মাথাভাঙা তোড়ে ।
এদিকে বেঁধেছে গ্রাম্য পাঁচটা কি ছ'টা বাঁশে সাঁকো,
পায়ে পায়ে মৃত্যুভয় । ওদিকের বাঁকে চলে খেয়া,

নিরুপায় লাগে, চোখ ক্ষিপ্রস্রোতে যেদিকেই রাখ
ডিঙি ছোটে লাল স্রোতে, চোকে বুঝি সমস্ত বকেয়া ?
ছুটির সে মরা নদী বর্ষা আজ, মাতে শত কৃষাণ মুনিস,
কিংবা মজুরেরা যেন দলে দলে কারখানায় মোড়ে ॥
১৭ জুন, ১৯৫৯

## তাই তো তোমাতে চাই

একটিই ছবি দেখি, রঙের রেখার দুর্নিবার একটি বিস্তার
মুগ্ধ হয়ে দেখি এই কয় দিন, অথচ যামিনীদার
প্রত্যহের আসনের এ শুধু একটি নির্মাণ একটি প্রকাশ,

হাজার হাজার রূপধ্যানের মালার একটি পলক
যেখানে সন্তত গোটা দেশ আর কাল, একখানি আবির্ভাব
স্বয়ম্বশ স্বতন্ত্র স্বাধীন, অথচ রঙের প্রতি ঢেউএ ঢেউএ
দোলা দেয় পঞ্চাশ বছর, নিত্যকর্মী সমগ্র শিল্পীর জাগ্রত জীবন,
শুধু কি শিল্পীর, তাঁর নিজের ঘরের, বংশের, দেশের
আধভোলা, ভোলা, চৈতন্যের, রক্তের প্রভাব,
সারা পৃথিবীর ছায়া, রৌদ্রে জলে রেখা রঙে
একটি ছবিতে উজ্জীবন প্রায় প্রত্যাভাস
যেমনটি সাগরসঙ্গমে এসে অলকানন্দার উৎস মেতে ওঠে
জটায় জটিল কপিলের দীর্ঘ ইতিহাস
সামুদ্রিক বন্যা হয়ে ভাগীরথী-মোহানায় ।

আর কেউ এ বুঝুক না-বুঝুক, তুমি জানো, কারণ তোমায়
দেখি আর মুগ্ধ হই, প্রাকৃত রূপের তীব্র আবেদন
সঞ্চারিত শিরায় শিরায়, দেখি তুমি অনন্যাসুন্দরী
অনেক মায়ের ঠাকুমার বহু লক্ষ্মী উর্বশীর জেরে
মানবিক এবং জৈবিক প্রেরণার ছবিতে ভাস্কর্যে মূর্ত
পদাবলি ভাটিয়ালি বাউলের তুলসীমঞ্জরী ।
তাই তো তোমার রূপে দেহে মুখে প্রতিটি বিভাবে
তুমিও তো স্বদেশ-আত্মার এক প্রাণমূর্তি, শুধু কি স্বদেশ !
বাদীতে অনন্যা তুমি, প্রতিবাদী-বিবাদীতে সাধারণ্যে তুমি ইতিহাস,
সীমায় অসীম তাই বিশেষ ও নির্বিশেষ একটি মুহূর্তে,
লয়-স্রোতে আন্দোলনে মৃদঙ্গের তালে ঢেউয়ে চর জাগে পূরবী-বিভাস
গোধূলিলগনে এই বিবাহের রঙে
তাই তো তোমাতে চাই
দিনরাত্রি হোক গুঞ্জামালা
অথবা রুদ্রাক্ষে বাঁধা পরম্পরা উভয়ত একক প্রচ্ছন্ন
অথচ সম্পৃক্ত কর্মে,প্রকাশ্যের জনপদে পথেঘাটে নিত্য পূর্তে,
জটায় আবিষ্ট সেই গঙ্গার মতন, চাঁদের আগুনে ঢালা ॥

২১ জুন, ১৯৫৯

## অন্ধকারের ক্ষতিও তাকে

স্বর্ণলতার ঝোপে জ্বলে যাক জোনাকি পোকা,
রজনীগন্ধা দাঁড়িয়ে থাকুক কয়েক থোকা,
পাহাড়ের আড়ে পালিয়েছে বুঝি, পালালই বা,
বিভাবরী তাকে দিয়ে দাও যাকে দিয়েছ দিবা।
অন্ধকারের আভায় সে বুঝি আঁচল পেতে
গোলাপি পথের বাঁকে বাঁকে আর সবুজ খেতে
পালিয়েছে ওই যেখানে নীরব সন্ধ্যাতারা,
ভাবে ঘরে গিয়ে কাটাবে রাত্রি তন্দ্রাহারা।
তাহলে এবারে ক্ষান্তি মানো হে, ক্ষান্তি মানো,
গ্রামের কোথাও আশ্রয় চাও, ঘুমের দানো
মাটির দাওয়ায় নামাও এবং রাত্রিটাকে
বিলিয়েই দাও পাহাড়-পারানি পলাতকাকে।
দিন যাকে দিলে কয়েক ক্রোশের পাড়ির পাকে
পাশাপাশি দিও অন্ধকারের ক্ষতিও তাকে ॥

২৫ জুন, ১৯৫৯

## বৃদ্ধ করো ক্ষমা

এদিকে চাও শিশুর হাসি জাতিস্মর প্রসাদ
মায়ের কোলে দুনিয়াদারি প্রাজ্ঞ কৌতুকে,
বরদা প্রতি রাত্রিদিন আত্মপর চেনা
ইন্দ্রিয়ের সংবেদনে ভাষার তান-সাধা,
ঘর-বাহির সতত বাঁধা প্রেমের যৌতুকে,

ওদিকে দাবি-দাওয়া জানাও, ক্ষান্ত বেচাকেনা
আলোআঁধারি হাটের শেষে দিনের আর রাতের
যুগল ক্ষণে, বিস্তারিত অতীত খালি হাতের
ভাঙা রেখায়, সামনে বাকি স্বল্প হাসা-কাঁদা
অন্ধ দিন যেখানে খোঁজে বধির রাতে অমা।

সকর্মক শিশুর হাসি ; আত্মপর চেনা
মেলাতে চাও, বৃদ্ধ, তুমি উদার গোধূলিতে,
সর্বসহ আলিঙ্গনে পাওনা আর দেনা
যে দেশে এক, ব্যাপ্ত আশা উদার সংবিতে
সবকিছুই শিশুর প্রেমে, বৃদ্ধ, করো ক্ষমা ॥
১ জুলাই, ১৯৫৯

## মধ্যিখানে চর

মধ্যিখানে চর।
এদিকে শিশুরা খেলে বালকেরা মাতে,
অন্যদিকে জীর্ণপ্রায় খাতে
বৃদ্ধদের গঙ্গাস্নান।
মধ্যিখানে দুস্তর বছর।
এদিকে সরল প্রাণ কলকণ্ঠ গান,
নির্ভীক ও নিঃসংশয় মর্ত্যে যেন অমরার পেয়েছে সন্ধান।

মধ্যিখানে চর।
ওদিকে মৃত্যুর খাতে মরিয়া জরার
বিষঙ্গে ভঙ্গুর স্বার্থে ঘৃণাজীবী পণ্যলোভী সন্ত্রাসের স্নান,
কিছুতে মানে না নিজ অন্তিম প্রহর,
কর্দমাক্ত পুণ্যে ভাবে ফিরবে বছর।

বৃদ্ধেরা নির্লজ্জ হলে মানুষের বড় অসম্মান,
লজ্জায় শুকায় নদী,
চড়ায় দুপারে পচে যায় গ্রাম ও শহর ॥
৬ জুলাই, ১৯৫৯

## মেঘলা দিন

বিদ্যুৎ সওয়ারে আর বজ্রের মাহুতে
স্ফূর্তির কী রেশারেশি আকাশে আকাশে,
প্রকৃতির শক্ত খেলা, উদ্‌গ্রীব পৃথিবী
দেবে সুখে থরোথরো, গ্রীষ্মবদ্ধনীবি
স্বেদাক্ত সুন্দরী ভাবে তৃষ্ণার্ত বাতাসে
এবারে বাঁধবে বৃষ্টি আপন বাহুতে,

যেন কাদম্বরী ভাবে বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষে তার জাগে !

যৌবনের প্রতিদ্বন্দ্ব আকাশে বাতাসে
যেন দেবদেবী মাতে দৈবত শৃঙ্গারে,
ঝড়ের বিপ্লবে ভেদ পালায় সন্ত্রাসে,
হর হয় হরি আর রাধিকা করালী,
শ্যামঅঙ্গে গৌরী তাই কুলে দেয় কালি ।

কাদম্বরী ভাবে যেন বিধুর সংরাগে
এবারে কি চন্দ্রাপীড় বক্ষ তার মাগে !

মহাশ্বেতা প্রাণ আনে প্রেমের ভৃঙ্গারে ॥
১২ জুলাই, ১৯৫৯

## পার্কে

পেনশন ফুরোয় পাছে, পার্কে তাই, দীর্ঘজীবী, হাঁটি নিয়মিত,
অল্পস্বল্প গল্প হয়, কেউ ভক্ত ঈশ্বরের কেউ ইংরেজের,
কংরেজি শাসনে প্রায় সবাই হতাশ, আর লাল পীত
রুশচীনে সন্ত্রস্ত উৎসাহ, তিব্বতও শুনেছি পার্কে
ছিল ইংরেজের, এখন কারোই নয়, পঞ্চভূতের, অথবা খাস ভারতের

মাঝে মাঝে এই সব শুনি বসে, তবে হাঁটা-টাই বেশি
লাঠিতে বাগিয়ে মুঠি, নিঃশ্বাস- প্রশ্বাস চলে টার্‌মাক মেজের
পিঠে বাটার রবারপায়া দ্রুতপদ ফেলে, যদি পাকস্থলীটার পেশী
বার্ধক্য-বিজয়ী হয়—ইংরেজের মতো কিছুকাল,—কেউ স্ফীত, কেউ রোগা
কেউবা উপোসি নীল পিকাসোর ইহুদির মতো, কেউবা বর্তুল
যেন এঁকেছেন লেজের, আপিসে অর্জিত মেদ কিংবা আড়তের,
কপালে শর্করা রোগ কারো কফপিত্তে কারো রক্তচাপে ভোগা।

ছেলেদের খেলা দেখি. জীবনের সব লক্ষ্যভেদ যেন তারা
এক ক্ষিপ্র লক্ষ্যে বাঁধে ; বেশ লাগে দলবদ্ধ কিশোর আগ্রহ,
একটু বা ভয়ে দেখি, কেননা হঠাৎ বল মাঝে মাঝে ছোটে দিশাহারা,
গায়ে লাগে, এঁকে দেয় পেনশনের শার্টে কোটে পঙ্কের ভূষণ।
তার চেয়ে ঢের বেশি প্রতিদিন চোখ যায় এদিকের ঘাসে
যেখানে শিশুর মেলা, কেউ কোলে, কেউ হাঁটি-হাঁটি করে হাসে,
কেউবা গাড়িতে বাঁধা, প্রচ্ছন্নগম্ভীর, অসহায়, সর্বংসহ,

সবাই প্রজ্ঞায় স্বচ্ছ, যেন ভারতের জীর্ণ দীর্ঘ ইতিহাসে
এরাই একাল থেকে সেকালের মোগলপাঠান মৌর্য বা কুষণ
বহু মৃত্যু দেখে দেখে চলে যায় অনাহত খেলার প্রত্যয়ে
ভবিষ্যতে, যা এদের বর্তমান, এরা যার পুষ্টি ও পুষন।
এই সব ফুল-ফুল শিশুদের প্রতিদিন প্রত্যেক হৃদয়ে
সর্বদাই জন্মদিন, পৃথিবীর মানুষের প্রত্যেকটি মন
রূপান্তর পায় এই জন্মে, মৃত্যু হয় পূর্ণতার পাকা ফল
স্বাভাবিক, নিয়মিত. নিষ্কলঙ্ক মৃন্ময়ে চিন্ময়ে ॥

২০ জুলাই, ১৯৫৯

## দেখেও লাগে ভালো

দেশবিদেশে শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে বটে
রূপবতীর ভিতরে রোগবীজাণু বাঁধে বাসা,
আবিল দেহে বহু ময়লা নানা রকম কীটে,
তাছাড়া আছে সতী-অসতী প্রশ্ন সঙ্কটে,
মেজাজফেরও প্রায়ই ঘটে যখন যায় মিটে
মোহিনী-মায়া, রুদ্ধ হয় পদাবলির ভাষা।

তবুও দেখি সিনেমাঘরে পার্কে ময়দানে
ট্যাক্সি চেপে ট্রামে বাসেও চলে প্রেমের আশা
ঘেঁষে বসার তীব্র সুখে আলাপ মুখে কানে ।
যৌবনের যুগল রূপ যযাতিকেও টানে ।
কারণ প্রেমেই যৌবনের বিধুর সত্তায়
ব্যক্তি হয়ে সমষ্টিও, হৃদয়বত্তায় ।

শাস্ত্রে ঠিক কথাই বলে, কালের চালু নীতি
এই কথার সমর্থক, উল্টা দিকে ঘেঁষে ;
কারণ আজ উন্নতির ফোঁপরা বুলি শিখে
এই কথারই ছদ্মবেশ দুর্গতের দেশে ।
কারণ নাকি : সমস্যাটা প্রজাপতির স্ফীতি,
জমির আর মেহনতের অপচয় বা ক্ষতি
তুচ্ছ অতি, সহায় শুধু উদার তেজারতি !
তাই মনের ইন্দ্রধনু সে নাকি জৈবিকে
এবং যাকে ফুর্তি বলে তাকে ফুরায় শেষে ।
যৌবন কি ওষ্ঠাধরে ম্যাজেন্টার শোভায়,
অভিসার কি ক্ষান্ত আজ নব্য কাসানোভায় ?
তবুও এরা যৌবনের রংবাহার আলো
দুঃখে সুখে খাঁচায় জ্বালে, দেখেও লাগে ভালো ।

যদিও নেই হেলেন, নেই মেহেরউন্নিসা,
মহাশ্বেতা খোঁজে কালের অন্ধকারে দিশা ;
এটাও ঠিক, নেই ট্রয়ের কাসান্দ্রার প্রাণ,
শাহীবাগের চেরাগ নেই বুলবুলির গান ।
সুতরাং যে বিশবাইশে শ্রাবণ মেঘে বাহার
এরা ছড়ায়, বৃদ্ধ মন রঙিন তার আভায় ।
এরা মাতে না জীবন ফেলে মান-উন্নয়নে,
তাই এদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিটি দিবানিশা ।
আশা রাখে না জীবিকা চেলে দিল্লি সবকারে,
কষ্ট করে কলকাতার আহত নন্দনে
একান্তের মদির টানে কাটায় গুঞ্জনে,
একান্তের মুক্তি চায় তীব্র দেহমনে,
মানে না দেশ অগ্নিগিরি , হতাশ্বাস লাভায়

সর্বনাশ পায়ের নিচে, তাই তো সংসারে
অকুতোভয় স্বপ্ন পাতে ; ক-টা মুখের আহার
জোগাতে হবে, ডরে না তাতে ; চার চোখের আলো
শ্রাবণাকাশে সন্ধ্যা জ্বলে । দেখেও লাগে ভালো
এরা আমার শরীরী স্মৃতি, হৃদয়সন্ধানে
এরাই বুঝি বহু জরায় নবজীবন আনে ॥

৩০ জুলাই, ১৯৫৯

## নান্নুরে

জাদুঘরে পরিষদে তর্ক চলে ছাতনা বা নান্নুরে
কোথায় চণ্ডীর পীঠ বা কোন্ চণ্ডীদাস !
বিশ্ববিদ্যাবৈদ্য হয় থীসিসের কেতাবে খেতাবে—
আষাঢ়ের সন্ধ্যা মেশে বৈশাখের আকাল দুপুরে,
পদাবলি কেঁদে মরে, রাধা ভোলে আপন কানুরে ,
প্রেম ভয়ে দেশ ছাড়ে, ভুলে যায় প্রেমের তিয়াষ ।

দেখেছি গড়খাই-পারে দিঘি, সেই ধোবানি পাথর,
তামার আঁধার হাতে বিশালাক্ষী তাকিয়ে ভাস্বর,
ছায়াঙ্গী নায়িকা নাচে কীর্তনের বিধুর রেখাবে,
স্পষ্ট শুনি গান মেঘে মৃদঙ্গের নক্ষত্র আখব ।
এদিকে কাঁপন লাগে পাপড়ির আঙুলে সুরে সুরে,
প্রেমের ফাঁসিতে খুলে ফুল ফোটে বিশাল বাওবাবে ॥

১০ অগাস্ট, ১৯৫৯

## আলেখ্য

(জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র-কে)

যে চঞ্চল, যে সুদূর তাকে চির করেছে পিয়াসী,
যে বুভুক্ষু খুঁজে ফেরে তীব্র নবজীবনের গান,
যে স্বপ্নের প্রতিষ্ঠায় চিত্ত তার অশান্ত প্রয়াসী
যার সুর মর্মরিত অহর্নিশি তন্নিষ্ঠ হৃদয়ে তার ,
কারণ এনেছে সে যে গান আকাশে পাতিয়া তাব কান
গম্ভীর পৃথিবী যার মৃদঙ্গে নিয়ত বলে : ধ্যান ভাঙো ধ্যান
একটি আকাশ ভেঙে হাজার আকাশ, হাজারের এক নীলাকাশ

সেই স্বপ্নে সে ভরেছে উদ্‌গীথউত্থিত তার ধ্যান ।
তার মনে পদ্মার প্রবল ঢেউ, শুভ্র চরের প্রসার,
খরপ্রাণ কলকাতার দুরন্ত বিস্তার,
আড্ডা সভা ধর্মঘট মিছিল উৎসব গণনাট্য গান
মন্বন্তর দেশভঙ্গ অনাচার জীবিকার ক্লান্তি আর কাজের উল্লাস
ঢেউ তোলে কবিতার গানে যৌথ শিল্পের বিন্যাসে ।
আজও তার শান্তি নেই দিল্লি মফস্বলে পাহাড়ে জঙ্গলে
হরিণের নৃত্যভঙ্গে, পাখির বিস্তর আর বিচিত্র সম্ভার
আনে না মনের তৃপ্তি, নানা চর্চা, মানবিক নানা কৌতূহলে
আজও তার মনের পরিধি ভাঙে জীবনের দ্বিধান্বিত ব্যাসে
নানান বেসুরে, বেতালের কূট ভেদাভেদে, অসম্পূর্ণতায় ।
তাই সে কবিতা লেখে খাতায় বা ছেঁড়াখোঁড়া টুকরো পাতায়
তারপরে ভুলে যায় মমতায় লিখেছে যা এবং হারায় ।

সম্পূর্ণের ঘোরে তাই খেয়ালি সে কবি সে উদাস
আত্মভোলা মজার মানুষ সে আর্টিস্ট যাকে বলে,
আশেপাশে মানুষের চিত্ত কিংবা বিত্তশূন্যতায়
সে ভাবে মনের আর জীবিকার জীবনের
স্বর্ণযুগ এল বুঝি সকলের ঘরে সচ্ছলতা অবকাশ
উষার আলোয় পাহাড়ে শিখরে নদীতে সন্ধ্যায়
রবীন্দ্রসংগীতে। পূর্ণ আনন্দনির্ঝরে ।
তাই নিজেই কবিতাকার সুরস্রষ্টা আর
প্রেরণার ইতিহাস খুঁজে পায় নিজ কণ্ঠস্বরে
রবীন্দ্রনাথের গানে প্রাণমূর্তিদানে ।

কারণ সারাটা দেশ গান করে তার মনে
কবিত্বের বিভোর-ভুবনে
ধ্রুপদে টপ্‌পায় কীর্তনে বাউলে ভাটিয়ালি কাওয়ালিতে
জারিগানে সারিগানে যাত্রায় গাজনে তুলসী দোঁহায়
সবেতে সে আগমনী শোনে আর গায়।
তাকে আমি বহুকাল জানি।

দেখেছি কেমন তার মন খোঁজে গানে দেশের মানুষে
পাখিতে হরিণে জলে বা পাহাড়ে পদ্মার গঙ্গার পাড়ে
কারণ প্রকৃতি এই নিসর্গসুন্দরী আর বীণাপাণি
তার মনে একটি প্রতিমা—সতীই পার্বতী
একটি পৃথিবী একটি আকাশ
তাই ধ্যানের মানুষ হয় হাজার মানুষ, ভিড় ;
নবজীবনের গান হয়ে ওঠে সঙ্ঘের আরতি,
কারণ নাহলে তার সুদূরপিয়াসী মন
কোটি কোটি মানুষের প্রত্যহের মর্মভেদী কান্নায় কান্নায়
প্রতিবাদে কিংবা প্রতিবাদের অভাবে সারাক্ষণ
কেবলই ব্যাহত হয় নিঃসঙ্গ-নিবিড় ;
সে চায় সবাই একটি চঞ্চল সুদূরপিয়াসে
প্রত্যহ করুক গান
জীবনেরা ডানা পাক জীবিকার বন্দী পায়ে পায়ে।
তাই সে চঞ্চল তাই বিধুর উদাস কবি সুরস্রষ্টা গীতকার,
তাই তার গায়কিতে আধুনিক চৈতন্যের আতত সম্ভার !
আমাদেরই প্রতীক সে প্রিয়জন, অসহায়, আত্মভোলা,
সকলেই তাকে ভালোবাসে ॥

১৫ অগস্ট, ১৯৫৯

## সে ও এরা

রাত্রে তার জন্মলগ্ন
অন্ধকারে সে স্থির নির্ভয় ।
পশুর ও মানুষের মর্ত্যলোকে প্রাথমিক তার যে উদ্বেগ,
সদ্য সেই শিশুর বিষাদ, সেই মৌল নিঃসঙ্গের ত্রাস
এতই প্রবল ছিল তার, যে এখন কোনো
শৌখিন সংশয়ী ভেক,
আমদানি হঠাৎ-নবাব কোনোই বায়না
নব্যভব্য স্বার্থজাত তথাকথিত মনন-ব্যবসায়ী কোনো প্রতিবাদ,
আবশ্যিক মৃত্যুর বা ধ্বংসের উল্লেখ
তাকে আর কাঁদায় না হাসায় না,
বড়জোর হয়তো সে বলে : ধিক্ ধিক্ !
অবচীন বায়সেরা গ্রাম্যতার ময়ূর ডম্বরে
সরল বাহুল্যে মাত্র ব্যর্থতায় তাকে ক্লান্ত করে ।

রাত্রে তার জন্মলগ্ন ।
মাতৃসম অন্ধকারে তাই সে নির্ভীক
জন্মমৃত্যু সেতুবন্ধে এসেছে সে, তাই সে নিশ্চিত ।
নূতন জন্মের নীল প্রচণ্ড বিষাদে
তার হয়েছিল কিনা চৈতন্যের **উজ্জীবন**
জীবজগতের আর মানবিক সবচেয়ে মৌলিক বিপ্লবে,
তাই রূপান্তরে জীবনে বিপ্লবে নিঃসংশয় সে,
বিষাদউত্তীর্ণ তার আশা,
অন্ধকারে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র-উৎসবে
অটল আশ্বাসে তার মননের লুনিক সংবিৎ ।
তার মন বা তার জীবন অনেক দ্বান্দ্বিক মৃত্যু পার হয়ে
বহু পাপপুণ্য বহু স্বার্থ আশা হতাশার পরে
করেছে জটিল যাত্রা ।
তাই তার বৈদগ্ধ্যের ভাষা, দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ তার মাত্রা
নব্য ভব্য গ্রাম্য এরা বোঝেই না—
এরা যে অজাত-মৃত আজও ।
অখাদ্য বিলাসে ভরে প্রাণের মরাই
জন্মমৃত্যু নিয়ে কেন এদের বড়াই ।
এদের গন্তব্য-অন্তে তার যাত্রা শুরু
জন্মের মৃত্যুর দীর্ঘ রূপান্তরে

আদি অন্ধকার থেকে
সে যে উষাউষসীকে ডেকে দিনরাত্রি উত্তরণে বছরে বছরে
আদিম ধৈর্যের প্রাজ্ঞ আলোকে বেঁধেছে
তার বাসা ॥
১৫ অগস্ট, ১৯৫৯

## বসেছিল চুপ

বসেছিল চুপ, ভাবছিল বসে, ভাবছিল কিছু, কোন্
ভাবনায় মাথা হয়েছিল বাহুবদ্ধ ।
দুই বাহু বাঁধা জঙ্ঘায়,
মনে হল যেন সব কিছু ফেলে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে
দূর নীহারিকা স্তব্ধ মনের আকাশে ।

তারপরে কাজে, ঘরের কাজে, বা বাইরের—
সে করেছে ঘর বাহির, বাহির ঘর !—
কাজের আবেগে চলে ফেরে ঘরে বাইরে
অগ্নিপুঞ্জ ছড়িয়ে চলে সে বিশ্রামহীন উচ্ছ্বাসে
সঞ্চারিণী সে পল্লবিনীর পায়ের প্রতিটি পাতায়
আকাশ ভরেছে সূর্যে সূর্যে উল্লাসে ।

শুধুই কি তাকে জ্যোতির কেন্দ্র বলবে ?
অবশ্য তার সান্নিধ্যেরও তাপে
হৃদয় ছোটায় এবং হৃদয় গলায়—
হৃদয় ? ছোটে সেই স্বয়ং হিমগিরির কন্যা !
সে যেন এক স্তব্ধ চূড়া
নন্দাদেবী কিংবা বুঝি কাঞ্চন যার জঙ্ঘায়,
যখন থাকে চুপটি করে বসে,
যেমন ভাবি আমিও ঠিক থাকব ।
তারপর সে আষাঢ়-বন্যা বৈশাখী শেষ করে
যখন নামে গঙ্গায় ।

আশ্বিনের এই প্রথম দিনে
কপিলগুহায় সাগরদ্বীপে আবার চিনে ডাকব ॥

## অনুপ্রাস অন্ত্যমিল

দিগন্তের কণ্ঠে নীল দূরের সুর
সে পাণ্ডুর আভায় দিনরাত্রি নীল রেশে বিলীন ।

আর পাহাড় মালার মতো দিগ্বধূর কণ্ঠলীন মেদুর নীল
দীর্ঘ মৃদু নীড়ের মতো গৃহস্থের মেয়ের মতো নীল পাহাড় ।

চোখের চালে আমিও চলি যেন বা হাতে হৃদয়ে চাই ।
এই বাহার, বনরাজির নীলার হার ।

কোথায় নীলা ? হরিৎ গাছ শ্যাম সরস
নয়নারাম নানা সবুজ স্বচ্ছ ঘন । আর পাহাড়

কঠিন শত জ্যামিতি কষা মেটে ধূসর হীরাকষের
রসানে কালো । আর মাথায় হীরকধার নীল আকাশ ।

নদীর স্রোতে স্বচ্ছতায়
চোখের পিছু আমিও যাই ।

উপরে কালো চূড়ার চোখে অপাপনীল অশ্রু জল
আকাশধোয়া হ্রদ, স্বচ্ছ স্ফটিকে মেশে ইন্দ্রনীল ।
পাড়ের পাশে দূর্বাদিল মরকতের কোমলতার
বাহার দেখি অহল্যায় তারল্যের বর্ণাভাস ।

পেয়েছি চেনা মানুষে এই অনুপ্রাস, সমতলের অন্ত্যমিল ।
মানসে তাই আশ্বিনের নীল আকাশ
এখানে এক গ্রামশহর সুস্থ ধীর নয়নারাম ॥

২৮ অগস্ট, ১৯৫৯

## উজ্জীবনের স্বপ্নসদ্য চক্ষে

উজ্জীবনের স্বপ্নসদ্য চক্ষে
কদম্বঘন রোমাঞ্চকর স্নেহে
জাগবে না তুমি চন্দ্রাপীড়ের বক্ষে ?
অচ্ছোদমনে অনচ্ছ নবদেহে,
সুন্দরী তুমি সত্যেরই শুভস্বপ্ন ।

পূর্ণিমা-ভোরে আবার উষসী নগ্ন
তোমাতে দেখেছি মানবিক কেন দৈবও,
কেন বা তূর্ণ আত্মা আদিম জৈবও,
তোমাতেই পীন হিমগিরি দুটি উপমা,
কেন বা নয়নে নক্ষত্রেরা লগ্ন,
শিলা-ভঙ্গিল ভূগোল তোমাতে মগ্ন,

বাস্তবে আর মনসিজে চিরদ্বৈতে
অচ্যুত তুমি মানবমনের দয়িতা,
তোমার আলোকে কটালদ্বন্দ্ব বইতে
কী-বা আনন্দে গেয়েছি গেয়েছে চেতনার সংহিতা,
নন্দনে তুমি চন্দ্ররচিত স্বপ্ন ।

উদয়াস্তের সূর্যে তোমাতে বিবাদী চক্ষুকর্ণ ,
অথচ তোমাকে প্রত্যক্ষেই দেখা যায়,
প্রত্যহ তুমি মূর্ত প্রকৃতি মুখরিত সত্তায়,
তুমি যে সত্য সে কথা বুঝেছি রক্তে সপ্তবর্ণ
ইন্দ্রিয়ময় মননে অস্থিমজ্জায়,
অথচ তোমার হাতে দশমিক পলাশে সদা হিরণ্য
আমার হৃদয়, জরাযৌবনে, নবান্নে কিবা চৈতে,
কিংবা আষাঢ়ে ঝুলন আশার পুলকে
কামনা যখন বৈদেহী ওড়ে দ্যুলোকে ।
জানি তুমি স্বীয় স্বভাবে দোদুল প্রিয়া,
মেদিনীরই তুমি অগোচর আইডিয়া ।
উভয়ত তুমি সেতুবন্ধনে চিরবনবাসী স্বপ্ন—
সনাতন এক অবাকশাখায় মিলিত দুই সুপর্ণ ।

তাই ক্ষোভ নেই নেই অকালের অনুতাপ,
কারণ তোমার বাস্তবতাই যেন দৈনিক অন্ন
তদু নাত্যেতি কশ্চন
বুভুক্ষু দেশে জীবনের মূল সত্যে।
চিরঅধরার আধার তোমাতে বাকি সব অভিশাপ,
বাকি সব কিছু ব্যাবসার লোভী পণ্য
জঘন্য বর্বর।

তুমি শাশ্বতী ববাঙ্গ প্রাণে ভাস্বর,
পবমান তুমি পূর্ণিমা দেহী মর্ত্যে,
জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায় তুমি কোজাগব,
তোমার রাত্রে তীর্থযাত্রী করেছ সূর্যাবর্তে,
সুন্দরী তুমি প্রাকৃতিক প্রেমে মানসে ভোরাই স্বপ্ন ॥

## পান্তভূত

জাগছে কত ছোটবেলার স্মৃতি
আমবাগান লোপাট হল ঝড়ে,
সেবার বানে কী তছনছ গ্রাম :
কত কথাই শহরে মনে পড়ে,

গ্রামের ছেলে, গ্রাম্য নানা ভীতি—
সেই যে যারা পিছন-পানে হাঁটে
আঁধারে যার বলা যায় না নাম—
আর সে যারা পরের সিঁধ কাটে,

আর ডাকাত ঝোলে যে ফাঁসিকাঠে
তাদেরই দেখে আজকে কেন শহরে
নানান রূপে ওসারে আর বহরে—
ফাঁসির কাঠই মোটা গলায় ঝোলে,

আগডালে পা ঝুলিয়ে যারা দোলে,
সিপাই কাঁধে তারাই পিছু হাঁটে,
ঝড় নামায় আমবাগানে ঘরে
গন্ধ পেলেই মানুষ মারে সাঁটে
হাঁউ-মাউ-খাঁউ রূপতরাসী বোলে।

ছোটবেলার পান্তভূতের স্মৃতি—
কবন্ধ কি জ্যান্ত হল শহরে ॥

১১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

## সুচিত্রা মিত্রের গান শুনে

বাগান ভরেছে, ফুলে, আলোয় আলোয়.
শাদা, লাল, নীল, হলুদ, নানান রঙে ফুলে ফুলে ফুলময়।
আর পল্লবেও, হরেক সবুজে, আলোর সরস স্পষ্টতায়।
সমস্ত বাগান ছেয়ে রং আর গন্ধের বাহার,
বাগানে, ঘরেও, বাহিরে অন্দরে, জানালায় বারান্দায়
টবে ছাতে সর্বত্র গন্ধের ইন্দ্রধনুর সম্ভার,
বর্ষার শান্তির আর সচ্ছল হিমের আসন্ন হাওয়ায়
পাপড়ির বিচিত্র ঢঙে, কেশরের নানাভঙ্গে সাজে।

কে বলে কয়েক বিঘা!
ভিতরে থাক তো দেখো, মনে হবে
সারাটা পৃথিবী যেন খুঁজে পাওয়া যায়
অক্টোবরে প্রাণের গৌরবে জানালায় বারান্দায়
আর বাগানে উঠানে, যেমনটি পাওয়া যায় গানে গানে
পলি বালি জলে ধোয়া সোনার বাংলায়।
আকাশের নীল তীরে অসীম উজানে যে বাঁশি বাজায় তাতে
চোখ ভাসে ফুলের হাওয়ায় মুক্ত রঙ্গে দুলে দুলে!
পশ্চিমের পাহাড়ের কঠিন ভঙ্গিমা
সীমা পাবে আঁকাবাঁকা ফুলমতী-পাড়ে,

এমন কি পাঁচিলের পারে লাল পথটাও
রঙের বিন্যাসে মনে হবে উল্লসিত ইতিহাস,
অন্য এক সাহসের সেজানের আঁকা ।
বর্ষার অশ্রুতে আর রৌদ্রের ধিক্কারে
মানুষের সঙ্কল্পে ও প্রেমে শ্রমে
সোরা ক্ষার সার হাড়ের ধুলায় ক্রমে ক্রমে
আমাদের বাগানের আশ্চর্য ঐশ্বর্য এই
কয়েক হাজার মৃত্যুঞ্জয় গাছ আর লক্ষ লক্ষ ফুলের মহিমা
ঘুরে ফিরে চোখের বিরাম নেই, ঘ্রাণেরও,
নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে নেই বুঝিবা বিশ্রাম, প্রাণেরও,
যেদিকে তাকাই সবুজ আস্তরে থরে থরে
রঙে গন্ধে কলিজা অবধি প্রাণ ভরে ।
এমন কি চোখ যেন গান করে
পাহাড়ের কষ্টিতে, লাল পথে,
আকাশের নীল স্রোতে, শরতের অশরীরী শুভ্র মেঘে,
যে দিকে তাকাই গান, রঙে গন্ধে গান আর গান,
না শুনে থাকাই ভার, থামিয়ে রাখাই ভার ।
সারাদিন ধরে এই ভোরাই ভয়রোঁয,
রাখালি সারঙে কিংবা ঘরেফেরা পূরবী খাম্বাজে ।

কয়েক হাজার গাছে নানা সাজে এল অক্টোবরে
আনন্দ, আনন্দই বা প্রত্যাশী প্রসাদ,
শিশু, বৃদ্ধ, মেয়ে বা পুরুষ প্রত্যেকের দেয়
আর প্রত্যেককে দেয়,
বাগানে বাগানে ঘরে ঘরে
যেন সে বিজয়ী বধির আপ্লুত সংগীতের
—বেনেডিক্টুস, বেনেডিক্টুস—
সামগ্রিক ঐশ্বর্যের যুক্ত সপ্ত স্বরে
মানবিক উত্তরণে মনের বৈভব ।

জানি এর তলে তলে বহু অশ্রুভরা বেদনায়
বহু মৃত্যু আকুলতা, বহু স্মৃতির আমেজ,
দূর ও নিকটে বহু দীর্ঘ ইতিহাস, সুদূরের মিতা ওগো মিতা,
মেঘ রৌদ্র, রক্তময় শ্রম, গবেষণা, অনেক দিনের চিতা,
ধুলা, মাটি, ছাই, বহু হাড়ের পাহাড় অন্তরে অন্তরে

জানি ফুল মাটির জঠরে, পৃথুল তিমিরে চেতনায়
খোঁজে আপন আকাশ।
কাঁকরে কাদায় শিকড়ের গোপন বিস্তারে
প্রাণ পায়, চলে যায় নিরেট মাটির ফাঁকে
বিকাশের অন্ধকারে, এমন কি পাললিক স্তরে,
এমন কি আগ্নেয় স্মৃতির গ্রানিট্ পাথরে,
হাতে হাতে পায়ে পায়ে শিকড়ে অঙ্কুরে
জোগায় রঙের গন্ধের রসদে রসদে সরস
অবশ্যম্ভাবিতার অবাক্‌শাখায় পরাগের ঊর্ধ্বমূল স্তব।

আমরাও জানি তা, ভাবিও তাই যে,
তাই মনে রং ধরে সুগন্ধে ঘনায় রবীন্দ্রসংগীতে
নন্দিত জীবনে নির্ভীক অজস্র রঙে ফুল ফোটে
সার্থক জন্মের মাগো শিকড় ছড়ায় বাহিরে ও ঘরে
সর্বত্র বাস্তব,
অলৌকিক বাগানে অন্দরে অন্ধকারে পাথরে কাদায় ভিজে
অন্তরে অন্তরে গানে গানে মাটিতে কাঁকরে জীবনের ভিতে ॥

২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯

## এ আর ও

'স সর্বেষু লোকেষু সর্বেষু ভূতেষু সর্বেষ্বাত্মন্নমত্তি।'—ছান্দোগ্য উপনিষদ

ও ঢাকে সত্যের মুখ হিরণ্ময় হৃদয়ে, আকাশে
সূর্যকে লাঞ্ছিত করে অনৃতের অসুস্থ ধোঁয়ায়,
অস্পষ্ট মানসে দিনরাত্রি ঢাকে শ্মশান-উচ্ছ্বাসে,
কারণ মৃত্যুর মাঠে জন্ম ওর ক্লান্তির রোঁয়ায়।
আর এর দেহমন অক্ষত, অচ্যুত, নিঃসংশয় ;
মৃন্ময়ীর বাহু স্নিগ্ধ ছিল এর জন্মের সময়,
তাই এ অপাপবিদ্ধ ; খোঁয়ারিতে ও যবে গোঙায়
এ হাসে, প্রাকৃত জন স্বাধীন কি খণ্ডিত ভঙ্গিতে ?

এ জানে কর্ষিত মুক্তি সর্বেন্দ্রিয়ে দু'হাতে আশ্বাসে
মনন যেখানে স্বস্থ প্রত্যহের তৎসৎ বিশ্বাসে :
নিষাদের সংস্কৃতিই মহাকাব্য সীতার গণ্ডিতে ।

তাই এ দিনান্তে শ্রান্ত, ঘরমুখো । এর শুধু পেশী
কর্মক্লান্ত, তাই গোধূলিতে গার্হপত্যে ফেরে, ঘুম
ঘর চায়, ঘরনী ও পুত্রকন্যা, অন্নের আরাম ।
সূর্যের আরম্ভে তাই এর শুরু স্বচ্ছ প্রতিদিন ।
আর ওর ক্লান্তি হল প্রারম্ভিক, আজন্মনিঃঝুম
গোধূলিতে কৃত্য শুরু, ক্লান্তি থেকে কর্ম, ভিন্‌দেশী
বিচ্ছিন্ন অদ্ভুত, তাই দৈনিক সে দিয়ে যায় দাম
মৃত্যুর মোদক কিনে, জীবনে সে জীবে প্রেমহীন ।
স্নায়ুর শূন্যের ক্লান্তি, তাই তার ক্রিয়া অকর্মক
নিরুদ্দেশ, বিভক্তিতে ভুলে গেছে কর্মের কারক ।

এতে ওতে মুখোমুখি হলে হাওয়া হিম হয়ে যায়,
বর্ষার নির্জলা দেশ, শিশিরে গঞ্জিত নেশা জ্বলে ।
ও যবে বক্তৃতা দেয় আধিগ্রস্ত কবন্ধ কৌশলে,
নীলাকাশে মুক্ত এর হাত চলে লাঙলে চাকায় ॥

## দামিনী

সেদিন সমুদ্র ফুলে ফুলে হল উন্মুখর মাঘী পূর্ণিমায়
সেদিন দামিনী বুঝি বলেছিল —মিটিল না সাধ ।
পুনর্জন্ম চেয়েছিল জীবনের পূর্ণচন্দ্রে মৃত্যুর সীমায়,
প্রেমের সমুদ্রে ফের খুঁজেছিল পূর্ণিমার নীলিমা অগাধ,
সেদিন দামিনী, সমুদ্রের তীরে ।

আমার জীবনে তুমি প্রায় বুঝি প্রত্যহই ঝুলন-পূর্ণিমা,
মাঘী বা ফাল্গুনী কিংবা বৈশাখী বাস বা কোজাগরী,
এমন কি অমাবস্যা নিরাকার তোমারই প্রতিমা ।

আমারও মেটে না সাধ, তোমার সমুদ্রে যেন মরি
বেঁচে মরি দীর্ঘ বহু আন্দোলিত দিবস-যামিনী,
দামিনী, সমুদ্রে দীপ্র তোমার শরীরে,
তোমার সমুদ্রে আর শরীরের তীরে ॥
১১জানুআরি, ১৯৬০

## বন্যা

নদীর পাড়ে থমকে যাই, শাল পিয়াল বনে
কিসের গান হঠাৎ শুনি, কে গায় আনমনে.
লেগেছে হাওয়া, হাওয়ার গান, গাছের জোর দোহার
ডালপালার পাতার নাচ শাল পিয়াল বনে,
বাহুর দোলে হাতের তালে কোন্ পরব্ পালে।
নদীর পাড়ে থমকে যাই নীল শরৎকালে,
থমকে যাই পাছে থামায় আত্মভোলা বাহার
ভিনদেশীকে দেখে আপন ভিড়ে পরব্‌কালে।
জানি না কোথা পা চলেছে, পাড়ের পাশ ঘেঁষে
কখন গেছি ভিড়ের পাশে মুগ্ধ বোবা হেসে,
শাখার নাচে পাতার গানে দেখি চন্দ্রহার
দোলায় এ কে ? দেহের নাচে মুখের গানে কে সে
বনেরই মতো বাহুর দোলে হাতের নাট্যমে
কিন্তু সারা দেহের বেগে পায়ের তালে সমে
একলা নাচে গাছের ভিড়ে, বিভোর মুখ তার
মুগ্ধ দেখি, সারাটা বন এগিয়ে আসে ক্রমে ॥
১৭ ডিসেম্বর, ১৯৫৯

## কথা ক'টি

মনে মনে যদি পাহাড়চূড়ায় আকাশের মুখোমুখি
সেই কথা বলো অবিরাম বেদ-গানে উদাত্ত স্বরে,
তাহলে কেন যে বলবে না ফের মুখর শহরে ঘরে ;
ক্ষতি কিবা যদি তাতে হই আমি সুখী ?

ট্রাফিকে তোমার কথা উড়ে যাবে ভাবো কি ডীজ্‌ল ধোঁয়াতে
আকাশের কথা পাহাড়ের উঁচু শিখরের কথা ক'টি ?
অথচ তোমার গলাই যে শুনি কাজে-ঘুমে, তারই দোয়া-তে
কানে কানে বলি : আমার হৃদয় জান না পঞ্চবটী
তোমার পাহাড়ে আমার আকাশে তোমার সে কথা ক'টি ?

## অন্ধ ঝোঁকে

যে মনে মানুষ খোঁজে অন্ধকার স্নায়বিক ঘোরে
মৃত্যু, একঘেয়ে ঘোরে ভাবে আত্মহত্যাই কেবল
তার সমাধান, সেই লুপ্ত মনে চলেছে অনেক পথ
অনেক ঘণ্টাই অন্যমনস্কের অতিকায় জোরে ।
হয়তো বা কোনো বাঁকে থেমেছে ক্ষণেক
উদ্‌ভ্রান্ত বিরাগে, স্তব্ধ অথচ উৎসুক যেন অচেনা জঙ্গল
অজানা কাঁকর মাটি পাথরে পাথরে,
কোনো ইশারাই নেই চেনাশোনা মালার্মের প্রতীকের
শূন্য নিরাশায়, যেহেতু বুঝেছে প্রাণ যাবে না পাশায়
কোনো ইন্দ্রপ্রস্থে কোনো জতুগৃহে কোনোদিন ।
চলেছে হাঘরে ঘোরে,

লক্ষ্য একেবারে ভ্রষ্ট, রৌদ্রের সর্বতোভদ্রে তাই লক্ষ্যহীন
মৃত্যু কিংবা আত্মঘাত চেয়েছে সঙ্গিন ।

শুধু অন্ধ ঝোঁকে চলে, মনে নেই ঠিক সে কখন
থেমেছে যে, বসেছে দাওয়ায়, সে যে কার ঘর শালবনের কন্দরে ।

দেখে, ঘর। গৃহস্থেরা কেউ নেই, উঠানের কোণ
নিকানো, আহ্বান করে স্পষ্টতই, ওপাশে ইঁদারা
ক্লান্তিহরা, কাছে দুটি ঘনপত্র কাঁঠালের চারা।
ওদিকে শিরীষগাছে ছেয়েছে আকুল
গন্ধময় ফুল, আর ঐ বটে বুঝি ঘনিষ্ঠ আদরে
গৃহস্থেরা সুখী হোক দুটি পাখি ডাকে এক স্বরে।

এই শুধু মনে পড়ে, শেকসপিঅরের শ্লোক যেমনটি পড়ে
নাটকেই উৎসারিত অথচ যেন বা বিশুদ্ধ কবিতা।

তারাই পৌঁছিয়ে দেয় তাকে ফের সন্ধ্যাবেলা
শহরের শৌখিন নিগড়ে ॥

## সুস্থ থাকে মন

বনে বনে সুস্থ থাকে মন।
বটে, অশোকে, পিপুলে, শালে, পলাশে, শিমুলে।
ঋতুতে ঋতুতে পায় বিভিন্ন যৌবন
স্মৃতির গহন বনে বিভিন্ন হাওয়ায় দুলে দুলে।

এবারে সময় হল শরীর ও মন উভয়ত
কপোত কপোতীসম উচ্চচূড়ে নিরালম্ব নীড় বাঁধবার,
স্মৃতির বিশুদ্ধ শুভ্র ঐশ্বর্য-লক্ষ্মীকে সাধবার
ইন্দ্রিয়ের মুক্তধ্যানে বিভূতি সতত।

অথচ বরাতে নেই, পরশুরামেরা দুই হাতে
গৃহস্থের আম জাম শেষ ক'রে আজ মারে বন,
নব্যকালে দেখি তার, আমাদেরও ইন্দ্রধনু মন
কেটে কেটে ভূমিসাৎ ক'রে যায় লোভের করাতে ॥

## অয়রিডিকে

(সত্যজিৎ রায়-কে)

Triumph sei Amor, und alles, was da lebet

এ কোন কবির নরক জীবনযাত্রায় ?
পর্বে পর্বে পথে পথে ঘরে বাইরে চলেছে নাট্য,
মরণ-রঙ্গে এবং নিজের মনে তো চলে না শাঠ্য,
নানারূপে তাই নরকের দিনরাত্রি
পদে পদে দেখি কবির ছন্দে, দৈনন্দিন যাত্রী
নরকের পথে গান করে চলি মৃত্যুঞ্জয় মাত্রায় ।

তুমিও বন্ধু নরকেই করো হৃদয়ের অভিযান ?
অধিষ্ঠাত্রী প্রেয়সী কি তবে রইবে আঁধারে লীন ?
পাখিদেব সুরে পল্লবতানে প্রকৃতির সম্মান
তুমিও খোয়াবে, হে সুরস্রষ্টা পরাজিত ম্রিয়মাণ ?
মৌন মুরলী, থেকে যাবে মূক তোমারই রুদ্রবীণ ?

নবকে কি শেষে রেখে যাবে একা জীবনের সঙ্গীকে ?
দুর্গম পথে ক্ষুরধার প্রেম কাঁদবে চতুর্দিকে
সারা জীবনের প্রেমের কবরে অগোচর নিঃসীমে ?
কালের আদেশে বিদেহী অন্ধ হিমে
বাঁচবে না বুঝি আবেগে অধীর তোমার অয়রিডিকে ?

তোমার দু পাশে কারা তোলে হাতছানি ?
কাদের কান্না তোমার এ পরাজয়ে ?
মানব-প্রেয়সী মাত্রেই ইন্দ্রাণী,
মনসিজ ওই 'বলে নাকি বরাভয়ে ?
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হে সখা সত্যবান,
নরকে তোমার প্রেমের কলিতে মরণও যুক্তপাণি ।

কঠিন পণের আঁধারে তোমার অভিযান,
মধ্যদিনেও দেখবে না তুমি আপন সাবিত্রীকে,
সদ্যোত্থিত প্রিয়াকে দেবে না বাহুডোর,
দেখবে না চেয়ে সে প্রিয় মুখের সুখঘোর ?

অসিধার প্রেমে কঠিন শপথে চলো বীর,
নরকের বিধিনিষেধ স্নায়ুতে অস্থির,
অথচ হৃদয় আকুল আদরে আবেশে,
তবুও যাত্রা প্রেমের অমোঘ আদেশে ।
অভিমানে ব্রত ভাঙবে কি শেষে তোমারই অয়রিডিকে ?

তুমি যে প্রতীক, তোমার প্রেয়সী প্রতিমা
আমাদের মনে মন্দির দিকে দিকে,
মূর্ছিত নত আঁধারে আপাত-গত-প্রাণ
অথচ অমর সহিষ্ণু সেই পাতালতীর্ণমহিমা
আমাদেরই জেনো জীবনমরণে প্রতীকে ।

আশেপাশে একি নানা বেশে নানা কঙ্কাল !
ভাগ্যহতের পরীক্ষা কতকাল ?
কোথায় লুকাল তোমার অয়বিডিকে ?
ছিঁড়ে দাও ভাঙো নরকেব মায়াজাল,
তোমার মাথুর সংগীতে দেব সবাই দোহারে তাল
তোমার প্রেমের উজ্জীবনেই প্রাণ পাই ঠেকে শিখে ·
যার চোখে আহা আমাদের প্রাণ পায় প্রাণ
তাকাবে না সেই প্রেয়সীরও চোখে প্রেমিকে ?

আমাদেব মরঅলকায় আজ বাঁচুক অয়রিডিকে ॥

১৩ জানুআরি, ১৯৬০

## লুসিয়া, প্রকৃতি, আমরা

***And, Oh! the difference to me***

সেও ছিল কোয়েলেব নির্ঝরের ভিড়ে
পায়ে না চলার অগণন পথে,
প্রকৃতির মেয়ে সেও, মিলেছিল নিঃসঙ্গে নিবিড়ে
প্রকৃতিস্থ সত্তায় সংগতে ।

পৃথিবী তাকেও স্নেহে দিয়েছিল রহস্যের চাবি
আপন আবেগ আর বিধিনিষেধের,
আশ্বিনের মেঘ তার তনুদেহে এঁকেছিল দাবি,
রৌদ্রে তার চোখদুটি গান করে নূতন বেদের ।

সদ্যসবিতায় লঘু নৃত্য তার টিলার প্রান্তরে
স্বতঃস্ফূর্ত হরিণ-উল্লাসে,
অজেয় মাধুরী তার বৈশাখীর রুদ্র রূপান্তরে,
সে সদা প্রসন্ন যেন আম্রকুঞ্জ ফাল্গুন বাতাসে ।

নিশুতি রাতের তারা নির্ভীক স্বপ্নের তার মিতা,
আরণ্য স্তব্ধতা স্থির আস্তিক্যে সে আনম্র হৃদয়ে,
বালিতে উপলে স্বচ্ছ মর্মরিত নদী শুচিস্মিতা
লাবণ্যে করেছে ভর তার মুখে সখীর বিস্ময়ে ।

সে আমার জানাশোনা, জীবনে সে আগামী প্রসাদ,
চৈতন্যে সে বেঁধেছিল ঘর ।
তাই তো এমন তীব্র অসার্থক বেদনার খাদ,
বহুকাল পরে দেখা—সে এখন মেনেছে শহর ।

অথচ শহর কী-বা আমাদের? অপ্রাকৃত, কৃত্রিম আদিম,
প্রকৃতিবিরোধী, শুধু বিকৃত বর্বব ।
স্তব্ধ মরণেব তলে আমার লুসিয়া নয় হিম,,
আমাদেব এই শোক, প্রতিদিন সে গাঁথে কবব ।

প্রকৃতিব মেয়ে সে যে, সেও ভোলে,
প্রকৃতির কত ছেলেমেয়ে ভোলে প্রকৃতিব দাবি ।
প্রকৃতি সে ভুল দেখে শীর্ণ মুখ ফিরায় কি ?
দগ্ধ আষাঢ়ের শেষে আশ্বিনে বন্যায় তাই ভাবি ।

পাহাড়ে নদীব সেই গ্রাম্য দুঃখে সুখে
দেখেছি সচ্ছল চলা সর্বাঙ্গি সংগীতে
পাথরে বালিতে হীরা ছড়িয়ে দুহাতে
হেমন্তে বসন্তে গ্রীষ্মে পাড়ে পাড়ে নিত্য স্রোতে
কুলুকুলু শুধাতে শুধাতে, বর্ষার থাকুক দেরি,

নিশ্চিত সে আদিগন্ত ভেরী যখন বাজাবে মেঘ
তখন শহর গ্রাম সারা দেশ পাবে নাকি
কূলভাঙা কূলগড়া পাথর-ভাসানো পলি-তোলা লাল স্রোতে
নদীর আবেগ ?
নদী কি ভুলেছে সত্তা, নেমে এল সে কি দিঘি, থমকাল
সাঁতারু সাহেবমেমে অদ্ভুত শহরে ?

পিপুল কি মাটির বৈভবে বিস্তৃত শিকড় ভুলে
পাতাঝরা শীতে ভাবে উঠে যাবে ভাড়া-করা প্রাসাদের টবে ?
চাষি কি কখনও ভাবে তেরোতলা ছাতে
বুনবে ধানের খেত, আল দেবে খুলে ?
পলাশ কি রাজন্যসভায় যাবে মহাবক্তা সভাসদ্ ?
অথবা গদিতে চেপে প্রত্যহই কী আপদ করে যাবে বধ
অহংসর্বস্ব আর অবান্তর পঞ্চমুখে
আজ কারো শিশুপাল কাল কারো কৃষ্ণই স্বয়ং ?

তাহলে সে, প্রকৃতির মেয়ে কেন ভাবে আজ
তার ঠাঁই শিকড়ে না, উড়ন্ত পল্লবে ?
তার ঠাঁই কাবারেব নাচের টেবিলে
কিংবা রাজধানীর মেলায় হরেক খেলায়
তারে তারে দুলে দুলে, কিংবা ভাবে ডিগবাজি দিলে
তার মান বেশি ফোটে এই সোজা এই উলটো নির্বোধ কৌশলে

পাহাড় কি নীলাকাশশীর্ষ ছেড়ে তরাই জঙ্গলে
অবিশ্রাম গেঁজে গেঁজে হিমালয় ফুঁড়ে ছোটে ?
প্রকৃতির মেয়ে তার অপ্রাকৃত ঘোর
কবে যে কাটাবে ভাবি ।
তাই চলি, অবশ্যম্ভাবী দিন পৃথিবীতে
নামাই সবাই, নীলাকাশ নিত্য করে সেই দাবি ।
অমর পাহাড় নদী পিপুল পলাশ চাষি
আমরা প্রাকৃত পুণ্য চাই, চাই সত্য রূপ তার
প্রকৃতির সে মেয়ের, যাকে নব্যসভ্যতাব স্বপ্নে ভালোবাসি ।

রুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যাগাদারেগু কৃষ্ণা সদনান্যস্যাঃ ।
সমানবন্ধু অমৃতে অনূচী দ্যাবা বর্ণং চরত আমিনানে ॥

আমাদের ঊষা নেই ঊষসীও নেই, শুধু আশা
রুশদ্বৎসা রুশতীর মতো, জীবনে নাহোক আশা মনের দহনে ।
আমরা হাঘরে বটে, শূন্য হাওয়ায় হাওয়ায় ঘোরা ফেরা
কি যে ঠিক চাই তাও জানি না, অথবা
যাঁদের দায়িত্ব জানা, জানেন না কেউই 'তেনারা' ।
হয়তো আমরাই জানি মর্মে মর্মে, অসহায় মানুষেরা
দুর্গত সরল গ্রাম্য প্রাকৃতিক জ্ঞানে ।
রক্তে জানি শরীরের হৃদয়ের সত্যে জানি
আমরা সরল তাই সবল জীবন চাই সচ্ছল সভ্যতা চাই
ঘরে ঘরে, ঘরে ও বাইরে চাই ঘনিষ্ঠের আত্মহাবা
যোগাযোগ মানুষে মানুষে আর প্রকৃতি মানুষে
চাই অন্বিষ্টের আদিম মিলন চাই সেই পরিণত বিবাহের সভা
যেখানে রাজন্য দক্ষ নত বন্য ভিক্ষুকের কাছে ।
অথচ এ দক্ষযজ্ঞে সব পণ্ড !
পার্বতী বেতালা নাচ ধরে আর শিব ?
চড়কের সং সেজে লণ্ডভণ্ড মাথায় দাঁড়ায়,
হাসায় বিশ্বের লোক, আর কেউ রোজগার করে
পোয়া বারো কেউ দাঁও মারে দাঁতে ধার করে—
কিছুবই নিয়ম নেই কিবা আগে কিবা পবে কোনো বিবেচনা
ক্ষমতাও নেই আর সততাও নেই,
আব যদিবা নিয়ম কিছু মাথা ভেঙে দেয় কোনো কিছু প্ল্যান্
সে আবার আরো বেশি হিতে বিপরীত
পদে পদে ভুলে ভুলে বাঁধ ভাঙে অথচ নদীও মবে ।
বনবাদাড়ের ববা সোজা ছোটে,
রাজপথে এঁকে বেঁকে চলে সরীসৃপ সে যে আরো সর্বনেশে ।
ওঅর্ডসওঅর্থ্ সেকালেই কেঁদেছেন মানুষেই মানুষেব
কী অমানুষিক ক্ষতি করে দেখে বাদশাহি তাঁরই দেশে
What man has made of man !
আজকে অন্যত্র দাসবংশীদের নৃশংসতা দেখে
নটরাজ শিঙা ধবে সে কবিসংবিতে নীলকণ্ঠ অন্ধকারে সদ্যসবিতায়

সবিতা পশ্চাতাৎসবিতা পুরস্তাৎ
সবিতোত্তরাত্তাৎ সবিতাধরাত্তাৎ ।
সবিতা নঃ সুবতু সর্বতাতিং
সবিতা নো রাসতাং দীর্ঘমায়ুঃ ॥

## পরকে আপন করে

(শ্রীমতী রাজেশ্বরী দত্ত কে)

জানি সব সাধ শিল্প সব সাধনাই
সাধ্যের সন্ধান করে গানে গানে ।

গান শুনি অহর্নিশি ।

প্রাকৃতিক গানে তৃপ্তি কানে বটে, প্রাণে নয় ।
পাখির হরেক গানে পল্লবের একতানে
গলার জোয়ারি নেই, সে গানে গায়কি নেই,
ব্যক্তির আকৃতি নেই মানুষের ইতিহাস
মানুষের আকুলতা নেই ।
প্রাকৃত জীবন শুধু চিতার আহার লুটেরার লুট
কিংবা দিশাহারা খরগোশের ছুট,
হরিণের লাফে লাফে দেখি শুধু আমাদের
বিকার ও আপন স্বরূপ ।

বনবাসে মুক্তি কোথা ? ভালোবাসায় ঘৃণায়
মানুষের ভিড়ে আর মুখোমুখি গহন আলাপে
ফিরতে হবে তা জানি, শিকার বিনাই খেতে হবে
পেতে হবে নিত্যকার অভ্যুদয়ে বন্ধুর এবং
পতনে ভঙ্গুর ধাপে ধাপে অন্বিষ্ট এবং
দেখে দেখে যেতে হবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়
শহরে ও শিকারির কলকাতার জাহাজঘাটায়
ডালহৌসির খাপছাড়া থামে থামে ।
এই পশুপাখি পোকামাকড়ের মেলা,
ছোটো ইঁদুরের কিংবা মাকড়শার খেলা
নিশ্চিন্ত জীবনে আর বিচ্ছিন্ন মরণে,
সুঠাম গম্ভীর শাল জঙ্গলের ডালপালা,

নানা শিকারের ডাক, নানা প্রণয়ের গান,
[illegible] প্রতিদিন টাটকা আহার,
কিন্তু তাই মুক্তি নেই, এমনকি চোখের আরামে
কানের বিরামে বিশ্রামে বন্য বসন্তবাহার

সর্বদাই করে বুঝি পালাই পালাই
চিতা ও হরিণ কিংবা প্রায় মানবিক
বানরের পাল এদের কারোই মনের বালাই নেই,
কেউ কারো ঠিক আপন বা পর নয়।

অথচ চৈতন্য জুড়ে গান করে যারা বনে স্তব্ধ অন্ধকারে
শহরে ও গ্রামে তারা পরকে আপন করে, আপন মেলায় পরে,
বাঁশি শুনে তারা সুখে ঘর ছাড়ে অন্য এক দুঃখ ধরে
দুই হাতে বুক চেপে, ভরে তোলে শ্বাসের আখর।

বানপ্রস্থে কোথা সে মরণ-উৎসব সেই জমাট আসর
যে মরণ মানুষে মানুষে চিরজীবননির্ভর ?

মানুষেরই গান শুনে প্রাণ ভরে, মনে হয়
সকলই সম্ভব আহা সকলই সম্ভব
পরকে আপন ক'রে জীবনমরণ বেঁধে
জীবনেরই গান সেধে সুরে সুরে দীর্ঘস্বর
বলা-না-বলায় শব্দ হয়ে ওঠে বাস্তব তন্ময়
স্বাধীন গৌরবে।

গান করো, পরকে আপন করো তবে ॥
১৪ ফেব্রুআরি, ১৯৬০

## প্রবীণ সারস

যেখানে পাহাড় বেঁকে নেমে গেছে নদীর বালিতে
সেইখানে, হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে দেখা হল,
একা, নিষ্পলক তাকালুম, চেনাঅচেনায় মেশা,
বনের ঢালুতে হঠাৎ সামনে দেখা,
মুখে কথা নেই, ভাবা-না ভাবায়
নিস্তব্ধতা কুলুকুলু করে.

কথা কি সে বলেছিল ?
বলেছিল : প্রিয়তম, চিত্ত মম জীবনমৃত্যুর
প্রতি মুহূর্তের সূত্রে গেঁথেছিল পরানবঁধুব
যে বাহুবন্ধন, তাই দিয়ে যাই তোমার বিস্ময়ে,
মোরে তুমি বেঁধে নাও নীরব নির্জন ববাভয়ে ;
নাকি সে বলেনি কিছু ?
আমারই হৃদয় নগ্নতায মাথা নিচু ক'রে
হঠাৎ দাঁড়াল মুখোমুখি,
মহাসুখী, জীবনমৃত্যুর বিবিক্ত উল্লাসে রভসে অবশ ?

মুহূর্তের সূত্রে বাঁধা স্মৃতি আর স্বপ্নের পাহাড়ে ঘেরা পাড়ে

বালিচরে ঘাসের আভাসে নাচে একা এক
শুভ্রকেশ প্রবীণ সারস ॥

## একদিন ছিল

একদিন ছিল, দূর থেকে চলে গেলেও
মনে আর বনে পাহাড়ে লাগত দাহ ।
আর আজ যবে পাশে এসে বসে অভ্যাসে অবহেলেও
কিংবা কদিন কয়েক হপ্তা যদিই বা নাই আসে,
মাটিতে মুখর শ্রাবণ নামায় পৌষে বা মাঘ মাসে
আকাশে জ্বালায় অসহ আবেগ বিদ্যুৎ-সমারোহে ।

আমার স্মৃতিতে ইস্পাত গলে, বর্তমানের মোহে
পায়েচলা সাঁকো গড়ে তোলে অহরহ ॥

৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০

## খয়ের বন

কিসের ভয় ? এ নয় সখী অপ্রাকৃত শহর ;
কুটিল নেই, ইতর নেই, গৃধ্নু নেই বনে ।
এ শুধু বন, পাহাড়, বালি, ঝরনাধোয়া নদী,
কিসের ভয় ? শোনো পাখির গান আটপ্রহর,
ররা-র ডাক দুপুর ভর শুনতে পাও যদি
জেনো সে ছুটে বেরিয়ে যাবে, রেখো না ভয় মনে ।

পাথর আনি, আগুন জ্বালি, কাটবে ভালো দিন,
যা হোক বাঁধো, বেঁধো না খোঁপা, নদীতে করো স্নান,
নীলাকাশের তলায় দেখো হীরার আলো ক্ষীণ,
জ্বলবে ঠিক তোমার গায়ে ঠিকরে ঝলমলে ।
কিসের ভয় ? দেহাতে কেউ করে অসম্মান ?
স্বচ্ছ জলে নামতে পারো প্রাকৃত বল্কলে
ধারার বেগে ; নাটক কোথা ? গীতিকাব্য তুমি ।
শ্রোতা কিংবা দেখার লোক শুধু একটি জন ।

কিসের ভয় ? একা আকাশ রৌদ্রে নাচে আহা রে !
তোমাকে দেখে । পাহাড়, নদী, বিজাশালের বন,
তোমারই শুধু তারিফ করে পাখিরা কত হাজারে,
এগিয়ে চলো, পলাশদিনে কিছুই নেই ভয়ের,
ও তো শিমুল, রং দিয়েছে শালের ঋজু বাহারে,
ডাইনে ক্যাটাবন ও শুধু তনুপর্ণ খয়ের ॥

২৪ ফেব্রুআরি, ১৯৬০

## সার্কাসের বাঘ

গ্রামে গ্রামান্তরে শুনি মহা উত্তেজনা
প্রকৃত সন্ত্রাসও বটে । শহরের সার্কাসের বাঘ
পালিয়েছে বাঘোয়া পাহাড়ে ঘেরা বনের আড়ালে

উপদ্রব প্রায়ই ঘটে । আমরা এসেছি কয়জনা
বাংলো কুঠিতে, আমন্ত্রিত না হলেও রবাহূত বটে ।
তিন পা বাড়ালে রাত্রে ঠিক দেড়টায়
শুনেছি সে ভাঁটা চোখ দেখা যায়, হিংসা জ্বালা রাগ
প্রচণ্ড আক্রোশে জ্বলে, খণ্ডিত মুক্তিতে৷
প্রচণ্ড আক্রোশে ; কেননা সে খাঁচার সচ্ছল সুখ চায়
পলাতক অনভ্যস্ত স্বাধীন অরণ্যে অপ্রস্তুত
ফাঁসিকাঠে আসামীর দুর্গত দীক্ষায় ।

আমাদের রাত্রি কাটে কাঁটাঝোপে ঘাসের পোকায়
কেঁচোয় মশায় দীর্ঘ প্রতীক্ষায়, শব্দ শুনি,
শুনি আজ এ গ্রামের ছাগল বাছুর
শুনি কাল ও গ্রামের মানুষের ছেলেমেয়ে গেছে ।
তাড়া করি কয়জনা । চলে যাই বহুদূর
বেছে বেছে এ ঝোপ সে ঝাড় । পণ্ডশ্রম ।
শহরের সার্কাসের ভূতপূর্ব বাঘের দারুণ চতুর খেল্,
কিছুটা বা ক্ষুধার অভ্যাসে আর কিছুটা বা শখের বিকারে
যেন বা সে কোটিপতি লোভ, যেন সারা বিশ্বের শিকারে
তার লোভ, তৃপ্তিহীন চিরদুস্থ প্রতিযোগিতায় ।

জন্মবুনো বাঘেরাও তাই তাকে ভয় করে ।
আর আমাদের অরণ্যবাসের তাই শেষ নেই,
কারণ এ উপদ্রব দূর করা আমাদেরও জিদ. রোখ, ব্রত !
তাই অন্ধকারে প্রতিরাত্রে আমরা কজনা থাকি ছদ্মবেশে,
সদাজাগ্রত বীক্ষায়, যেমন ছিলেন লেনিন স্তালিন
উনিশশো সতেরোর অক্টোবরে উদ্যত প্রস্তুত.
প্রায় সেই মন্ত্র নিয়ে—বড়তেই দাও যদি ছোটর উপমা—
আমরাও চুপ করে বসি, কিংবা ছুটি নিঃশব্দ সঞ্চারে,
সর্পগন্ধা পায়ে পায়ে সিসু শাল সেগুনের উদ্‌গ্রীব অদ্ভুত
তীক্ষ্ণ আগ্রহের নিস্তব্ধ আশ্লেষে, প্রকৃতির নীরব উৎসাহে,
সভাসমিতির চেয়ে ঢের শক্ত ক্ষিপ্র তিতিক্ষায় ॥

৩১ মার্চ, ১৯৬০

## নৈঃশব্দ্য মধুর এত

নৈঃশব্দ্য মধুর এত, মূক শূন্য এত বাঞ্ছনীয়
সে কথা সবাই বোঝে যখন পাড়ায়
বিয়ে কিংবা পূজা হয়, ঐহিক স্বর্গীয় যে-কোনো সুযোগে
যাতে সুরুচি স্নায়ুর স্বাস্থ্য সব-কিছু শব্দযোগে ঝেঁটিয়ে তাড়ায়।
রবীন্দ্র-আলোকে আমাদের জন্ম, তাই জানি গান
সৃষ্টির চরম শিল্প, অধরা আবেগে
গান বুঝি হাতে ধরে হৃদয়ের সাত ইন্দ্রধনু,
সুকুমারতম ভাব ভাষায় ও সুরে ওঠে যেন বা কৈলাসে হরগৌরী জেগে

কে জানত গানেই চিত্ত খান্‌খান্‌ মগজের শিরা ছেঁড়ে, ভেঙে যায় হনু ?
প্রচণ্ড তাড়কা ছোটে আকাশে বাতাসে,
ছড়ায় কি আধুনিক গীতি নাকি ছায়াছবি-গান
বোম্বাই বা কলকাত্তাই, নব্যপল্লীগীত নাকি শিশুনাট্যনামক ন্যক্কার,
রাগরূপ বা রাগপ্রধান ?
সুরকে অসুর করে ভূতুড়িয়া সংস্কৃতি বিলায় লাউডস্পীকারে !
বুঝি কেন আলমগীর বন্ধ করে দেন গীতবাদ্যকে ধিক্কারে।

পাড়ায় পূজায় কিংবা বিয়ে কিংবা ভাতের উৎসবে
ভয় পাই, কারণ জীবন তাতে পিছু হাঁটে, মৃত্যুকেই ডাকে,
চৈতন্যের মৃত্যু চায় গানে কিংবা বোমায় পটকায় মত্ত কলরবে।
মূক শূন্য এত যে মাধুর্যে পূর্ণ এই কুম্ভীপাকে সে কথা জানত কেবা আগে
মন বড় ভয়ানক, বড় কড়া, গান চায়
শান্ত স্থির স্তব্ধ মনীষায়, তুলে ধরে নিজমনে উত্তল মুকুর,
মনের বালাই বড, বহু দাবি-দাওয়া সে জানায়,
তাই পালাই পালাই করে, যখন মাইকে হাঁকে দুরন্ত কুকুর ॥

৪ এপ্রিল, ১৯৬০

## অসময়

খুবই ভালো লেগেছিল, শরীর জুড়াল, আর মনে—
মননে পরম তৃপ্তি টলোমলো, যেমনটি হয়
যেদিন মেজাজ জমে হিমানীর আলোকনন্দনে
কিংবা আর কোনো ঠাটে জমে যায় সমস্ত সময়
আলাপে ঝালায় এক আলি আকবরের দু হাতে
কঠিন ধাতুর রৌদ্রে আর মুক্তাশিশিরে অক্ষয়।
খুবই ভালো লেগেছিল সদ্যস্নাত হেমন্ত প্রভাতে
দৃষ্টিতে অপার শান্তি হৃদয়ের আবেগে স্বচ্ছতা,
আকাঙ্ক্ষার আশা স্থির নিশ্চিতির প্রসন্ন সওগাতে।
দু পাশে বাগান চলে, পথ ছেয়ে ছড়ায় নম্রতা
অন্তহীন আমন্ত্রণে প্রকৃতি-মানুষে জোড়ে মিলে
চেয়ে থাকে স্মিত সাম্যে, কেউ কারো মানে নি বশ্যতা
খুবই ভালো লেগেছিল, নদীতে বালিতে বাঁধা ঝিলে
অবিশ্রাম দোলে শাদা কাশ ঝোপে, এপারে ওপারে,
ডাকে দুটি কাদাখোঁচা, মনে হয় আহত নিখিলে
এখানে জীবন পায় পরিণতি প্রশান্ত সংসারে,
দুর্বহ যৌবন বাঁচে স্বয়ম্ভর সক্রিয় মননে।
সেদিন থামিনি তবু প্রত্যাশিত কারো ভাবী-দ্বারে,
যদিও পরম তৃপ্তি পেলুম সংহত দেহমনে,
সময় ছিল না, আজ অসময় কার না জীবনে ?

২০ এপ্রিল, ১৯৬০

## আলেখ্য

*I, with no rights in this matter,*
*Neither father nor lover* — Roethke

চেনা মুখ, এইমাত্র,
আর যা, তা একান্ত কল্পনা,
সহানুভূতির আভা, যে কম্প্র জানায়
অস্পষ্ট বাস্তব শিল্পে আত্মীয়তা পায়
পাত্রাপাত্র নির্বিশেষে হিরণ্ময় সত্যে ভরে কানায় কানায়।

দেখেছি ক'দিন মাত্র শিক্ষার্থীর শূন্য পরিচয়ে ।
তারপর দেখা শুধু দূর থেকে, উপলক্ষ-সেতুহীন
এবং দুস্তর বয়সের এপারে ওপারে ।
দেখেছি চলেছে কাঁধে থলি পায়ে চঞ্চল-চপ্পলে,
শুনেছি কাজের মেয়ে, ঘরে দুস্থ পঙ্গু বহু মুখ ।

কদাচিৎ হেসেছে সে লাজুক চাউনিতে,
কখনো বা দুইহাত তুলেছে চেনায় ।
দেখেছি কয়েক মাস, হয়তো বছর,
চেনা মুখ, নিটোল মুখের ডৌল যৌবনে ভাস্বর, অথচ করুণ,
স্বপ্রতিষ্ঠ অথচ প্রতীক্ষমাণ স্নিগ্ধ চির মেয়েলি স্বভাবে ।
কদাচিৎ দু'চারটি কথা, লেখাপড়া ছেড়ে লালদিঘির লজ্জায়,
আর আমার ঘোলাটে এই কলকাতার শুকনো কানে
লেগেছে দেশজ ছন্দ পদ্মার প্রাণের সজল ধ্বনিতে ।

চেনা মুখ, কপালের স্বচ্ছতায় অর্ধচন্দ্রে আনত অলক,
স্বেদাক্ত শ্রাবণে খোঁপা কিংবা বিনুনিতে,
অঘ্রানে আবার হাওয়া তোলে দেখি কুঞ্চিত উজানে ।
একালের কৃষ্ণকলি, কখনো বা দেখেছি সে একা নয়,
সঙ্গে যায় একেলে যুবক, পরনে পাজামা ।

তারপর দেখি নি অনেক দিন ।
অথচ সে প্রতীক আমার মনের পাথারে,
কারণ আমিও বটে, আমরা সবাই যাত্রী
দিনরাত্রি বাংলার মরুতে কান্তারে !
তাই সে কি ঝড়ে জলে খুলেছে দুযার,
চলে গেছে আকাঙ্ক্ষিত দূর অভিসারে
অতিনিকটের বহু মুখ ছেড়ে একাকীর নিঃসীম নিষ্ঠায় ?

নাকি, সে গিয়েছে তার জীবনের শেষ প্রতিষ্ঠায়
তিলে তিলে নিজবাসভূমে পরবাস ছেড়ে সত্তার দুর্গম তীরে
অতল সমুদ্রজলে কিংবা নীল নীল ভিড়ে
পাহাড়ের অনন্ত মিছিলে ?

আমি তার দুঃখ সুখ কী-বা জানি. আমার ছিল কি অধিকার ?
কেন তবে শোক ?

আজই বা কী অধিকার বলো ?
সে শুধু বিধুর দূর যৌবনের চেনামুখ—এই বই কিছু নয়,
সমস্ত দেশের চেনা যৌবনের হাসিমুখ
আর অসহায় দুটি ছলোছলো চোখ জীবনে উন্মুখ ।
আমি তার বাপ নই, সমবয়সীও নই ॥

১ মে, ১৯৬০

## ত্রিপদী

অসীম নীলে শুধু মোছে সে লজ্জা ।
দেখেছি রাত্রির সতীকে দীনাকে,
চিনিনি অশ্রুর অতনু সজ্জা ।

চিনিনি গানে চেনা তুলনাহীনাকে,
অশ্রুসাগরের পারে যে সঞ্চিত
করেছে কানাড়ার পাহাড়ি পিনাকে

আকাশচুম্বিত তুষারে অঞ্চিত
হৃদয়ঝঞ্জার নিকষ নীলিমা ।
দেখেছি, তারে নিজে থেকেছি বঞ্চিত ।

দেখেছি বটে, তবে চোখের ত্রিসীমা
বাঁধিনি এক তারে একটি মননে ।
মিলবে সে ক্ষতি-পূরণে কি বীমা

আজকে বৃথা বলো স্মৃতির রণনে ?
আজকে শহরের জাগর অতলে
উদাসী ডুবেছে যে আত্মহননে,

ক্ষতির হিমালয়ে রতির অনলে
নগ্ন হৃদয়ের অস্থিমজ্জা।
সময়ে চিনিনি যে, কি দাবি-দখলে
অসীম নীলে ভাবি মুছি সে লজ্জা ॥
৩ মে, ১৯৬০

## কতকাল

আকাশে নেই পরিখা গড় প্রাকার, তাই মিলবে
আজীবন কি ডানার দুটি পাল ?
হায় হৃদয় ! হে যৌবন ! সুখের গাঙে আর নয়

কালিন্দীতে গাহন সেরে ভোরের ভেজা সূর্য
এবারে জেনো পাহাড়পারে অন্ধকারে হেলবে,
পালটে যাবে বিলম্বিতে তাল।

অষ্টাদশী মুরলী ফেলে পঞ্চাশের তূর্য
খুঁজবে বৃথা ফসল খোলা মাঠের তাজা পান্নায়,
নবান্নের রাতের হিমে ধরবে বৃথা হাল।

শহরে পেতে সারাজীবন, মনের নীলে খেলবে
এখনও কত কাল ?
এপার-ওপার উহ্য প্রেমে বাঁধবে কতকাল !
প্রেমের সাঁকো এখনও ফাঁকা কান্নায় ॥
৪ মে, ১৯৬০

## তাই শিল্পে পাই

বাস্তবে অনেক বাধা, স্বার্থে আর অজ্ঞান অভ্যাসে
চেনাকে চিনি না, ভয়ে, পাছে নিরাপত্তায় নিজের
অশান্তি জাগায়, আর অচেনাকে সেই কূট ব্যাসে
দূরে পরিহার করি, পাছে ওঠে সত্তায় নিজের
জীবন-মৃত্যুর বন্যা, প্রতিবেশী কান্নার অতলে

পাছে ডুবি দৈনন্দিন জীবনের জীবিকার ঘরে,
অথবা দপ্তরে কিংবা মজলিসে বা সিনেমার হলে ।
একান্ত বেদনা বড় বিড়ম্বনা বিচ্ছিন্ন শহরে ।

তাইতো শিল্পের মুখ চাওয়া, যদি দুস্তর বাস্তবে
এবং হৃদয়ে বাঁধে অবিচ্ছেদ্য মননের সেতু,
যে সংবেদন ছাড়া দায়হীন সময়-হত্যায়
দিনগুলি অনাত্মীয়, রাত্রি বুক চাপে উপদ্রবে ।
মৈত্রেয়-কে দূর করে কবে বাঁচে দগ্ধ মীনকেতু ?

তাই শিল্পে পাই যদি নৈর্ব্যক্তিক হৃদয়বত্তায়
চোখে কানে নাট্যে দৃশ্যে উদ্‌ভাসিত সুরের লহরা,
তখন হঠাৎ শুষ্ক চিত্তে জাগে অতনু অধরা
জীবনের কূলপ্লাবী তরঙ্গিত যন্ত্রণাগৌরবে
আকাশবিহারী সুরে অনির্বচনীয় পরম্পরা ॥

১৬ মে, ১৯৬০

## সর্বদাই সুখদা বরদা

তারপরে বৃষ্টি এল, মাটিতে সুগন্ধে, মনে দীর্ঘ অপেক্ষায় ।
যাকে চিনি, পাই-কি-না-পাই সত্তার আকাশে
সেও এল, সত্যে নাকি মনে মনে উপমায় বা উৎপ্রেক্ষায় ?
সকালের রৌদ্র এল বিকেলের মেঘে, নাকি রইল ফ্যাকাশে
কলকাতার শূন্যচর দুপুরের দগ্ধতার দুরন্ত আড়ালে
ম্লান মৌন দূর প্রিয়ম্বদা ?

যাকে আমি চিনি, চাই, পাই না-বা-পাই হাত হাওয়ায় বাড়ালে
যে আমাকে বলেছিল ভালোবাসে, আমারও যা মর্মের বিশ্বাস,
অথচ যা স্বতঃসিদ্ধ নয় মোটে, কারণ সে দুর্মর পিয়াস
মেটে শুধু একমাত্র দীর্ঘশ্বাসে সুদীর্ঘ নিষ্ঠায়
পাওয়া-না-পাওয়ায় দীর্ঘ তীর্থ-পথে গেলে—কি দাঁড়ালে

সব মিশে একাকার একাত্মের চির প্রতীক্ষায়
বৈশাখের আকাঙ্ক্ষিত আবির্ভাবে কিংবা সোঁদা বৃষ্টির আড়ালে
সর্বদাই সুখদা, বরদা ॥

২৩ মে, ১৯৬০

## সমুদ্রের প্রতিবাদে

তুমি বলো মনে নেই। অবিস্মরণীয় সেই হেমন্ত নিশির
ক্রন্দসীর তারাজ্বালা দুঃখের শিশির
শুভ্র হিমে ঢেকে দিলে স্নায়ুর সমস্ত সানুদেশ।
বৈশাখের অগ্নিস্মৃতি মগ্ন হল নিদ্রাহীন স্তব্ধ কোজাগরে।

শুধু মনে নেই কবে সেই হিম কোন্ দূর কপিল সাগরে
সে কোন ঊর্মিল স্রোতে কতদিনে ডুবে গেল, হারাল উদ্দেশ

অবিস্মরণীয় সেই চৈতালি ঘূর্ণির দাহ হল যবে শেষ,
ঘনাল, হানল, আর নামল চরম হাহাকারে,
সমস্ত জীবন হল থই থই, বৈশাখীতে লুপ্ত দুই পাড়।
ভিজেছি ভেসেছি আমি, শুনি আজো চৈতন্যে সে গান!

অনন্ত সে দাহ্যবাষ্পে যন্ত্রণার আন্দোলনে প্রাণ
সমুদ্রের প্রতিবাদে ক্লান্তিহীন গড়ে তোলে কান্নার পাহাড় ॥

২৫ মে, ১৯৬০

## এই ভালো

এই ভালো। কলকাতার রসাতলে প্রাচীন পাইপে
বিষাক্ত বুদ্বুদে ফোঁসে অজগর উদ্গারে উদ্গারে।
মানুষে মানুষে আর বাড়িতে বাড়িতে লক্ষ দ্বীপে
যোগাযোগ ভেসে যাক অকর্মণ্য ঘৃণার ফুৎকারে।

তবু এই বৃষ্টি ভালো। দগ্ধ দেশে কয়েক ঘণ্টার
আপিস কামাই যাক, ট্রাম বাস থামুক খানিক,
না হয় ভিজুক কাদাজলে কিছু মায়ের মানিক,
অন্তত বারেক মুক্তি পাক তারা দেহ-টা মন-টার।
এই ভালো ; নবজলধরশ্যাম আনুক আরাম
অহল্যার শুষ্ক ক্ষতে সহস্র মরুতে ধারাজলে
চলুক সহস্র হল ধন্বন্তরী ফলায় ফলায়
মাটিতে আকাশ বেঁধে। তারপরে কাজ সারা হলে
আশ্বিনের শরতের মেঘরৌদ্র বেজে ওঠে গলায় গলায়
নিরম্বু কলুষ ধুয়ে কলকাতাকে প্রাণ দিক গ্রাম ॥

৪ জুলাই, ১৯৬০

## আবার এসেছি

আবার এসেছি সেই তিনটি টিলার কাছে
চেনা প্রিয় পুরানো কুঠিতে,
সেই দুটি কাদাখোঁচা বুঝি আজও নাচে,
সামনের ঝিলে ডাকে রাত্রিশেষে সমানে দুটিতে।

আবার স্নায়ুর লোহা রং পায় মাঠের সোনায়,
মন পায় অসীম নীলিমা,
আবার প্রকৃতি আসে রাত্রিদিন ঘরের কোনায়,
উদভ্রান্ত বিধ্বস্ত লোক, ব্যাপ্ত দেশে খুঁজে পাই মানবিক সীমা

থেকে থেকে মনে হয় কোথায় সে দরাজ গলার,
হিম্মৎওয়ালার গান, কৃষাণের গান !
অথবা হয়তো কবে শিখেছিল বায়োস্কোপে গিয়ে একবার,
দিয়েছিল শহুরে সম্মান,

শরতের খরবৃষ্টি, সদরের বিকিকিনি শেষে
দুজনে ফিরছিল বুঝি ঘরে,
বলবান বয়েলের খোলা খালি গাড়িতে গা ঘেঁষে
স্বপ্রতিষ্ঠ, বলিষ্ঠ নির্ভরে।

গায়ক জীবিত কিনা কোনো গ্রামে কিছুই জানি না,
কানে তবু শুনি সেই হিম্মতের উদার আরতি ।
বিধবা বাসায় সদ্য যৌবন কি পেয়েছে সম্প্রতি
আশার প্রত্যয় দৃঢ় দু জনার সন্তানসন্ততি ?

মাঠের সোনায় চোখ, টিলার তরঙ্গে নীলাকাশ—
আবার পেয়েছি সুস্থ সাধারণ্যে বিস্তৃত বিশ্বাস
চোখে কানে কলিজায় পরিপ্রেক্ষিতের কী আভাসে
আবার সন্ত্রাস কাটে, হাওয়ার হিল্লোলে দোলে আমারও নিঃশ্বাস

## বন্ধুস্মৃতি : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত

এ আমার চেনা নদী, উঁচুনিচু, পাহাড়, প্রান্তর,
সমতল পার হয় নানা বৈপরীত্যে দীর্ঘকাল,
উৎস থেকে পাড়ে পাড়ে—এই মৈত্রী ! এই মনান্তর
উপলে পলিতে তীব্র বিড়ম্বিত উল্লাসে ধিক্কারে
একালে, এদেশে, ক্ষুব্ধ আমাদের হাজার বিকারে ।

আত্মসচেতন প্রাণ তাই উটপাখির মরুতে
হারাবে উৎসের দিশা ? অর্থহীন ভূকম্পে নিঃসীম ?
তাই দীপ্র যৌবনের দীপাবলি হয়েছে কি হিম
বৈদেহী নাস্তির গর্ভে ? ব্যক্তিরূপ শূন্য পঞ্চভূতে ?
তাই কি মুহূর্ত-তত্ত্বে মুমূর্ষার এত ক্ষিপ্র তাল ?

বহু উষ্ণ দ্বিপ্রহরে, বহু সন্ধ্যা, অনেক সকাল
মনে মনে বেয়ে চলি, আনি চেনা চল্লিশবছর ;
কানে শুনি, অভিন্ন মননে কিংবা উচ্চ মতান্তরে
সানুকম্প অগ্রজের, সহকর্মী সৌহার্দ্যের স্বর—

আকৈশোর বন্ধুস্মৃতি প্রৌঢ় এই বদ্বীপে মুখর ॥

১৫ জুলাই, ১৯৬০

## শ্রাবণ

শহরে বিষাদ বর্ষার মতো, বাংলার মতো,
চাঁদিনী আকাশে ভাসে আর ডোবে, হাসে।
হোক না যতই ছন্নছাড়া সে,
আশ্চর্য সে পরম আপন বড় প্রিয়জন কিম্ভূত এই শহর!
সন্ত্রাসে সংগ্রামে উল্লাসে ক্লান্তিতে তার প্রাণের নিত্য লহর।

থাক শত দোষ, হোক না হাজার ভুল।
কাকে দোষ দেবে? জীবনেরই ভুল, কমবেশি সেও দায়ী।
কত ফুল ঝরে কত চারা মরে মাটির স্তন্যপায়ী।—
তবু হে মালিনী, মালঞ্চ ভরো ফুলে,
মালাকার আর করবে না দেখো ভুল।

শ্রাবণের ঘন দিগন্তব্যাপী ধূসর মেঘের নীলে
ছোট ছোট মেঘ বর্ষাতি বেগে ছোটে,
যেমনটি যায় তেমার উধাও মুখের ঠোঁটের খোঁজে
আমার হৃদয় মাঠে ঘাটে খালে বিলে।

সন্ধ্যা দেখেছ? বর্ষাদিনের নটমল্লারে সন্ধ্যা?
মেঘের সপ্তবর্ণ আকাশে দিকে দিকে প্রাণবহ্নি,
শত অশ্রুতে অক্ষত আশা বর্ষার রাঙা সন্ধ্যা।—
তোমারও বন্ধ্যা ভাবনা, দেখবে, রাঙল।

রাত্রিগুলিকে জড়ো করে রাখো বীর-জগতের গুণ্ঠিত জিজীবিষায়,
যেখানে পার্থসারথি স্বয়ং ভদ্রাকে
প্রেরণা জোগান বীরের কাতর প্রেমিক হিয়ায়-তৃষায়।—
আমরা কি ভীরু, যেহেতু হৃদয় রাজপথে-পথে ভাঙল?

দিনগুলি গেছে একচ্ছত্র কর্মে, কে হারে কে জেতে
ধর্মযুদ্ধে অন্নবস্ত্র চেয়ে, জীবনের জলসত্রে।—
রাত্রি ঘনায়, পাড়ার যুগলমন্দিরে
মধ্যরাতের আরতি এবার ডাকে।
আজ থেকে কালে চলো যাই ধীরে ঘুমের গঙ্গা বেয়ে॥

১৬ জুলাই, ১৯৬০

# অথচ আকাশ বলো নীল

অথচ আকাশ বলো নীল
কলকাতারও আহত আকাশ !
ধুলায় ধোঁয়ায় তিলতিল
ফুসফুসের ধূসব সন্ত্রাস,
দুর্গতের বিবর্ণ নিখিল
যেখানে ঊর্ধ্বে প্রতিভাস ।
তবু তো আকাশ ভাবো নীল ।

সমুদ্র কোথায় পলাতক !
নদীমাতৃদেশের নদীর
হেজে-মজে তরঙ্গ আশ্লেষ
থেমে যায়, সর্বত্র খাতক ।
অন্তর্জলি: প্রেম চায় দেশ,
নিরুদ্দেশ নায়িকা বধির,
তবু প্রাণ জলে টলোমলো,

তবুও সমুদ্র নীল বলো !
ঢেউ তোলো গহিন হৃদয়ে
এখনও বাংলার নদী দেখে,
উচ্ছ্বাসে দুই বাহু বাঁধো
শূন্যের বেগ বুকে রেখে
আকৈশোর স্মৃতির বিজয়ে
প্রাকৃতিক সত্যের বিস্ময়ে ।

তাহলে দৈনিক ধোঁয়া ধুলা
কেন বলো করে রুদ্ধশ্বাস ?
ঘরের কোনায় কি আকাশ
নীল নয় ? কারো বাহুপাশ
তোলে না কি তরঙ্গ-আভাস ?
প্রাকৃতিক সত্যের আশ্বাস
বাবুদের পুচ্ছ রেনেসাঁসে
উড়ে পুড়ে গেল পরচুলা ?

৩০ নভেম্বর, ১৯৬০

## গ্রীষ্মনিসর্গ

দুদিকে বর্তুল চৈত্য,
প্রাকৃত বিজ্ঞানে গড়া পাথরে মাটিতে।
আর অন্যদিকে করভোরু সমান-লম্বিত দুই দীর্ঘ শিলা।
নেমে আসি সবুজ গালিচা কিংবা সবুজ পাটিতে, থাকে থাকে
যেখানে হঠাৎ রুক্ষ ডাঙা পৃথিবী রঙ্গিলা।
জানি না সে কোন্ চাষি দৈব পরিশ্রমে
কেটেছিল মাটি আর তুলেছিল বাঁধ, মাটির পাহাড়
জমির সৃষ্টিতে বহুদিন ধরে পেশীর বিক্রমে,
তারপরে হয়তো বা লেঠেল সেধেছে বাদ অথবা আইন—
কারণ, জমি যে রচনা করে জমি নাকি নয় তার।

নেমে আসি সেইখানে।
প্রবীণ কী কোমলতা এখানে সূর্যের,
স্নেহ ঝরে শিশিরে বৃষ্টিতে, মানবীর প্রেমে যেন,
দেবতার ছায়াময় গানে যেন
বাঁশিতে মেদুর হয়ে ওঠে বুঝি তীব্রস্বর বৈশাখী তূর্যের।

সে কীর্তনে জেগে থাকে বৃক্ষহীন সদ্য শষ্পভূমি,
আরত দুটিমাত্র খঞ্জনায় বিষাদের আখর ডোবায় ;
আর শফরীউন্মুখ স্বচ্ছ বাপীটুকু, প্রায় মানুষের মতো,
গ্রীষ্মজয়ী আকাশমুকুরে মরুর বিস্ময়,
যেন বা পৃথিবী দেহ মেলে দিয়ে গড়ে তোলে. দুর্গম রক্ষায়
ঢাকে জলাশয় ;
আর. উপরে সূর্যের হাসি প্রতীক্ষায় স্মিত, নিঃসংশয় ;
আর দুটি বন্যফুল ফুটে থাকে নির্বিত্তের শালীন শোভায়।

স্নিগ্ধ ঘাসে মাথা রাখি, আকাশে বিছাই চোখ কান।
কোথায় যে তুমি!

## বরং জেনো

হয়তো ঠিক তোমারই কথা, তুচ্ছতার গ্লানি
যখন চাপে গোটা দেশের মুখ—এবং মনও,
তখন বুঝি ভরসা শুধু লক্ষ্মী কল্যাণী
অথবা নানা রকম-ফেরে উর্বশীই কোনো,
তখন বুঝি নাট্য শুধু চা বা ফুলদানিই,
তুফান ঠেলে ঘরেই সাবা সাগরমন্থনও।
কিন্তু তুমি জানো কি কেন সন্দ্বীপের চরে
আত্মঘাতী শূন্যে সব মক্ষিরানি খুঁজি?
হাজা এদেশে বাঁজা সমাজে খঞ্জ পরিসরে
হৃদয় দিয়ে হৃদয় নিয়ে বাড়াতে চাই পুঁজি?
হয়তো ভুলে সতীকে ফেলে দিক্‌দিগন্তরে
সহজিয়ার সভ্য লোভে খুঁজেছি গলিঘুঁজি।
তাই বলে কি তাতানো ঝড়ে করব মাতামাতি
সংস্কৃতি মাথায় করে স্বাধীনতার চেলা,
কিংবা দশভুজাকে খুঁজে শ্মশানে পাঁতিপাঁতি
ঘুরব? নাকি কাঠের হাতে করব হাতাহাতি?
ইতিহাসের ফাঁক কখনও ভরাট করে ঢেলা?

বরং জেনো হে মঞ্জরী, একটি মুখে মেলা
আদি-অন্তব্যাপী গভীর আবেগ পায় বাণী,
মূর্তি পায়, সত্তা পায়। তাই তো প্রাণ, মনও
নেতির প্রেমে প্রতীক সাধে, জীবনপণ খেলা॥

২৭ ডিসেম্বর, ১৯৬০

## চেনা পাথর

এ পাথরে,
এ জলেও, শুনেছি, সেকালে পার্বণে উৎসবে
পুণ্য হত, বিশ্বাসী মানুষ দেখা পেত জাহ্নবীর,
পশ্চিমে যেমন সব পথে রোম মেলে।
শুনেছি এ জলে অন্তিমেও গঙ্গাযাত্রা সাঙ্গ হত
গঙ্গামায়ী হরহর বোম্‌বোম্‌ রবে।

অন্তত এটুকু স্থিরঃ
বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়,
আত্মীয় এ রৌদ্রজলে মসৃণ অথচ কঠিন পাথর।
ঢালু পাড়, তিতিরের ঝোপঝাড়, বালি আর পাথরে পাথর,
আর শাল পিয়াল পলাশ পিয়াশাল গম্‌হার শিমুল,
আর পাতার মর্মর আর ফুল আর পাখি, গাছে জলে—
এ নদী চোখের প্রিয়, কানের প্রাণের
আনন্দ, আরাম, শান্তি।

শৌখিন ? তা বটে,
শহরের পলাতক হৃদয়বিলাস—যাতে কটা দিন সভ্যতার ভুলভ্রান্তি—
ক্রমেই যা তীব্র হয়, প্রায় অগোচরে সাপ কিংবা ইঁদুরের মতো,
জীবনসংকটে,
যেমনটা হয় অন্নবস্ত্র সবেতেই মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে—
যাতে কটা দিন সভ্যতার গৃধ্নুতার পাপ
শস্তার টিকিট কিনে
আমাদেরও অংশীদারি অনুতাপ আরামে জানাই
নিসর্গের রূপসঙ্গে, প্রকৃতির মানবিক গুণে।

আমার আত্মীয় এই সজল পাথর,
আজ ডোবে ঘুমের কল্লোলে, কাল জাগে নির্নিমেষে,
গড়ন ধরন এব চাহনি মেজাজ দেখে শুনে ক্লান্তি নেই,
কখনও নিকষকালো কঠিন কর্কশ পরাজয়হীন,
কখনও ধূসর সহঅবস্থানে কিংবা সহিষ্ণু আবেগে রৌদ্রে থরথর
পিঙ্গল জটার মতো ;
অথবা কখনও জ্বলে মধ্যাহ্নের হিলিঅমে হীরকফলনে

তৃতীয় নয়নে যেন দক্ষের যজ্ঞের দিন—এই পার্বতীর দেশে
সাধারণ মানুষেব স্মৃতির তো ক্ষান্তি নেই।
শুনেছি, সেকালে ইনিই ছিলেন এ সুব্বার পুণ্যতোয়া খরস্রোত,
বালিতে পাথরে তারপরে
সাত আট পুরুষে নাকি বছরে বছরে
জল কমে, চর পড়ে, কাদা বাড়ে, পাহাড় পর্বত নুয়ে পড়ে ক্ষয়ে ক্ষয়ে
—যেমনটি অন্নবস্ত্রে টান পড়ে যত চক্রে মূল্য বাড়ে—
গ্রামে তাই কিচ্ছা করে সন্ধ্যায় নির্ভয়ে :
এ নাকি দেশের পাঁচশালা খেসারৎ !

আমার একান্ত প্রিয় এই নদী ঢালুপাড়, রঙের বাহার, ধ্বনি,
বালি, জল, বনানী, প্রান্তর, সখ্যে বাঁধা পাথর পাহাড় ।
আমি দেখি এই চেনা সাতনরি পাথরের গায়ে
বিম্বিত আমারই মন প্রাণ সকালে দুপুবে বিকালে সন্ধ্যায় সারাদিন
আর স্তব্ধ গ্রাম্য বাত্রে শুনি খেতের আড়ালে, নক্ষত্রপ্রহরী
সর্বকালে পরাজয়হীন জলস্রোতে পাথরের গান ॥

৩১ ডিসেম্বব, ১৯৬০

## ৩০শে জানুআরি

কমেছে ঘুমের সীমা ।
রাত কটা একটা না দুটা ?
নব্য রাধাবল্লভের মন্দিরের আরতি থেমেছে বহুক্ষণ,
যুগলেব পাট এখন নির্জন ।

বয়সে ঘুমের চাঁদ স্বপ্নময় কৃষ্ণপক্ষে যায় ।
শৈশবের ঢিমাচালে জাতিস্মব নিঃস্বপ্ন শুভ্রতা,
যৌবনের রক্তচ্ছটা প্রবীণের: সোনালি বিষাদ ।
হবিণের আকাঙ্ক্ষায় নিষাদ স্মৃতিতে এল
আরণ্যক সূর্যাস্তের সমারোহে বাত্রি আজ,
অসংলগ্ন উৎসবের ক্লান্তিতে প্রখর যেন নবাবি মহিমা !
ঘুমে আধঘুমে একদিকে রোমন্থন, অন্যদিকে বৃদ্ধ আশা,
আরো হিমাচল মোহে আরো উষ্ণ লোলুপতা,
যদিচ জীবন আজ আমাদের ঝুটা টুটা ফুটা ।

ঘুম যেন শূন্যে শূন্য আকাশ বা মহাসমুদ্রের তরল পাতাল,
আদিম আগ্নেয় জলে ঢেউ ওঠে,
মাঝে মাঝে শব্দের তরঙ্গে আসে ভেসে দূর সুর
মৃত্যুর ডাকের বেগে অথবা মৃতের শববাহীদের
আর্তনাদে ভয়ার্ত জন্তুর মতো প্রচণ্ড নিখাদে ।

কমেছে ঘুমের সুখ।
দূরে বাজে সাহেব-পাড়ায় গির্জার প্রহর,
নিয়ে আসে বিপুল পৃথিবী দীর্ঘ আপন আভাস,
নিয়ে আসে তন্বী পৃথিবীর পিতৃলোক বিরাট আকাশ
মহাশূন্য বেয়ে তীব্র অথচ উদাস, লয়ে লয়ে ব্যাপ্ত শব্দে,
ঘুমে আধঘুমে নিয়ে যায় অতলান্ত শব্দের বিশাল নীলে,
বিশ্বক্রান্ত খেয়া যেন অনন্তের পাড়ে পাড়ে,
চৈতন্যে ছড়ায় মহাশূন্যের ঈথর স্তব্ধতায় সন্তত মুখর।

হয়তো বা মোটরের সওয়ারির মালিকানা শিংভাঙা ডাক
হঠাৎ আকাশ ফাঁড়ে
ঘরমুখো তীক্ষ্ণ খোঁয়ারির ডাকে কিংবা ঘরে
নাভিশ্বাসে রোগীর বিপাকে।

অন্ধকারে ঘুমের জাগার অস্পষ্ট অসীমে
ডুবে যাই, চৈতন্যের মাথাটুকু তুলে তুলে ভেসে চলি
শহরে শহরতলি পার হয়ে গ্রামগ্রামান্তের
দেশে দেশান্তরে বিশ্বে মর্ত্যের প্রান্তেরও পরে
তারায় তারায় অন্ধকারে।

হয়তো বা ভেসে আসে ভয় ও উল্লাস করুণে ভীষণে,
অথচ উদাস ব্যাপ্ত নৈর্ব্যক্তিক আবিশ্বধ্বনিত সিম্ফনির
একটি কলির মর্মভেদী বহু প্রতিধ্বনি,
মানবিক, তবে ঠিক মানবিকও নয়;
হারায় শোকের কান্না যেন এক মত্ত বিদূষণে,
দোহারে দোহারে ধুয়ায় রেশের দমকে দমকে ব্যস্ত রলরোলে,
রাম নাম সত্যে নয়, আরেক হারামে,
কীর্তনিয়া ঐতিহ্যের অন্তিম আখরে।

রাত্রির হাওয়ায় স্রোতে চলমান বলো-হরিবোলে
শ্রোতাই দর্শক হয়, আর শব আর শববাহীদলে
অভিন্নাত্মা শ্মশানবন্ধুত্বে আর অন্ধকারে স্তব্ধতার বিশালতা চিরে
ঘুমে স্বপ্নে আধঘুমে নীলাকাশে
আকাঙ্ক্ষার প্রাণময় মদালস স্মৃতির নক্ষত্র ভাসে গ'লে গ'লে
আশ্চর্য সহিষ্ণু শুভ্র সমুদ্রের অনন্ত আভাসে॥
৩০ ডিসেম্বর, ১৯৬০

# মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে

"আমি আমার পৌত্র হইতে ইচ্ছা করি" ।—ভবিষ্যৎ তাঁহার চক্ষে এমন লোভনীয় বলিয়া ঠেকিয়াছিল । কিন্তু শতসহস্র লোক আছেন, তাঁহাদের উক্ত প্রশ্ন করিলে উত্তর করেন, "আমি আমার পিতামহ হইতে ইচ্ছা করি ।"—রবীন্দ্রনাথ

শোচনা নেই, তাই তো আজও পৌত্র প্রপৌত্র
হবার সাধ আমারও আছে, কৌতূহল অসীম
এবং আশা অমর, তাই তাকাই সেইকালে,
যদিও আজ দিনের বাঁচা নিয়েই হিমশিম,
তবুও ভাবি আজের গিঁট কালকে কোন সূত্র
খুলবে, ভেবে প্রবীণ গান জমাই চৌতালে ।

এটাও ঠিক, যাঁরা সদাই পিতামহের কালে
বাসা বাঁধেন, তাঁদের দলে আমার নেই ইয়ার,
যদিও প্রায়ই আমারও মন পিতামহের যুগে
অথবা তারও অনেক আগে বাংলাদেশী চালে
ঘুরে বেড়ায়, গ্রামের পথে মেটায় জ্বালা হিয়ার
কলকাতার ছন্নছাড়া উন্নয়নে ভুগে ।

জীবনে বহু পেয়েছি স্বাদ, তাই জীবনচিত্র
ব্যাপ্ত দেখি দূর অতীতে আর ভবিষ্যতে ।
সাধ মেটেনি, জ্বালাও ঢের, আহিতাগ্নি আশা
আজও অমর, তাই তাকাই আরেক পানিপথে—
নিশ্চয় শেষ শান্তি হবে, পৌত্র বা দৌহিত্র
আমারও তাই হবার সাধ, কারণ ভালোবাসা

ক্রমেই বাড়ে, যদিও রোজ বাঁচার প্রাণপাতে
আমারও প্রাণ দেশের কোটি গলায় বলে, ধিক্ ।
জানি অচিরে মিলন হবে স্তালিনে খ্রুশ্চেফে,
পিতামহের স্বপ্ন বাঁধা প্রতি নাতির হাতে ।
আমারও তাই মনটা ছোটে আরেক স্পুৎনিক,
শূন্যে নয়, মানবলোকে ভবিষ্যতে চেপে ॥

৩ জানুআরি, ১৯৬১

## এ মৃত্যুসংবাদে

এ মৃত্যুসংবাদে ঝরে মরে গেল মনের বকুল,
কাগজের কোণে—এই দ্বিতীয় মৃত্যুর।
সেবারেও মৃত্যু বটে, যখন সে, ভুল সব ভুল—
এই বলে চলে গেল, হাত ধরে, আরেক মিত্রের।

তবু এতদিন ছিল অস্তিত্বের অশরীরী তাপ
স্মৃতির সুগন্ধে ভরা আঁচলের হাওয়া-ঝরা ফুল।
এই মৃত্যু ঘোর মৃত্যু, পত্রপুষ্পে বিরাট বকুল
আজকে উন্মূল হল। আজ মাটি দগ্ধ অভিশাপ ॥

৮ জানুআরি, ১৯৬১

## লণ্ঠন জ্বেলে

পাণ্ডুর চাঁদা ডুবে গেল ঐ ঊর্মিধবল নীলে,
আমার সময় অসময় একাকার ;
নৈঃশব্দ্যের ঢেউ ভেঙে পড়ে ঊর্মিতরল নীলে
একটি দীর্ঘশ্বাসে।

অতল জলের অশ্রু এবং বিবর্ণ মহাকাশে
চিরকাল বুঝি করে যাব পারাপার।

ভাবি অন্যথা হত কি তোমাকে দিলে !
কিছুই কি হত অন্যথা ?
তাই ভাবি বিনা প্রত্যাশে,
অমাবস্যায় বিবেচনা করে দেখবে আরেকবার
লণ্ঠন জ্বেলে পড়বে আমার কথা ?

১৭ জানুআরি, ১৯৬১

## যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে

উদাসীন চোখে দীর্ঘপক্ষ্ম ভিড়ে
কার যাতায়াত ? চিরকাল উদ্‌ভ্রান্তি !
চেনা-অচেনায় চেতনায় কোথা ক্ষান্তি ?
উভবলী ঐ হৃদয়ে উষ্ণ নীড়ে
সে কোন্ আকাশ বাসা বেঁধে পায় শান্তি ?

ওগো মনসিজা, তুমি যে চাইলে ভিক্ষা
অতনুর আয়ু ত্রিকালের পদপ্রান্তে,
সে কি শুধু মনুপরাশর-মাপা শিক্ষা ?
সে কি নিতান্ত প্রথা-মতো ? তুমি জানতে
প্রেমের তৃপ্তি-অতৃপ্তি একই দীক্ষা,

চির-অস্থির উদাত্ত এক শান্তি,
যেমন জেনেছে চণ্ডীদাস বা দান্তে ?

১৮ জানুআরি, ১৯৬১

## আগুন

হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠো ওই তো আগুন !

পথ বেয়ে উঠে চলি,
চড়াই-এর মোড়ে দেখি দিব্য আবির্ভাব
শৌখিন বাগানে কার শালপ্রাংশু রুপালি মসৃণ

ইউক্যালিপটস্ বেয়ে ওঠে বহু বুগেনভিলিয়া
লাল তামা কমলা হলদে মিলে
জ্বেলে দেয় উঁচু উঁচু আকাশের টানে লেলিহ আগুন

তখন মাঘের শেষ, শীত আর বসন্ত বেজোড়ে
গদ্যছন্দে লেখা, কারণ বাগানে স্মিত তখনও গোলাপ
একটি তোড়ায় বাঁধে মাঘ ও ফাল্গুন !

আবার আজকে দেখি সেই দৃশ্য রঙের সম্ভারে
সেই সতেজ গৌরব ।

উদ্ভিদ অমর প্রাণ, চিরন্তন তাদের সদ্ভাব ।
অথচ হৃদয় বুঝি বর্ষভোগ্য জীবনের ভারে
মাঘফাল্গুনের পাতা, ঝরে যায়, কিংবা ফুল
মরে যায় প্রিয়া ?

২১ জানুআরি, ১৯৬১

## হেমন্তের কানে কানে

হেমন্তের কানে কানে বসন্তের উষ্ণ দ্রুত পান
অথবা সূর্যাস্ত-ঘোরে চোখে দেখি সারঙ্গ খেলায়
এই রৌদ্র এই ছায়া, দূরদেশী রাখালের ছেলে
যখন আমার মাঠে বটের ঝুরিতে বাঁশি ফেলে
গল্প করে সেই মেয়েটির সঙ্গে হাটে বা মেলায়
কাল যাকে চিনেছিল, হাসি যার ঝরনায় অম্লান ।

অঘ্রানের ভোরে যবে শিশিরে হৃদয় ভেজে মাঠে,
শেফালির ভিড় কমে, আগন্তুক যখন গোলাপ,
তখন আমার প্রাণে পশ্চিমের বাতাসী বিলাপে
হঠাৎ ঘনায় দূর শ্রাবণের কেকার কলাপ,
অবিরাম মনে পড়ে কেয়ার গন্ধের পুবে ছাটে
যৌবনের যন্ত্রণার অশ্রু-ঝরা, আভূমি-সন্তাপে ॥

২০ মার্চ, ১৯৬১

## সনেট

যখনই আকাশে বহু সুর তোলে সন্ধ্যার পশ্চিম
তখনই তোমার মুখ সত্তা পায় স্পষ্ট অবয়বে,
তন্নতন্ন আমার হৃদয়ে, জাগে নক্ষত্র উৎসবে
তোমার আনত আভা, আগের সে আয়ত রক্তিম
মিশে যায় চৈতন্যের ধারাজলে পাণ্ডুর অসীম,
সমস্ত স্নায়ুর দীর্ঘ ইতিহাস ভেসে ওঠে যবে
একটি দেহের দূর মেঘময় অজন্তা বৈভবে,
যেখানে প্রবল তীব্র বিগতও বর্তমানে হিম ।

এসো নেপথ্যের নিরাপত্তা ছেড়ে প্রত্যক্ষ নাটকে,
ওঠে তো উঠুক ঝড় তোমার নির্দিষ্ট রাত্রিদিনে,
ডোবাব আমার নীলে অন্ধকার অথবা সন্ধ্যার
ইন্দ্রধনু বেঁধে দেব প্রাণ ভরে যন্ত্রণাই কিনে,
বন্যায় ঐশ্বর্যময় হয়ে যাবে হৃদয় বন্ধ্যার ।

কী-বা আসে যায় কিছু ভাবে যদি তোমার পাঠকে ॥

১৯ এপ্রিল, ১৯৬১

## রবীন্দ্রনাথ

বিনিদ্র শতাব্দী ব্যেপে দিনরাত্রি বেঁধে যে সূর্যের
দীর্ঘ আয়ু একাধারে বাঁশি ও তূর্যের,
কুসুমে ও বজ্রে তীব্র যার সদা ছন্দায়িত প্রাণ,
ধ্যান যার সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তে বিধুর যার গান,
সেই তো বিশ্রামহীন মধ্যাহ্নের কর্মিষ্ঠ রৌদ্রের
প্রাবল্যে চেয়েছে ফল ফুল আর আউশ আমন,
যেখানে সবার হতে অধম ও সর্বহারা দীন,

চেয়েছে যে প্রতিদিন দেশব্যাপী সর্বতোভদ্রের
সর্বত্র সকলে হোক সচেতন সচ্ছল ও সুখী।

হে বন্ধু তোমরা বলো কেন তবু বলিষ্ঠ মননে
আলোকিত নিত্যকর্মে আমরাও সৌন্দর্যে স্বাধীন
সর্বদা উদ্‌গ্রীব নই, লক্ষ লক্ষ চিত্ত সূর্যমুখী ?

২৮ এপ্রিল, ১৯৬১

২

এখন কি বোঝো তুমি বিপরীতে এক অভিন্নতা,
রবীন্দ্রনাথের কথা : সৌন্দর্যের আনন্দ-বেদনা ?
স্মৃতির মর্যাদা পেলে আকাঙ্ক্ষায় রাঙে যে তীক্ষ্ণতা,
সে তীব্র বিষণ্ণ হর্ষে কেন তুমি হবে ম্রিয়মাণ ?
জটিল আনন্দে আর বেদনায় বিস্তৃত চেতনা
যে আবেগে মূর্ত, তাতে পূরবীই ইমনকল্যাণ।

যৌবন বিষম কাল ! জীবন বা প্রেমের বাউল
এখন কি সাজে ওরে ! একমাত্র দীর্ঘ ইতিহাসে
সতত রচনা করে আকৈশোর, নিত্য অভিলাষে
একটি অখণ্ড সত্য অভিজ্ঞতা, স্নায়ুতে বিকাশ
বাঁধে, তাই এক হয় ইচ্ছামতী অথবা তিতাস—
এমনি হাজার নদী—গঙ্গা পদ্মা শোন বা কিউল।
সংক্ষিপ্ত মুহূর্তে কোথা, সংলগ্নেরই স্মৃতিতে অধরা
বাঁধা যায় নিজেকে—ও শুদ্ধকাব্যে নব্য পরম্পরা ॥

৩

এ কী অভিশপ্ত দেশ, তিক্ত রৌদ্রে শূন্য মরুভূমি।
চৈতন্যেও নিরুদ্দিষ্ট নির্মঞ্চিত নিরাকার ঘৃণা।
কালবৈশাখীর নিত্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিবাদ বিনা
ঈশান উমার বিয়ে সে কোন্ শ্মশানে তা জানি না ,
সভায় কাগজে বাজে ঢাকঢোল—কারো বা ঝুমঝুমি।

আকাঙ্ক্ষার কোথা মেঘ, রিক্ত রৌদ্রে ঘৃণার **বৈকালি,**
রুগ্‌ণ ক্ষিপ্ত পূতিগন্ধ পথে পথে ত্যক্ত আবর্জনা
সভায় কাগজে বৃথা স্তোক-স্তুতি—অথবা গঞ্জনা ;
বাক্যবন্যা নিরুদ্দিষ্ট গর্জন বা খেয়ালি বন্দনা ।
বৈশাখী কি জমে শুধু খালি হাতে তুড়ি আর তালি !

ব্যথাময পূরবীর অগ্নিবাষ্পে তৃষ্ণার্ত কাঙালি
এ বড অদ্ভুত রাজ্য, ছাব্বিশে বৈশাখে মরুভূমি !
রবিশস্য দগ্ধস্তূপ, ঈশানে প্রস্তুতি নেই কিনা ।

সমুদ্রে পাহাড় বেঁধে সাজাবে না বাংলার আঙিনা ?
শতাব্দীব সূর্যে এসো অভীপ্সার তীব্র মেঘে তুমি ॥

৯ মে, ১৯৬১

## যে হাওয়া হেমন্ত গান

যে হাওয়া হেমন্ত গান হানে তীক্ষ্ণ হিম হাড়ে হাড়ে,
সে তো পাতাঝবানোর সে তো শোককরানোর গান,
শুধুই আসন্ন ক্ষোভ অসম্পূর্ণ সাধে ম্রিয়মাণ,
যে হাওয়া ঝরায পাতা মানুষের, তাতে শুধু প্রাণ—
যে জৈব প্রাণের তীব্র হাহাকার দিনে দিনে বাড়ে—
নিষাদকে দুষ্যন্তকে যেন বলে, মেরো না হে বাণ ।

আমি নই অন্ধমুনি, অন্তত এখনও নই বটে ।
মনে নেই মজানদী, সরযূ বা ফল্গু বা তমসা ।
এখনও মেটাই তৃষ্ণা হৃদয়ের দুর্মর পাহাড়ে
বৃষ্টিজলে নির্ঝরের হীরকে মেটাই মুঠি মুঠি,
আজো তাই আনন্দিত ইন্দ্রিয়ের পঞ্চম সংকটে
ভুলে যাই যথোচিত সময়ের সংগত ভ্রূকুটি।
হেমন্ত হাওয়ায় কবে কে কোথায় হয়েছে ছাপোষা ?
বাসন্তীর গান স্মৃতিতীব্র পাকাধানে হাড়ে হাড়ে ॥

৬ জুন, ১৯৬১

## শতবার্ষিকী

তোমার কী দায় বলো এ ওর রোগে,
কে মাতে কোথায় নিজ ছায়ার নেশায়,
কোথা কে শৃগাল ছোটে কীসের ধন্ধায়,
কোন্ অশ্বতর কান ফাটায় হ্রেষায়,
তাকে রাখো দূরে আজ পঁচিশে বৈশাখে।
আর ওই পাহাড়ে চড়ো, প্রাণমন ভরো,
উৎসে যাও অলকানন্দায়।

কোথায় কে কী-বা বলে, কী লেখে কোথায়,
জলাতঙ্কে ভোগে প্যারানইয়ার চিৎকারে,
কে ছোটে কোথায় সারা দেশের ধিক্কারে
সে নয় তোমার দায়, বাইশে শ্রাবণে
দায়িত্ব তোমার : সারা বাংলার মনে খুঁজে পাওয়া উত্তরাধিকার,
পাহাড়ের স্রোতে নামা নদীর সোঁতায়।
সমতলে স্রোত গড়ো, প্রাণমন ভরো ॥

৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৬১
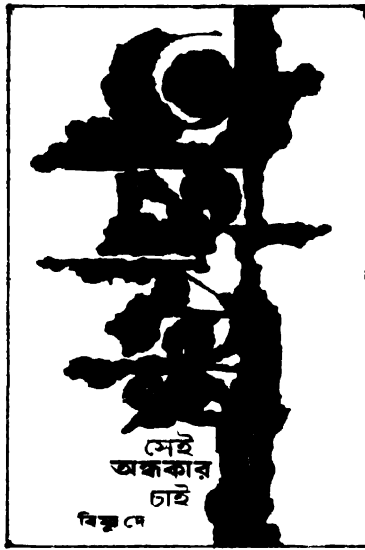
# সেই অন্ধকার চাই

সূচিপত্র

## সেই অন্ধকার চাই

ঘন বন, বহুদূর-বিস্তৃত এবং জন্তুতে ভয়াল,
বহু সরীসৃপ, গুপ্ত হত্যার আড়ত, অন্ধকারে তীক্ষ্ণ অন্ধকার,
হিংস্র চিতা নেকড়ে আর হায়েনা, শেয়াল
বিশ্বাসঘাতক বহু জন্তুতে ভয়াল

থেকেছি সে-বনে, নীল আকাশ দেখিনি,
নিশ্বাসে টেনেছি ভিজা মাটির মস্তিতে
বাষ্পময় প্রকৃতির অসুস্থ বাতাস
যে-বাতাসে অন্ধকারে স্বভাবত ফুলে ওঠে গোখরো, ময়াল ।

থেকেছি বুর্জোয়া বহু দেশে গ্রামে শহরে বস্তিতে,
বহু জন্তু সরীসৃপ কাজ করে, করে বিকিকিনি ;
দিবা-দ্বিপ্রহরে ঢাকে কালো ছায়া হৃদয়ে-হৃদয়ে
অন্ধকার দিয়ে ঢাকে লালদিঘির লাল অন্ধকার ।

অন্য অন্ধকার আছে ? তা-ও চেনা, থেকেছি নিবিড়
ঘন নীল অন্ধকারে, স্পন্দমান ছন্দে অতল স্মৃতির হর্ষে ভয়ে
কাব্যের আদিম গর্ভে যেখানে করেছে মহাভিড়
লক্ষ-লক্ষ জীবন-মৃত্যুর ক্ষিপ্র দিব্য অন্ধকার ।

থেকেছি সে-অন্ধকারে, সেই অন্ধকার চাই শরীরে, হৃদয়ে ,
সেই বনে হিংস্রতাও স্বাভাবিক, সৃষ্টিময়, মধুর দয়াল ;
মৃত্যু নয় দীনহীন আপাতিক, নয় সামাজিক ভয়ে
অথবা হাজার জন্তুর দন্তুর নখী মানবিক শোষণে ভয়াল ॥

১১ ডিসেম্বর, ১৯৫৮

## পুত্রাসো যত্র পিতরো ভবন্তি

অনেক শরৎ চেয়ে গড়েছি যে-ঘর,
গ্রীষ্মের বর্ষার অন্তে বছর-বছর,
তোমার বাইশে আর আমার পঁচিশে
ভাবি, জোড়ে যাব দুই শতায়ুতে মিশে

আবার স্বপ্নও দেখি তৃতীয়ের মুখে
আজকাল, উভয়ত স্নেহেব কৌতুকে ।
শিশুর হাসিতে দেখি, কান্নায় চিন্তিত,
বাছার কী হল, হই সর্বদা শঙ্কিত ।
বর্তমানে আমাদের ঐকান্তিক সাধ
দিনে-দিনে বড় হোক ঘনিষ্ঠ জল্লাদ,
হাঁটি-হাঁটি পায়ে-পায়ে বাছার জীবন
পরিণতি পাক, আহা যমই পৃযন !

জল্লাদকে কোলে তুলি, হৃদয়েব তাপে
কুঁকড়িয়ে ঘুমায়, সুখে ঠোঁট দুটি কাঁপে ।
তোমাব তেইশে আব আমাব ছাব্বিশে
এক বছরের মৃত্যু প্রাণ পায় মিশে ।
দিনে-দিনে অপত্যার্থে আয়ুব বিয়োগ,
তাইতেই আমাদের আয়ুবৃদ্ধি যোগ ॥

১৫ সেপ্টেম্বব, ১৯৩৬
পুনর্লিখিত—৬ ফেব্রুআবি, ১৯৫৯

## সেই ভাষা

(আবু সয়ীদ আইয়ুবের জন্য)

সেই ভাষা ভালো লাগে সদা সর্বদাই,
যে-**ভাষায়** আকাশের আবেগ ঘনায়
নীলাঞ্জন অন্ধকারে বাহিরে ও ঘরে
দৃষ্টির আসন্ন বাষ্পে মায়াবী প্রহরে ;

রাগে না কি অনুরাগে চোখের কোনায়
হঠাৎ বিদ্যুৎ চেরে, তারই ধরতাই
হৃদয়ে উত্তাল বাজে বিরাট অম্বরে।

সে-ভাষায় আত্মদান করে পরস্পরে
চোখে-চোখে মুখে-মুখে একাত্ম আশ্লেষ,
সেই ভাষা ভালো লাগে, যখন আবেশ
ঘনঘটা করে আসে বৃষ্টির আগের
মুহূর্তের মতো, যেন বিপ্লবী রাগের
সমস্ত আবেগ রুদ্ধ সংবৃত প্রহরে
যখন ইতর মিথ্যা নির্লজ্জ ডম্বরে

ধূর্তেরা ছড়ায় জাল উদ্যত বিদ্যুৎ,
অথচ কোষেই ব: বজ্রের আঘাত ;
কণ্ঠ স্থির, চোখে শুধু অগ্নিমেঘ জ্বলে,
সেই ভাষা ভালো লাগে নিষ্কম্প নিবার্ত
স্থিতপ্রজ্ঞ, তার পরে, নিয়মের বলে,
ছলে নয়, যদি মেঘে বর্ষেই প্রপাত,
তখন ? তখন বটে মাতে পঞ্চভূত।

এ-কথা জানেন ভালো নাম্বুদিরিপাদ,
স্তব্ধতা সংহত তাঁর নির্বিবাদ স্বরে :
স্তব্ধ মেঘ বর্ষে সদা বলেছে প্রবাদ,
তাই পূর্বমেঘ ভালো, যেন বা রতির
বিষাদ নিরুদ্ধ হয় শিব-পার্বতীর
প্রেমের মুদ্রায় ক্ষিপ্র কুমার-প্রহরে,
উদ্ভাসিত নীলাকাশে বিস্মিত প্রসাদ ॥

১০ জুলাই, ১৯৫৯

## তাকারে জাগাবে

তুমি যে তাকারে ফের আবার জাগাবে ঘুম তাতে
অনিদ্রার শিখরেও ছিল না সন্দেহ ।
তাই তো ডুবতে পারি নির্ভয়ে তলায় অতল দিঘির জলে,
জানি আমি তোমার দু-হাতে ভাসে আলিঙ্গনে মন দেহ চৈতন্যের তলে-তলে

আমি আশাবাদী বলো ? আশা তো স্বভাবে,
প্রকৃতিতে, যেমন বৃষ্টিতে ঘর্মাক্ত কাদাতে দেখেছিলে ফুল ফোটে
সোনালি দিঘির পাড়ে নায়রের বিচিত্র বাওবাবে ।

আশা যেন নিকিতার অক্লান্ত সফরে
দেশে-দেশে ঘুরে যায় আশা শান্তি যাতে চিরতরে
আণব সমর কিংবা—এমনকি স্থানীয় লোকের মৌখিক বড়াই—
তার উরুতে চপেটাঘাত ক্ষান্তি মানে
দেশে-দেশে, ভালোয়, মন্দেও ।

তোমার তিব্বতি হিম গলবে আর কপিল গুহায়
বইবে গাঙ্গেয় ধারা, সে-বিষয়ে করি না সন্দেহ
অনিদ্রার শিখরেও ।

দিন ওড়ে, উড়ুক না ধুলার চাদর,
গোধূলিতে কালবৈশাখীতে এসো তুমিই সম্বল স্বপ্নের সুপ্তির,
তুমিই তো সকালের হিম-হিম সুরে
তাকারে জাগাবে ফের গোলকচাঁপার গন্ধে ॥

১ এপ্রিল, ১৯৬০

## এ কেবল ভাষার যন্ত্রণা

তোমার আঙিনা জুড়ে কেন আঁকি প্রত্যহ আলপনা,
কেন যে নিঃশব্দে কিংবা পল্লবিত নাম-সংকীর্তনে
প্রায় অষ্টপ্রহরের স্তব্ধতায় বাংলা আখরে

প্রাণের আহুতি জ্বালি হৃদয়ের অধরে-উত্তরে
আমার জাগর স্বপ্নে দ্বৈতছন্দে অদ্বৈত নৃত্যানে
—সে কি সৃষ্টিময় বৃদ্ধ স্বভাবের দুরন্ত কল্পনা ?

প্রশ্ন কেন, কোথা শেষ ? অন্তিমের নেই কোনো শেষ।
আদিরই বা উৎস কোথা, কেন খোঁজা অন্তেই নির্দেশ ?
আমি আছি বর্তমানে, দীর্ঘায়িত ঐশ্বর্যে বিধুর
অপর্যাপ্ত স্মৃতিভারে তোমার জীবন্ত ব্যক্তিত্বের
স্তরে-স্তরে গড়ে তুলি ভাস্কর্যের চিত্রল প্রেরণা
জরিষ্ণুর তীব্র হাতে শক্তি ঢালি সংহত চিত্তের।
তুমি কি অবাক, ভাবো, এ কেমন ভাষার যন্ত্রণা ?

অশোক কি উদ্ভিদ মাত্র, পুষ্প যার তোমার শীধুর,
প্রাণস্পর্শে ফোটে, যার বসন্তের অমর চেতনা ?

১০ জুন, ১৯৬১

## হয়তো বৃথাই

হয়তো সে চেনে আমাকে মেঘের ছায়ায়,
হয়তো মোটেই জানে না শূন্য নীলে।
অথচ আমারই হৃদয় সে তনু কায়ায়
মুখের তন্ন তন্ন ছবিতে মিলে
উধাও নিত্য নাক্ষত্রিক মায়ায়।

হয়তো বৃথাই। হয়তো উপমা চিলে,
একার আকাশে উড়ন্ত হাহাকার।
কিংবা স্থিতিই যদি মেলে একবার,
সে বুঝি একটি সারস, চলনবিলে
একটি পা তুলে চাল দেখে দুনিয়ার।

তবু রোজ ভাবা সে যে কার ভারি পায়ায়
সন্ধ্যাতারাকে নামাব শিশির ঢেলে !

৩০ অক্টোবর, ১৯৬১

## সে কখনও

জীবন আরতি যাব সে কখনও মৃত ইতিহাসে
প্রশস্তি খোঁজে কি ক-টা লাইনে বা কয়েক পৃষ্ঠায় ?
যে সারা জীবন দেয় ভিক্ষু যেন হেবজ্র-নিষ্ঠায়,
সে কখনো ভোলে যশে জাদুঘরে অমৃতে বিশ্বাসে ?

ভবিষ্যতে কার লোভ ? হ্যাঁ, অতীত বীরভোগ্য বটে,
অতীতেরই গর্ভে স্তন্যে জন্ম বৃদ্ধি পায় বর্তমান ।
ভবিষ্যৎ যদি দেখি দেখি সেই গঠনসংকটে,
নচেৎ সর্বদা প্রেমে জীবনেরই আকণ্ঠ সম্মান ॥

১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১

## নিসর্গ-ভাষ্য

এখানে শুধুই পলাশের লাল লাস্য,
এখানে নেইকো খয়েরের কাঁটা বঞ্চনা ।
উন্নয়নের নেই ফাঁকা পরিকল্পনা,
প্রকৃতি শুধুই পথ বেঁধে দেয় এখানে ।
তাই নরনারী স্বচ্ছ অশ্রুহাস্য
সহজেই বাঁধে সাধারণ্যের সন্ধানে

আর ভয় নেই, রূপসীর গ্রীবাভঙ্গে
চলে এসো হাতে হাত পেতে দাও রূপকে
দীর্ঘকালের দ্বৈতাদ্বৈতে রঙ্গে
পক্ক প্রবীণ মিশুক নবযুবকে।
তোমার পায়ের কাঁটাগুলি তুলে হৃদয়ে
অনেক স্মৃতির পাতা গাঁথি স্মরবিজয়ে।

নির্ভয়ে চলো এদিকে শুধুই নির্ঝর,
শ্যামল শষ্প, রৌদ্রে ও মেঘে মসৃণ
শিলার নিদ্রা, নীলাকাশ ঈশাবাস্য,
স্তব্ধ গানের ক্ষিপ্র স্রোতের রাতদিন
প্রহরে-প্রহরে তোমাতেই করে নির্ভর,
তোমার শরীরে নিসর্গ পায় ভাষ্য ॥

৮ ডিসেম্বর, ১৯৬১

## বেয়াত্রিচে

আমিও সৌভাগ্যবশে তোমাকে দেখেছি বেয়াত্রিচে
নববাসন্তীর কুঞ্জে নিজে পরিয়েছি গুঞ্জামালা
তোমার অমর কণ্ঠে, তৃতীয় স্বর্গের আলো-জ্বালা
নভোময় এ-হৃদয়ে, যদিও বেঁধেছি বাসা নিচে
বিপর্যস্ত পৃথিবীর তেপান্তরে চৌরঙ্গির পিচে
ছদ্মবেশী নরকের কোলাহলে বেসুর বেতালা,
যেখানে ভিখারি ম'রে গান করে জীবনের পালা
পাঁচতলায় যখন চলে টুংটাং পেয়ালা-পিরিচে।

আমিও শুনেছি দিব্য বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহিমা,
দেখেছি নিজেরই স্নায়ুতন্ত্রে শুকতারার সংগীতে

তোমার ভাস্বর প্রেম আসমুদ্র সমস্ত মর্তের
সর্বজীবে মিলিয়েছে, তবু কেন লুব্ধ আবর্তের
প্রতিবেশী আর্তনাদ, তবু কেন শক্তির সংবিতে
শান্তি নয়, সখ্য নয়, চায় বিশ্বে চায় হিরোশিমা ?

১০ ডিসেম্বর, ১৯৬১

## প্রশ্নপত্র

তার তুলনা কি চিরচেনা কলকাতা ?

দুস্থ দিনের অসুস্থ রাত্রির
শহরে যেমন **চলে** যায় মন দূর
আকাশে বাতাসে মাঠের সচ্ছলতায়
ভিড় ঠেলে-ঠেলে হাওড়ায় রেলযাত্রীর
দুর্ভোগ সয়ে, এই শহরে কি মাতা-
মাতি করে মন, প্রেমিক বা বন্ধুর
জন্যে যেমন করাটাই সংগত ?
না কি এ-তুলনা ভাবছি দুর্বলতায়
জরা যেমনটি ভাবে যৌবনলোভে ?
অথবা যেমন রাজনীতি যদি ভোগে
তখন অনেকে শেয়ারবাজারে ইষ্ট
প্রতিষ্ঠা করে অথবা দেখায় পৃষ্ঠ
বিপ্লবকে বা প্রতিক্রিয়াকে কেউ ?

যতই আত্মজিজ্ঞাসা করে হেয়,
নিশ্চিত জানি ততই আমরা দু-জনে
যে-মানসলোকে বাস করি, তার শুদ্ধি
আমাদের সব শান্তি কেড়েছে অনুপম
একটি বিরাট শান্তির চির অস্থির
দিনরাত্রির স্বপ্নে । এ শুচি বুদ্ধি

জানি আমাদের ছেড়েছে মুষ্টিমেয়
মানুষের মাঝে যেখানে স্বেচ্ছাবশত
আনন্দ লাল আর নীলাকাশ জঙ্গম
হাজার চূড়ায়-চূড়ায় লক্ষ ঢেউ।
ভালোই জানে সে, আমাদের গাঢ় কূজনে
বিশ্ব হাজার খুশি হাতে দেয় তাল।
তাই বুঝি তাকে পাশে খুঁজি অস্থির?
কলকাতা ফের গড়ে দিতে হবে দু-জনে?

৩০ জানুয়ারি, ১৯৬২

## এখানে

তবে যাও, যাবে যদি আসি বলে তবে
বসন্তের নির্মম গৌরবে।

এখানে অসীম ধৈর্য, পৃথিবীর মতো
সর্বংসহা বাঁচা অবিরত।
এখানে বিস্তৃত আয়ু, অভিজ্ঞ বৎসর,
হিমে-হিমে বায়ুস্তব্ধ ঘর।

যাও তবে পল্লবিনী লতার সঞ্চারে
যৌবনের সুললিত ভারে।

বর্ষা যবে মরুভূমি, যখন নিদাঘে
অশ্রুবন্যা স্বাভাবিক শাপ,
এখানে তখন যদি আস ক্লান্ত মাঘে

হৃদয়ের গৌরীশৃঙ্গে, তৃষ্ণা যাবে সতীর ভৃঙ্গারে,
অন্ন দেবে নন্দী বস্ত্র পার্বতীর বাঘে,

দেবো আমি চিরস্থায়ী তুষারের বাহুবন্ধ তাপ ॥

৩ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## কোনো পেত্রফ যেন পেত্রফার জন্য

তবু হার মানা নয়, ক্রন্দসীর জলে
সূর্য হোক ডুবুডুবু, তোমার আমার
আকাশে-আকাশে শুনি তরঙ্গ-আঘাত
সূর্যহীন তমসার, তবু বার-বার
বলে যাব—যতই না শূন্যে জলে স্থলে
যবনিকা মেলে ধরে মূর্খ অন্ধকার,
আলোর মহিমা দেখি অতল অপার।
তাই স্থির চোখে দেখি যত পদাঘাত
ধূসরের দাস করে শুভ্রকে কালোকে
সবই ব্যর্থ। সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তে বা রাত্রে
মধ্যাহ্নের অগ্নি রাখি যে রক্তিম পাত্রে
সে-হৃৎপিণ্ডে মুহূর্তের অসীম আকাশ
বহ্নিতে অতন্দ্র, প্রতি প্রাণীতে পদার্থে
যে দীপ্তির দিন আর রাত্রির আভাস
সে-বিদ্যুৎ রক্তে ধরি, মন্দকে ভালোকে
সূর্যঘট জ্বেলে জানি। আঁধারের স্বার্থে
এ-আলোর মৃত্যু কোথা ? সূর্যাবর্ত ছেড়ে
সমস্ত আকাশ জুড়ে নয়নাভিরাম
চোখ বোজো দেখ মুঠি-মুঠি আলো পেড়ে
তোমার হৃদয় ভ'রে আমিই দিলাম ॥

৮ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## পৃথিবীর নববধূ

পৃথিবীর নববধূ আজ প্রৌঢ়া সচ্ছল গৃহিণী,
তাই পরিণত মুক্তি বিলায় সে অকাতরে,
সাবালক আপন সংসারে কর্তৃত্বে ঢাকে না
ছেলেমেয়েদের স্বত্বে সে বেঁধে রাখে না,
ছেড়ে দেয় নব-নব নিজ-নিজ ঘরে,
সাজায় যে যার ঘর, নিজেরাই করে বিকিকিনি ।

হয়তো বা মায়া জাগে, মমতার ক্ষমতার লোভ,
কর্তার অভ্যস্ত কানে নিভৃত বিশ্রামে আলোচনা
মাঝে-মাঝে হয় না কি ! তবুও দাম্পত্য-শান্তি
বিরাজে গৃহিণী আর কর্তার বপুতে, তার কান্তি
ছেলেরা পেয়েছে, আর একমাত্র কন্যা গোরোচনা ।
অবশ্য আপদ আছে বিপদ অসুখ মনোক্ষোভ ।

তবু ভালো লাগে এই পৃথিবীর সম্পূর্ণ যৌবন.
সন্তানেরা সবাই স্বাধীন অথচ স্নেহার্থী
যায় কাজে কৌতূহলে দেশে দেশান্তরে
নিজ-নিজ নব-নব ঘরে গ্রহে গ্রহান্তরে,
যে যার চিন্তায় সংসারেই মনোযোগী, অথচ সবাই প্রার্থী
পৃথিবীর সদ্ভাবের, সকলেই জনসাধারণ ॥

১০ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## প্রশ্ন

সমস্ত নিসর্গে দেখি তারই প্রতিধ্বনি,
সমস্ত পাখির ডাকে ছবি আঁকে আমারই হৃদয়
তারই জয়যাত্রার আলপনা কি দিল সূর্যোদয়,
ভাসাল সূর্যাস্ত তার কপালের সিঁদুরে সজনী. ?

পৃথিবী   অচল নিত্য, নিসর্গের আয়ু অন্তহীন ।
সেকালের সম্রাট ভিক্ষুক সব শুনেছে **এ-দোয়েলের** গান ।
হৃদয় আমারো নয়, আমি জানি, কদাচ প্রবীণ ।
অথচ সে অগোচর ! না কি প্রতারক শুধু চোখ আর কান ?

১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

## অঞ্জন ও রঞ্জনা

### *O namenlose Freunde*

ভাবে, কলকাতাও অলৌকিক । সমস্ত জীবন, গোটা বিশ্ব
যেন দীপ্ত প্রথম ঊষায়—যে-প্রত্যূষে অভিন্নহৃদয়—
মানুষের প্রথম প্রদোষ, কারণ সময় ব্যেপে একটি বিস্ময়
সে তীব্র মুহূর্তে দিব্যমূর্তি, বোঝাই যায় না কে সমৃদ্ধ কে বা নিঃস্ব—
মুহূর্ত, না, বিমূর্ত সময় । অঞ্জনের মুহূর্ত-বা হয়তো ঘণ্টা
অবশ্য সন্ধ্যায় ধৃত, ক্লাস কিংবা আপিসের পরে,
ময়দানের পশ্চিম প্রান্তে । দিনে-দিনে মাসে-মাসে একটি বছরে,
যখন **হৃদয়ে**—আর চোখ কান হাত সব-কিছুতেই সহিষ্ণু উৎকণ্ঠা,
সেই **মৎস্যলক্ষ্যভেদী** পাণ্ডবের মতো, বিন্দুর আবেগে গতিহীন ।

সন্ধ্যা হয়ে গেল ঊষা প্রাথমিক সৃষ্টির গৌরবে আর রঞ্জনার সলজ্জ সাহসী
মুখে এল প্রথম সূর্যের সোচ্চার বিস্ময় । জাহাজের স্টীমারের ধোঁয়াও রঙিন
আর কেল্লার র‍্যামপার্টস হয়ে গেল অলকার কুঞ্জবন আর রঞ্জনাও রক্তিম।রূপসী
জীবনে মৃত্যুতে মর্ত্য ভেদ মুছে গেল গঙ্গার সূর্যাস্ত স্রোতে ,
অঞ্জন হারাল সত্তা অর্থাৎ জন্মাল, রঞ্জনার উপস্থিত অস্তিত্বে অবাক, সদ্য
সাবালক চৈতন্যের সত্যে দীপ্ত । হঠাৎ তাদের মুখে   ভাঙা গদ্য
গান হয়ে পাখার ঝাপটে ছেয়ে দিলে কলকাতার মামুলি আকাশ
         আরেক আলোতে ।

অঞ্জন কি রঞ্জনার হাতে পেল নক্ষত্রের কম্পিত আভাস
কিংবা চেনা মুখে পেল সাত সমুদ্রের রহস্যের আকস্মিক কূল ?
বঞ্জনা কি সেই রাত্রে শুনেছিল বাড়ির গঞ্জনা,
না কি তার মৃত্যুঞ্জয় বক্ষে ছিল সমুদ্রের ঝড়ের আশ্বাস ?
অঞ্জনের ঘর, রাত্রি, সেই রাত্রে হয়ে গেল সম্পূর্ণ বঞ্জনা ॥

১১ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## দুঃস্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে

দুঃস্বপ্নে-দুঃস্বপ্নে রাত যেন রাজবন্দীর শিবির
বুট আর ব্যাটনের বিভীষিকা পঞ্চাশ রকমে
স্নায়ুকে প্রহার করে, দাঁতে-দাঁত ব্যথায় বধির
নৈঃশব্দ্যের ব্রত রাখা মূর্ছিত আক্রমে ।

অথচ দিনেও নেই জীবিকার আনন্দনিঃশ্বাস,
দৈনন্দিন রুজি দাগি আসামি বাজারে,
অথবা বলতে পারো ব্যাপ্ত মুক্ত হাজতেই বাস
প্রত্যহই করে যাব আমরা কি হাজারে-হাজারে ?

সে কোথা স্বাধীন দিনরাত সুখী স্বপ্নের শিখরে
কর্মের আনন্দে হয় একাকার বাহিরে ও ঘরে !

১৫ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## শবরী

অপ্রাকৃত শিল্প যবে মূর্তি পায় জীবন্তে, বাস্তবে,
তখনই নন্দিত মন বাঁধে তাকে স্মৃতির শাশ্বতে ।
চৈত্রের সন্ধ্যায় কবে তাঁবু ছেড়ে রুপালি গৌরবে
বেরিয়ে দেখেছি তাকে—শবরীকে, হিরণ-সৈকতে,

'কোয়েলের পাড়ে-পাড়ে সে চলেছে, তাম্রঘট দেহে
আলোর কত্থক কিংবা লোকনৃত্যে অন্য কোনো দোলা,
প্রকৃতির প্রিয় যে সে, খুলে পড়ে সামান্য মেখলা—
জলে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে, জল ওঠে অঙ্গ বেয়ে স্নেহে !

সম্ভবত শবরীও প্রকৃতির আত্মীয় প্রজ্ঞায়
জেনেছিল আছে তার নির্বিশেষ বিমুগ্ধ দর্শক—
সেও নৈর্ব্যক্তিক, নগ্ন, বিমূর্ত সে সৌন্দর্য-সংজ্ঞায়
তাকাল, ছিটাল জল, যেন সেও নিজে সমর্থক ।

জানি সেই সমর্থনে প্রকৃতিতে আত্মসমর্পণ,
সেই উৎসেই শুদ্ধ সব সৌন্দর্যের মৌলিক বসতি,
কাব্য চিত্র ভাস্কর্যের যা-কিছু পরম শুভক্ষণ
সবই সেই লীলায়িত চেতনার চূড়ান্ত প্রগতি ।

শবরীর স্নান কিংবা খেলা দেখে চলেছি তাঁবুতে—
রুপালি পূর্ণিমা আর বালির সোনায় ক্ষিপ্র জল
ধাতুর সংহতি পায় । আজও দেখি সে-অষ্টধাতুতে
বন্য প্রকৃতির তাম্রকন্যা জ্বলে বিমূর্ত উজ্জ্বল ॥

১৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## জঙ্গলে তাবু

চতুর্দিকে প্রাণী, প্রেম, যৌবনের বীজকম্প্র তাপ !
যুগল গোখরো দূরে রেখে চলে নিরাপদ জলে ।
গতিরুদ্ধ । স্বচ্ছ স্রোতে কোন্ নারী সমর্থ সন্তাপ
আশ্লেষে ডোবায় কোন্ যুবা-পুরুষের কোলে পেশলে কোমলে

পার হয়ে উঠে দেখে বর্তুল পলাশঢাকা টিলা,
বৈদেহী ভাবনার পক্ষে উপযুক্ত শুদ্ধ শান্ত স্থির ।
হঠাৎ কী ডাক ঝোপে বিলম্বিত বসন্তগৌরীর !
যেন বা লছিমা ডাকে, মেতে ওঠে সমস্ত মিথিলা

তাঁবুর আশ্রয়ে ফেরে, তাস খেলে ক-টি অফিসার,
কারো বাড়ি আছে কারো নেই, সব জীবনে উন্নতি
চেয়েছে অব্যর্থভাবে, পেয়েছেও। সে-জিজীবিষার
নেই জীবজগতের সৃষ্টিময় জীবন্ত দুর্মতি ॥

১৬ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## চিনবে তুমি তাকে

তাকালে স্পষ্টই চিনবে তুমি তাকে।
আপন আশ্বিনে জ্যোৎস্নাময়ী আলো
পরুষ পুরুষের অন্ধকারে সে তো
ঢেলেছে শ্রাবণের জোয়ার ভরা ডাকে,
পেয়েছে ভালোবাসা, বেসেছে সেও ভালো।

মালিনী নয়, বৃথা বন্ধ দ্বারে সে তো
দেয় না নাড়া, সে যে প্রাণের মহা-দায়ে
প্রেমের দায়ে তার, দয়িত ভীরু মুখে
নিমীল দুই চোখে চরম কথাখানি
ফোটাল কেতকীর ব্যথিত খরসুখে,
না কি কদম্বের পুলক সারা গায়ে,

ছড়াল দুরুদুরু পরম কথাখানি
প্রথম পুরুষের পেশল বাহু ঘেঁষে
যেই না শুনল সে ? সে কোন্ বিকালের
ক্লান্ত ইতিহাস রয়েছে তাই ভেসে
এখনও দুই চোখে। যেন-বা বিপ্লবে
দু-বাহু ধরেছে সে স্বয়ং ত্রিকালের।

গরম শহরের গ্লানির পরে যদি
তাকাও তার দিকে, মনটা খুশি হবে,
এবং রুটিনের প্রাজ্ঞ অভ্যাসে
দেখবে যৌবন মধুর গৌরবে
তোমারও মনে হয়, একই সে প্রত্যাশে
এদের আশ্বিনে শ্রাবণে এক নদী ॥

২১ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## এদের যে মনে হওয়া

মনে হল, কেউ নেই, বিশ্বময় সমৃদ্ধ শূন্যতা,
তারা একা, মুখোমুখি, পরিপূর্ণ তারাই দু-জন ।
অথচ মনেও হল, জলস্থল, আকাশ, মানুষ
সকলেই তলে-তলে মনোযোগী, তাকায় তাদের দিকে সমস্ত ভুবন

ছেলেটির মনে হল, মেয়েটিরও মনে হল তাই ।
এই মনে হওয়াটাই বোধ হয় দেবার-নেবার
হাতে-হাতে সারা বিশ্ব ব্যেপে মহা-ইন্দ্রধনু গড়া—
কিংবা ভিন্ন উপমায়—এর-ওর শারীরিক মানসিক ক্যাণ্টিলিভার ।

এদের যে মনে হওয়া, বিস্ময়, পুলক, অনন্যতাবোধ,
ঘনিষ্ঠের নবজন্ম, চৈতন্যের আদিম তীব্রতা—
এই সব স্তম্ভে-স্তম্ভে ইস্পাতের জোড়ে-জোড়ে বাঁধা তাই দেখি
পৃথিবীর, প্রকৃতির দীর্ঘ জয়যাত্রার ক্ষিপ্রতা ।

ক্ষণস্থায়ী ? হতে পারে । এদেরই একাগ্র দ্বিজ দিব্য আত্মস্থতা,
ঈশ্বরের কাছে মর-মানুষের আপাতত মৌল ঋণশোধ ॥

২১ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## দুইকে এক

যায় সে, যাওয়া নয়, চৈত্রবাতে
যেন বা হাওযা দেয় অধরা হাওয়া,
অদূর সাগরের সজল মাধুরীতে
যখন মেশে সারা দিনের উষ্ণতা।

চলা তো চলা নয়, পয়লা আষাঢ়ের
ধারাব পরে যেন স্বচ্ছ হাওয়া,
হাওযায় ভাসে যেন গানের অশরীরী
পিলু বা খাম্বাজে বিধুর হাওযা।

সে আজ পেয়েছে কি অঙ্গীকার কারো,
মুখের অথবা কি মৃদু হাতের ?
পুলকে নীল জল তার হৃদয় তাই,
আকাশে ওড়ে লঘু সারা শরীর ?

একাই চলে বটে, সঙ্গে তবু তার
হাওযার সঙ্গীকে রাত্রে আনে
এককে দুই করে প্রতিটি শ্বাসে
দুইকে এক প্রতি পদক্ষেপে ॥

২১ ফেব্রুআরি, ১৯৬২

## অতীত যদি ভুল

সমস্ত অতীত যদি ভুল **বল** , তাহলে কী থাকে ?
বর্তমান চড়া-পড়া, প্রতিবিপ্লবের মতো ভবিষ্যৎহীন
তোমার যাওয়া কি সত্য স্বল্পকায় সম্প্রতির পাঁকে,
আর মিথ্যা দীর্ঘ দ্বৈত অদ্বৈতের সব রাত্রি দিন ?

অভিযোগ কার কাছে ? তর্কে লাভ ? কে শোনে নালিশ ?
সত্য আর মিথ্যা যদি এক হয়, তবে কি সে মনে
স্মৃতির বন্ধন দিয়ে হাড়ভাঙা শূন্যকে মালিশ
করে কিছু স্বস্তি আছে ? যে-শূন্যতা কোনো বিশেষণে

কিছুই বোঝানো যায় না, শুধু জানা : সর্বক্ষণ, গোটা আয়ুষ্কাল
তুমি নেই, অথচ তুমিই ছিলে রক্তে স্রোত গহিন উত্তাল ॥

২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২

## প্রথম-দ্বিতীয়

বোঝেনি সে প্রথম যৌবনে, অন্তত সে আজকাল ভাবে তাই,—
এমনও তো হয়, কাক-জ্যোৎস্নাতেই কাক ডাকে ভুলের ভোরাই ?

আজকেই যৌবন সত্য,—এমনও তো দেখা যায় যখন কুয়াশা
এক-আধ দিন বেলা আটটায় কাটে, তবে সূর্য ওঠে, তাহলে দুরাশা

মাত্র কেন তার পঁয়ত্রিশে যৌবন ? অথচ মেলাও, দেখবে মিলবে লক্ষণ,
হৃদয়ে শরীরে সদ্য পুলকের ধরনটা বিশ-বাইশের মতো লাগে সর্বক্ষণ ।

**তুলনা ? তা তুলনাও ওঠে বৈকি থেকে থেকে**—মন বড় ভয়ানক—মনে,
অবশ্য প্রথমই হারে, দ্বিতীয়ই জেতে, টানে রোমাঞ্চিত **উত্তাল** সাগরে ।

ভেবেছে অনেক, কোনটি যে ভ্রান্তি ? এ কি দিনগত অভ্যাসে ধিক্কার ?
তাই কি স্নায়ুর উদ্দীপনা প্রয়োজন, তাই হৃদয়ের অভিজ্ঞ দীক্ষার ?

সন্ধ্যায় জানলা ধরে একমনে ভাবে, অন্যমনা খোঁপাবাঁধা চুলে
আঙুল বুলিয়ে ফের লোহার গরাদ ধরে লতায়িত পাঁচটি আঙুলে ।

ভাবে দ্বিতীয়ই আসলে প্রথম, ভাবে দ্বিতীয়ই এক অদ্বিতীয়,
ওর জীবনের সত্য । যোগ-বিয়োগের শূন্যে বিভাজ্য নির্ভুল নয় কি ও ?

৩ মার্চ, ১৯৬২

## ভাবি যন্ত্রণায়

আমি ভাবি, অনেকেই ভাবি যন্ত্রণায়
মিথ্যাই কি সত্য আর সভ্য চিরকাল ?
মৈত্রী, প্রেম, বুদ্ধি কেন দুস্থ যন্ত্রণায়
মৃত্যুর তর্জনে অপহননের শাপে সর্বত্র নাকাল ?

সেকালে মানুষ নাকি আগ্রহের আদিম সংশয়ে
আলিঙ্গন ছেড়ে যেত হিংস্র তেপান্তরে।
আজও কি সে জীবনের মননের গৃধ্নু পরাজয়ে
চলে যায় উন্নতির চত্বর দপ্তরে ?

৫ এপ্রিল, ১৯৬২

## ওরে বাছা

প্রেম তো গোমস্তা নয়, হৃদয়ে কি গদির সরকার
লগ্নিতে ভরবে ঘর ? কোনো অর্থনীতির দালাল
বলে যদি, ভুল বলে। বাজারের বুদ্ধির বখরার
অভ্যাস চলে না প্রেমে। প্রেম সর্বহারা মহাকাল,
নিত্য বিভূতিতে তার লাভক্ষতি জলাঞ্জলি দিয়ে
সে যে নাচে প্রতিদিন পার্বতীর চোখের বহ্নিতে।
সে-আগুন তোমাদের বাহুবদ্ধ লাজাঞ্জলি নিয়ে
দেখ দেখ জ্বলে ষড়ঋতু বর্ষে একটি ভঙ্গিতে।

দিয়ো না সামান্যে মন : অসামান্যে, বিরাটে, বিপুলে
তোমাদের সত্তা পায় তার সত্য, মর্যাদা চরম।
সে-ঐশ্বর্যে খাতা কোথা ? তুচ্ছ খর দৈনন্দিন ভুলে
তুলো না খনিজ অণু, হাঁকিয়ো না জলজ অ্যাটম।
ওরে বাছা, তার অন্ধ শক্তি ক্ষুব্ধ মত্ত বিদারণে
ওকেই কি একা হানবি ? সব দগ্ধ সেই বিস্ফোরণে ॥

৫ এপ্রিল, ১৯৬২

## রাত্রি যায়, আসে

রাত্রে সে আসে না, শুধু বাগানের শিশির হাওয়ায়
গন্ধটুকু ভাসে ।
রাত্রি কাটে অস্পষ্ট বিনিদ্র এক একাকী মায়ায়
দিনের প্রত্যাশে ।

দিন কোথা ? দিন নেই, দিন প্রতি রাত্রি প্রতীক্ষায় ।
রাত্রি যায়, আসে ॥

৬ এপ্রিল, ১৯৬২

## নিকট বিকৃতি

অনেক সময়ে ঘটে **ওইরকম**, কিছুটা দৃশ্যের
দোষ কিছুটা দৃষ্টির ; তখন ফিরিয়ো চোখ দূরে
ব্যাপ্তিতে, বিস্তারে , সামগ্রিক দিগন্তের বৃত্তে ঘুরে
পরিপ্রেক্ষিতের হবে সংশোধন, তখন বিশ্বের
রূপ বৃহত্তর সামঞ্জস্য পাবে, নৈকট্যের ব্রণ
মুখশ্রীতে দেখতেই পাবে না আর, যত নিমীলিত চাও
অণুবীক্ষণে বা মোটা বিয়োগান্ত চশমায় তাকাও ।

**ওইরকম** ঘটে বটে, ইতিহাসে, কখনো-কখনো
ব্যক্তিগত জীবনেও, তখন স্বামীকে কিংবা স্ত্রীকে
দীর্ঘদৃষ্টি হতে হয়, জীবনেরই জোড় মর্যাদায় ।
তেমনি ইতিহাসে, কেউ কুকুর না উচ্ছিষ্ট-গাদায়,
কর্মী আর কর্তা জেনো আমরাই, কেউ নই ঠিকে
কী-বা রুশে কী-বা **চিনে** কী-বা বাংলায়—ঠেকে শিখে
নিকট বিকৃতি ব্যাপ্ত দিগন্তে কি রূপান্তর চায় ?

৮ এপ্রিল, ১৯৬২

## রাবীন্দ্রিক সুন্দরের

বাড়ি ফিরি, জুতো থেকে অ্যাসফল্ট চাঁচি,
ভেজা গেঞ্জি কাচি, কাকস্নান করি চৌবাচ্চার জলে।
চিলেকোঠা তখনও আগুন, তখনও ছাদের টালি গলে
গায়ে-গায়ে বাড়ির গরমে তবু আকাশেব ধোঁয়া দেখে বাঁচি,
চতুর্দিকে আস্তাকুঁড় কলকাতার বাড়ির আড়তে চোখ জ্বলে

না, কালবৈশাখী নেই, মেঘ, হাওয়া, ঝড়, সমুদ্দুর,
সবই আজকাল মৃত, যতই না মর্মে-মর্মে আশাবাদী হই।
অসাড় চৈতন্যে তাই একফালি ছাদে একা-একাই ঝিমোই।
খাবারের ডাকে জাগি। বৃষ্টি বুঝি আসে ওই উতলা বিধুর?
আমারও হৃদয়ে জাগে মেঘ, হাওয়া, বজ্রের মাভৈ,

জাগে সেই রাবীন্দ্রিক সুন্দরের বেদনার আনন্দিত সুর
আমারও শরীরে জাগে ছাদে-ছাদে নীল ধারাজলে ॥

১২ এপ্রিল, ১৯৬২

## পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ

তবু দেখি দীর্ঘজীবী মানুষের দীর্ঘ ইতিহাস,
যেখানে বন্ধুর অসংলগ্ন মৃত্যুময় পাথরের স্তূপ,
আর কাঁটা-ঝোপ, লতা, সংশয়, সন্ত্রাস
আকাশে মসৃণ আঁকে আগামী নীলিমা
সূর্যোদয়ে, সূর্যাস্তেও আলপনার পদক্ষেপে স্থির অপরূপ,
সেইখানে সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করে প্রত্যাশার সীমা।

তবু ক্রুদ্ধ দীর্ঘজীবী সূর্যের হুংকারে দেখি দূর
প্রান্তর, নদীর ছটা, খোদাই সবুজ শালবন।
অগ্নিময় রক্ত, স্নায়ু শূন্য রৌদ্রে মমতার তাপে
কেঁপে-কেঁপে সূর্যকেই ফিরে দেয় আলোর স্পন্দন।

দেখি পাহাড়ের নীলা গলে যায় স্ফটিক সন্তাপে
আর স্তব্ধ রুদ্ধ এক প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে অনাথ দুপুর,
কখন গোধূলিলগ্ন রাত্রি পাবে আর অবচেতন বিকাশ
কখন যে স্বচ্ছ হবে, নিদ্রিত নীরব হবে অস্থির নূপুর,
ভোরের বিভাসে পূর্ণ পরিণত শান্ত হবে
পৃথিবীর মানবিক সব অভিলাষ ॥

১৮ এপ্রিল, ১৯৬২

## প্রেমকে তৃতীয়কে

প্রেমের স্বতন্ত্র সত্তা, কে জানত যে এমন যন্ত্রণা !
এ-যন্ত্রণা কতকাল হবে বলো, প্রেয়সী, সইতে ?
মাথা পেতে নেব তুমি যা দেবে গঞ্জনা,
যদি না ইচ্ছাই হয় না-ই এলে আমার অদ্বৈতে,
তৃতীয়কে করো তুমি পরিহার, ও উপ্‌রি ব্যঞ্জনা

অসহনীয় যে সখী আমাদের কাব্যের ঃমকে ।
উভয়েরই বন্ধু প্রেম আমাদের মাঝে কথা কইতে
থাকে কেন ত্রিনয়নে খেয়ালের নানান দমকে ?
মিলাও প্রেমকে প্রিয়া তোমার আমার এক দ্বৈতে.
কঙ্কণঝংকারে তাকে বশে আনো ঘনিষ্ঠ ধমকে ॥

৩ মে, ১৯৬২

## সনেট

আমি সময়ের দাস, তুমি চির পঁচিশ বছরে
অনন্ত যৌবনে স্থির, আর আমি চাল্‌শে কেরানি
বয়সের আপিসের, যত টান আয়ুর বহরে

ততই অস্থির-মন, লক্ষ নয়া পয়সার কে জানি
আমাকে করেছে বশ, সে কি শুধু মৌল জিজীবিষা ?

না কি তা কালেরই ধর্ম ? তবুও তো জর্জর স্নায়ুর
থেকে-থেকে মতিভ্রম, যার ফলে নভোনীল তৃষা
হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন এক বৈশাখের প্রখর বায়ুর
হাহাকার তোলে, তবু জীবনের প্রত্যক্ষ দৈনিকে
ভুলে যাই তুমি আছ মৃত, না, প্রবল প্রাণময় !

যখনই সংশয় এই দুলে ওঠে ছ-টার ট্রাফিকে,
তখনই পথের লাল আলো পড়ে তোমার শরীরে
অনন্ত যৌবনে স্মিত, আমার সমস্ত দিন ঘিরে
পরিত্রাণ পায় সেই মুহূর্তেই সব অপচয় ॥

৭ মে, ১৯৬২

## সত্য উদ্ভাসিত হল

সত্য উদ্ভাসিত হল প্রিয়া কাল কৃষ্ণ অন্ধকারে,
একা কম্পমান রাত্রি স্তব্ধতায় শিয়রে বাজায়
নিজেরই হৃদয়স্পন্দ, বিনিদ্রের স্বপ্নকে সাজায়
তোমার জাগ্রত রূপে, থেকে-থেকে দেখে বন্ধ দ্বারে
কে বা করাঘাত করে, আরণ্যক দূর স্মৃতিভারে
তোমার অনুপস্থিতি ভুলে যায়, ভাবে যে-সন্ধ্যায়
পাশে ছিল সেই সন্ধ্যা পূর্ণ হল রজনীগন্ধায়,
যেমনটি হত হিয়ে-হিয়া-লাখো-যুগের সম্ভারে।

তারপরে তুমি এলে শুভ্র আভা, দেখি হরিয়াল
প্রতিবেশী গাছে-গাছে গেয়ে ওঠে উল্লাসে নিখাদে।
না কি রাত্রি ভোর হল, তৃপ্ত স্মিত শুচি শুকতারা

নীলিম শিশিরে এ কি সাবিত্রীর পাণ্ডুর সকাল ?
যেন সদ্য স্নান সেরে ঘরে ফেরা প্রেমের প্রসাদে
যে-প্রেমে প্রত্যেক দিন সূর্য ফেরে, ফেরে সন্ধ্যাতারা ॥

৭ মে, ১৯৬২

## যত দিন যায়

এও কি সম্ভব ? যত দিন যায় ততই যন্ত্রণা
তীব্র হয়, ব্যাপ্ত হয় ; বৃষ্টিহীন বর্ষার আকাশ
কেবলই রক্তাক্ত গানে এঁকে চলে প্রচণ্ড বর্ণনা,
তাই কি পশ্চিমে পূর্বে বুক চেপে নিস্তব্ধ বাতাস ?

এই কি অবশ্যম্ভাবী ? যতই না ঘনায় বয়স,
জীবনের তৃষ্ণা পায় তত ক্ষিপ্র তীব্র ব্যাপ্ত ব্যাস
যত পরিণতি যত সৈনিকের অভিজ্ঞ সাহস,
তত তীক্ষ্ণ মানবিক সম্ভোগের বিচিত্র সন্ন্যাস ।

অজেয়ের হার নেই । ইতরতা, নির্বোধ কৌশল
হয়তো বা বিশ্বব্যাপ্ত, হয়তো বা স্বদেশে বিদেশে
আপাতত একচ্ছত্র একচক্ষু ধূর্তের শৃঙ্খল,
তবুও বিশ্বস্ত চিত্ত প্রতিবাদী আনন্দেই হেসে ॥

২৫ জুলাই, ১৯৬২

## সে কেন

*...but a post that dogs defile—Yeats*

জবাব দেয় না, শুধু হাসে, অন্যমনে হাসেও না বুঝি ।
অথচ তা অহংকারও নয়, শুধু চৈতন্যের সংহত বিহার ;
যে প্রসার নৈর্ব্যক্তিক, যা আমরা শিল্পকর্মে খুঁজি,
যে গতিতে সৃষ্টি পায় স্থির বিন্দু নির্লোভ স্পৃহার ।

অবজ্ঞা ? কিন্তু তা কাকে ? তার মন, তার কৃত্য দায়
শুধু আলো জ্বেলে যাওয়া রাজপথে শুভ্র দীপাধারে ।
সে কেন দেখবে বলো চোরা কানা গলির আঁধারে
কোথা কোন্ কোণে ল্যাম্পপোস্টে কোন্ কুকুর কী নোংরা ছড়ায় ?

২ আগস্ট, ১৯৬২

## মেটে কি এ-সাধ

বহুদিন দেখেছে সে, দেখে শুনে মেটে কি এ-সাধ ?
বহুদিন দেখে-দেখে হয়ে গেল মরমী সাধক ।

যেন কোনো দেবী আরোপিত হল অতল অগাধ
আকাঙ্ক্ষার নীল জলে, বাইশটি বছরের দামিনী বা কামিনীতে
মুক্তিস্নাত ধুতে চায় হিরণ্যকমলে তার মানবিক সমস্ত পাতক ।

সেই থেকে ইতিহাস সূত্রপাত, কিংবা শেক্সপিয়রী নাটক,
যেখানে মৃত্যুর অমাবস্যা প্রতি মধুযামিনীতে
একাকার, ক্ষণে ক্ষণে উৎসারিত প্রচণ্ড আনন্দ আর নৈরাশ্য অবাধ ।

অথচ কোথায় দেবী কোথায় সমুদ্র বলো ! বাস্তব যে ক্ষুধার্ত পাবক ।
রক্তের মাংসের সীমা ঘোচে অন্য কারো আরতিতে ?

তাই সাজে পুনর্মানবিক, প্রতি সন্ধ্যাবেলা বৈঠকি স্তাবক ।

অথচ যখন ওষ্ঠাধর কাঁপে আত্মদানে চরম সংগীতে
তখনই সে একা, আর সামনে হিম অন্ধ মূক বধির পাষাণ ।

কারণ এ-সাধনা যে শুধু আত্মদান ; প্রেম কবে প্রতিদান ?
অর্থাৎ প্রেমের কাব্যে এক অর্থে কারো নেই কোন অপরাধ ॥

১৭ আগস্ট, ১৯৬২

## তখনই সে-প্রেম সাজে

এ বড় মজার কান্না, যেই যাই দূরে
নিরীহ অরণ্যবাসে নির্জন সপ্তাহ কিংবা এক মাস,
তখনই মানুষ—তা সে এ-দেশের কিংবা বিদেশের—
হৃদয়ে ঘনায় যেন প্রাচ্য বন কিংবা যেন শ্রাবণ আকাশ,
আর মানুষের প্রেমে আস্থায় আশায় ব্যাপ্ত সুরে
দীর্ঘজীবী গান শুনি ।
তারপরে যেই আসি কর্মস্থলে ফের
কলকাতায়—না-হয় দিল্লিই কিংবা ভূভারতে যে-কোনো শহরে,
যেখানে জন্তুই নেই, গাছ নেই, অন্ধকার মরে
বিজলির বিজ্ঞাপনে যন্ত্রণায়, জীবনের চলে বেচা-কেনা—
আর যত বাকি লোক দেখি তাই বিমূঢ় হতাশ—
তখনই সে-প্রেম সাজে প্রাকৃতিক মানবিক ঘৃণা ॥

৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

## ঝড়

আমারও ভালোই লাগে হাওয়া বৃষ্টি ঝড়
তবে ঝড় ধানখেতে বা তেপান্তরে নয়,
ঝড় ভালো লাগে এই বাগানের সাজানো নিগড়
যখন কান্নায় ভাসে, উড়ে যায়, ভেঙে পড়ে সময়-সময় ।

ঝড় ভালো লাগে এই সাজানো বাগানে যবে দোলে
জীবনে মৃত্যুতে দীর্ঘ রূপবান ইউক্যালিপটাস,
অথবা ওদিকে ব্যাপ্ত দেওদার নিকুঞ্জ প্রায় ভোলে
আপন পার্বত্য শক্তি, ঝাউবীথি মেনে নেয় ঝড়ের সন্ত্রাস।

বিহ্বল আবেগে দেখি তিন দিকের জানলার ফাঁকে
সবুজের আন্দোলন আর শুনি নিজের স্নায়ুতে
অস্পষ্ট আনন্দদোলা বিক্ষোভের দমকে-দমকে বজ্র হাঁকে,
বিদ্যুৎ চমকায় বিশ্বে আর হৃদয়ের মৌসুমি বায়ুতে ৷৷

১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

## মহা-নির্বাচন

সেও করেছিল বটে মানবিক মনীষার মহা-নির্বাচন—
জীবনে অর্জিত সিদ্ধি অথবা কর্মের।
ছেড়েছিল বেহেস্তের প্রাসাদের আশা, চেয়েছিল অভাজন
শিল্পের পরমোৎকর্ষ, রচয়িতা মননধর্মের।

মনীষার অনিশ্চিত অন্ধকারে সে কি থেকে-থেকে
যন্ত্রণায় ভেবে দেখে কী- বা লাভ? ফুটা পকেটের
গর্তে হাত দিয়ে ভাবে নির্লোভ এ সাধনায় পেকে
সোনালি ফল কি কিছু পেয়েছে সে পিঠের, পেটের ?

জানি না, অবশ্য তাকে দেখে মনে হয়, তার ক্ষণিক বিষাদ
তলে-তলে মননের ভিতে-ভিতে জল দেয়, যার পাকা হাতে
তার ঘর, হাওয়া, আলো, আকাশের প্রকাণ্ড প্রাসাদ,
আবিশ্ব স্বাধীন হাওয়া নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে,দিনে রাতে।

বাড়ি নেই, গাড়ি নেই, সবই সত্য ; তবুও সে আপন কর্মের,
যে-কর্মে সাধনা সিদ্ধি হরিহর, অনিশ্চিতে প্রচ্ছন্ন নিশ্চিত,
সেই কর্মে মুগ্ধ তার গর্বের বিনয়ে আর তুচ্ছ হার-জিত
সে বুঝি মানে না তার মনোনীত ক্ষুরধার স্রষ্টার ধর্মের ॥

১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৬২

## আবার দেখি

আবার দেখি সবুজ চেনা বন,
ঘন চিকনে সরস আলো জ্বলে,
এ-মরকতে অন্য হীরা জ্বলে ।
পাড়ের ঢালু ঘাসের পান্নায়
এ কার বোনা বাহার মসৃণ !

আবার বুঝি প্রাচীন দেহ মন
প্রাণ পেয়েছে গ্রামীণ ঢলে-ঢলে,
নতুন খেতে রঙের স্বাদ জ্বলে,
প্রত্যহের আরেক কান্নায়
হাসিতে জ্বলে মাটির রাতদিন ।

ক্লান্তি গেল, গেল ক্ষতের কোণ,
শরীর দিই ভাদ্রধোয়া জলে
ধুলার গ্লানি নদীর রাঙা জলে
তোমাকে ছেড়ে কখনও আর নয়,
অবগাহনে শুধেছি সব ঋণ ।

আজকে সখী জরা ও যৌবন
নদীর জলে একটি লালে চলে,

রুগ্‌ণ জ্বালা জলের সমতলে
মিলায় দুই ডাঙার পান্নায়
দুই গ্রামের মিলনে মসৃণ ॥

৯ জানুআরি, ১৯৬৩

## ধুলো পড়ে

এখানে সমুদ্র নেই, পশ্চিমের ধূসর শহরে,
জল নয়, ধুলো পড়ে, সকালে, বিকালে,
সারা রাত। ধুলো পড়ে, দুপুরের ঝড়ে
ঘরে ও বাইরে, পথে ছাতে জানালায় শার্সিতে
ধুলো ওড়ে, ধুলো পড়ে, পাতা নড়ে বটে, পড়ে ওড়ে
সারাদিন। রাত্রে শুধু ধুলো পড়ে. পাতাও নড়ে না।

তারই মধ্যে প্রাণের প্রতীক সুন্দরীরা, মধ্যে ক্ষামা
না হলেও কাঁধ-ছাঁটা পেট-কাটা জামার আশ্রয়ে
ঝকঝকে টকটকে মুখ দেখে প্রবল আলোতে,
ক্ষয়িষ্ণু মাটির দেশে পুরুর প্রাসাদে যত প্রাণের প্রতিমা
ধুলায় প্রাচীন পাণ্ডু আঁধিয়ার ধূসর আর্শিতে,
যায় যত বণিকের কত রাজনীতিকের বড়-বড় কেরানির
চর্বচোষ্য খানাতে বা নিরামিষ ফল-ঘাঁটা পানাতে পিনাতে।

ধুলো পড়ে ব্যাবসায় কাজে কর্মে আয়ের খাতায়,
ধুলো পড়ে মগজে হৃদয়ে ধূর্ত, এমন কি সদ্য-সদ্য বইয়ের পাতায়!
এখানে সমুদ্র নেই জরিষ্ণুর জনপদে, ঊষর শহরে।
অথচ যখনই দিবা-দ্বিপ্রহরে কয়েক মুহূর্ত
চুপচাপ চেয়ে থাকি টিফিনের আগে কিংবা পরে,
চোখে ভাসে নীল জল, শান্ত স্নিগ্ধ তরল চঞ্চল
ঊর্মিল আবেগে আসে চৈতন্যের পাড়ে-পাড়ে
শীতল বিস্তরে ধুয়ে দিয়ে যায়, আসে পুনরালিঙ্গনে,

মনে-মনে ভিজে যাই মুক্তিস্নানে, শুচি নগ্নতায় ।
এমন কি গরম হাওয়ায় নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে
সজল আশ্বাস পাই, যেন তাল-তমালের বনরাজি নীলা
ছায়া দেয়, এখানেও, দেহে মনে, এখানেই দেয়, আজই ।
হয়তো বা প্রাচীন কালের সেই সমুদ্রের গণ্ডোয়ানা স্মৃতি
জাগে এই দগ্ধ দেশে, হয়তো বা আসে ধূলিমগ্ন দেশে
সমুদ্রের পরাক্রান্ত দূর ভবিষ্যৎ, দূর সজল আকাশ,
ভূগোলের বন্য রূপান্তরে আনে অন্য ইতিহাস ।
আর, আমার চৈতন্য জেগে ওঠে সমুদ্র-শীকরে,
যেমনটি জাগে মহাবলী পঞ্চপাণ্ডবের রথ শতকে-শতকে,
অথবা যেমন ব্যাপ্ত কোণে-কোণে উষ্ণ স্নিগ্ধ
প্রাণময় সূর্যের মন্দির বাংলার সমুদ্রের দক্ষিণা বাতাসে ।
রোমে-রোমে সমুদ্রের হাওয়া পাই কালদগ্ধ ধূসর শহরে ॥

১১ ফেব্রুআরি, ১৯৬৩

## শীলভদ্র পঞ্চমুখ

অসহ্য যন্ত্রণা ! সে কী স্পন্দে-স্পন্দে ব্যথায় বিক্ষোভে
শরীর ও মন হল একাকার, চৈতন্যে প্রলয়,
জীবন্ত মৃত্যুতে বিশ্ব দৃশ্য, স্পৃশ্য, শ্রাব্য সর্বময়
একটি ব্যথায় লুপ্ত । খুঁজি একমাত্র বরাভয়
অচৈতন্যে, আরামের মর্ফিয়ায় ঈথার-সৌরভে ।

আজ সেই ব্যথা ফাটে শতমুখ ক্ষতের কুৎসিত
আরেক আরামে, না না, আরোগ্যের আরেক যন্ত্রণা
শব্দে স্পর্শে দু-চোখের উগ্রতায় ছেয়ে ফেলে জাগ্রত সংবিৎ,
হয়তো বা মনে হয় ভালো ছিল মর্ফিয়ারই জিত,
যাতে মনে হত মন দেহযন্ত্র, নিজের যন্ত্র না ।

২

'বেশি কিছু জানি না দেবদেবীর বিষয়ে, তবে মনে হয় নদী
এক বলীয়ান পাটল দেবতা—রুক্ষ, কিছুতে মানে না পোষ এবং অচালনীয়
একটা মাত্রার মধ্যে সর্বংসহা, প্রথমে সীমান্তরূপে গ্রাহ্য,
কার্যকর, তবে নির্ভরের যোগ্য নয়, বাণিজ্যের বাহক হিসাবে ;
তারপরে শুধুমাত্র সেতুবন্ধ, স্থপতির পক্ষে সমস্যা বিশেষ।'

কিন্তু শুধুই কি তাই ? সেতুবন্ধের পরেও অনেক সমস্যা আছে,
বৃষ্টি আছে, আবার আকালে অনাবৃষ্টির আষাঢ়ে নদী সাজে
পাটল দেবতা কিংবা শ্বেত কিংবা পীত বা পিঙ্গল
মরুভূমি, মারী আনে, ওলাবিবি সাজে অথবা শীতলা
তারপরে আবার হঠাৎ হয়ে ওঠে রণচণ্ডী,
পাহাড়ের ধস্ ভেঙে স্রোতে প্রবল প্রলয়।
নদীর সমস্যা অন্তহীন সর্বদাই ; কখন কোথায় তার
বাঁধ দিতে হবে কোথায় বা খাল কেটে, কুমির না, শস্যের সেচন
এনে দিতে হবে প্রতি খেতে-খেতে গ্রামে-গ্রামে কোথায় বা
জ্বালতে হবে বিদ্যুতের সমান সুযোগ ঘরে-ঘরে
গ্রামে ও শহরে ভূতপত্রীর দেশে এই শ্মশানকালীর মাঠে।
নদীর সমস্যা বহু। সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি চায়
পাটল দেবতা তার একচক্ষু মেলে, পাটল বা শ্বেত কিংবা পীত,
চায় আমাদের সবাকার, যেমন চাইত সেকালের জাগ্রত দেবতা;
পাছে লোকে ভুলে যায়, তাই ঋতুতে-ঋতুতে রাগে অনুরাগে
প্রাকৃতিক নিয়মে—বা অনিয়মে। সপ্রতীক্ষ, পাহারায় সপ্রতীক্ষ,
পাছে যন্ত্রের পূজারি লোকে, আবিষ্কর্তা, অধিকর্তা, দাস, ভুলে যা
যান্ত্রিক অভ্যাসে, যান্ত্রিক তত্ত্বের অহংকারে, ভুলে যায়
পঞ্চমুখ, ঊর্ধ্ববাহু, একচক্ষু বধির তত্ত্বের যান্ত্রিক অভ্যাসে।

অথচ এ নদী বয় আমাদের অন্তরে-অন্তরে, আমাদের ব্যক্তিগত
এককে ও সাধারণে, অবচেতনে, প্রকাশ্যে, রক্তে, স্নায়ুতন্ত্রে, আ , চিন্তায়
আমাদের ভিতরে ও চতুর্দিকে নানারূপে মহানদী, আমাদের
চতুর্দিকে সমুদ্র, নীলাম্বুরাশি আমাদের চৈতন্যে-চৈতন্যে,
দ্বীপে-উপদ্বীপে, দেশে-দেশে, মহাদেশে, কারণ ভূখণ্ড সবই
মহাদ্বীপ ছাড়া কিছু নয় এই আসমুদ্র পৃথিবীর ; তারই তটে-তটে
ওঠে নানাবিধ প্রাচীন আদিম জন্তু, নানাবিধ মানব সভ্যতা,
ওঠে পশুপাখি মাছ বহু সরীসৃপ অজগর,

মৃত, সমুত্থিত অথবা মরিয়া জ্যান্ত ; এবং শুধুই
প্রাচীন আদিম নয়, আধুনিকও, যা মার্ক টোয়েন বা টম
এলিঅটও দেখেছেন মিসিসিপি মিসুরিতে, বোঝা-বোঝা মড়া,
নিগ্রো শব, গরুমোষ, মোরগমুরগির ঝাঁকা, দূষিত আপেল আর আপেলে দংশন,

যা আমরাও দেখি গ্রামে-গ্রামে, দেশে ঘরে কিংবা দূরে সিন্ধুতে গঙ্গায়
ব্রহ্মপুত্রে, দুঃখে শোকে যন্ত্রণায়, উদ্‌ভ্রান্ত চিৎকারে, মনের শ্মশানে
এবং শ্মশানব্যবসার লুব্ধ ডাকে চতুর বা আন্তরিক হাহাকারে ।
সমস্ত মানবধর্ম জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছারখার হয়ে যায়
ভুলে যাওয়া নদীর আক্রমে প্রকাশ্য আঘাতে কিংবা প্রচ্ছন্ন ব্যাধিতে ;
সত্যের আধিতে, সব তথ্যের আঁধারে বা তার চেয়ে ভয়ানক
আলো-আঁধারিতে ধাঁধায় ধাঁধায় সব তত্ত্বের প্রলয়ে ।

নদীর নির্মম নির্বিকার ইতিহাস আমাদেরই আত্মকথা
সংলগ্ন অতীতে বর্তমানে ভবিষ্যতে এ-দেশে ও-দেশে বিশ্বময় মননে জীবনে,
আমাদের বসবাস সেই শিবনেত্রের যজ্ঞের নিত্যতায় ;
অথচ আমরাই ভুলি নদীর অমোঘ আত্মীয়তা দেশে কালে
চৈতন্যের গভীর প্রবাহে, ভিতরে বাহিরে জীবনে-জীবনে, দেহে মনে,
ভুলে যাই লোভে-লোভে, বড় লোভে, বাজারের ছোট-ছোট লোভে,
প্রতিদিন, মাসে-মাসে, ঋতুতে-ঋতুতে বছর-বছর
তারপরে দুঃখের বর্ষায় আর্তনাদে রাগে কিংবা বাস্তবিক প্রায়শ্চিত্তে
নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, কালকের, ও-মাসের মকর বা চৈত্রসংক্রান্তির,
আর বছরের কিংবা আরেক যুগের ।
অথচ সে একই নদীতে আত্মদান দু-বার সম্ভব নয়,
যে-ঘাটে সময়ে অবগাহন হয়নি, সে-ঘাট অতীতে ;
যতই না ভাব! তুমি শক্তিশ্বর, শক্তির সাধক অথবা সৈনিক
প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্যেই, নদীস্রোত ফেরানো যায় না আর ;
আবার নতুন ঘাট গড়ে তবে মুক্তিস্নান নিত্যের নদীতে,
আত্মদান নদীতে নদীর তত্ত্বে বর্তমানে ; নিজের শক্তিতে
অর্থাৎ শক্তির লোভী, তত্ত্বে নয়, কারণ নিজের তত্ত্ব
যন্ত্রের গৌরবে যন্ত্রবৎ, শক্তিই সর্বদা যন্ত্রবৎ,স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়,
গতিহীন, ভবিষ্যৎহীন, নদীর তরল স্রোতে ত্রিকালের ক্ষুরধার চলিষ্ণু দর্পণে ।

আনি, আনো নদীর দুর্গম গভীরতা, সজীব জঙ্গল
প্রাকৃতিক মানবের নিয়মে, নিষ্ঠায় লক্ষ্যভেদী, চোখ কান হৃদয়ের
যন্ত্রণায়-যন্ত্রণায় সমুত্তীর্ণ, সমস্ত অহং-দীর্ণ জ্ঞানে কর্মে, ধ্যানে

প্রেমের বিনয়ে দেশে গ্রামে-গ্রামে দেশে-দেশে জীবনে-মননে
একক ও অনেকের সম্মিলিত হৃদয়ের স্পন্দনে-স্পন্দনে
যেখানে আপন পর দুই তীরে আলিঙ্গনে এক নদী।
নদীতেই মুক্তি পায় শিব সদাগর ॥

৩

প্রাচীন পাথরপচা ঝুরুঝুরু মাটি, যার টানে
জল, রসাতলে যায় মুহূর্তেই। তবু কী বিস্ময়!
সুলভ দুর্লভ ফুলে ফলে, বন্ধু, তোমার বাগানে
প্রকৃতির জয়গানে গন্ধে রঙে মানবিক জয়!

যেমন প্রাচীন এই দম্পতিকে দেখি আর ভাবি,
জৈবিক এষণা জানি জীবজন্তু সকলেই মানে,
কিন্তু সে তো নিয়ন্ত্রিত, দৈবের সে নির্মনন দাবি,
মৌলিক মস্তির ক্লান্তি মানুষেরই ঐতিহ্যে স্বজ্ঞানে

আনন্দে কৌলীন্য পায় স্বহস্তে রচিত ঘরে-ঘরে।
অবাক! তাই তো ভাবি জীর্ণ মাটি এ-দেশ প্রাচীন,
গলিত সমাজ, গ্লানি জীবনের প্রতিটি কাঁকরে।
তবু নৈরাশ্যের মর্মে মানবিক প্রত্যয়ে স্বাধীন
গড়ে যায় উদ্যান মন্দির পরিশ্রমী তেপান্তরে।
কিবা কল্কি যুগে, কিবা সত্য ত্রেতা অথবা দ্বাপরে
স্থপতিরা ভাস্করেরা প্রতিবাদে সর্বদা হাঘরে ॥

৪

কোথায় হারাবে বলো? যে-হিমশিখরে
হৃদয়ের বসবাস, সেখানে তোমার
কোনোদিনই যাতায়াত ঘটবে না, সে-ঘরে
একান্ত আপনজন শুধু বন্ধুজন
থাকে—কিংবা যায় আসে, আবিশ্বমৈত্রীতে আসে আকাশগঙ্গায়
শ্রীমতী বা সুহৃদ সুজন
যারা মনোময় নীল হাওয়া পান করে
সভ্যতার অমর তিয়াষে, সেখানে তোমার
ঠাঁই নেই; সে-আকাশে, ব্যক্তি-মুক্ত অবিচল সচেতন

স্বচ্ছ স্রোতে, সচ্ছল আকাশে—সত্যে-সত্যে তার
স্বরূপের নিত্যচর্চা। সেখানে তোমার হার।

যে হও সে হও তুমি, আজ তুমি হেরে গেলে।
শুনি বটে তোমার প্রতাপ বেতারে দৈনিকে,
মানি বটে হাহাকার, হিংস্র অভিমানে, আর সর্ব গর্ব ফেলে
মাঝে-মাঝে পাঁকের সমুদ্রে পাঁক হই এও সাধ যায়।
কিন্তু তবু যত অন্ধকার হানো ইংরেজিতে হিন্দিতে চৈনিকে
অথবা বাংলায় সমস্ত কল্মষ রোগ ঝরে যায় মননের
সূর্যের দুর্গম লোকে, ঊর্ধ্ববায়ু যে-হিমশিখরে,
মহাবিশ্বে এমন-কী গ্রহান্তরে, মননের দুর্ধর্ষ সুন্দরে
যেখানে বেঁধেছি বাসা আমরা, অনেক লোক,
দেশে-দেশে, অনেক শতাব্দী ব্যেপে
শিল্পে কাব্যে, জ্ঞানে কর্মে বোধিসত্ত্ব সৈনিকে-সৈনিকে
দেশে-দেশে দীর্ঘকাল, অনেক চৈতন্যে।
তাই গৌণ সব দুঃখ শোক
সব লজ্জা সব গ্লানি হেনেছ যা দিকে-দিকে
কী-বা চিনে কী-বা অন্যদেশে কী-বা বাইরে বা ঘরে,
লোভে, রাগে হন্যে দিয়ে।
জানো কি তোমার সেখানেই প্রতিদিন হার॥

৫

কোনো কালে বন ছিল, আশেপাশে জনপদ
গ্রামীণ সংসার ছিল, আজ তেপান্তর।
এ-দিকে ও-দিকে অনেক জ্বালানি গেছে, অনেক চালান,
নতুন শহরে, কলকারখানায়, জনপথে বিজলিবাতিতে।
এখন এখানে মাটি ভাঙা ধসা, এখন পাথর
ধুলো হয়ে ঝরে যায় রৌদ্রে জলে, যে-রূপনারান
প্রথম জাগার দিনে তুলেছিল আদি প্রশ্ন সে আজ রাত্রিতে
অশ্রুহীন হাহাকার আর দিনে—এমন-কী সাহারাও নয়।

একদা অরণ্য ছিল, সকলেই জানি,
দীর্ঘ ইতিহাসে গানে বাক্যে ও পুরাণে
অরণ্যের ছায়া আজও মনে দোলে মাটির শ্মশানে।

কিংবা ঠিক তা-ও নয়, কারণ এখানে আজও
প্রচ্ছন্ন শুঁড়িতে ডাল ওঠে মৃত্যু ফুঁড়ে, জীবনের গ্লানি
এখানে ওখানে দেখি কেটে যায়, পাতার আশ্চর্য প্রাণে
দগ্ধ লাল তেপান্তরে সবুজে, কোমলে, সরসে, চিক্কণে
এখানে ওখানে, থেকে-থেকে, এ-গাছে সে-গাছে।
আছে, প্রাণ আছে। প্রকৃতিকে মানুষ সহজে
পারে না নিশ্চিহ্ন করতে, যেমন ধনিক শুচিবায়ু
ভাবে তার ডিডিটিতে ফিনাইলে অন্য সকলের আয়ু
শেষ ক'রে নিরাপদ নিঃশ্বাসের খোঁজে
নিজের বীজাণু পালে, অথচ বিজ্ঞানী তার ত্রিকালজ্ঞ সুদূর বীক্ষণে,
অণোরণীয়ান্ তার পরম বীক্ষণে সহিষ্ণুর অন্য সত্য জানে।

মাঝে-মাঝে বট ওঠে, মুণ্ডকাটা নুলো ধড়ে অশ্বত্থের অমর বিস্তার
যেন এক জয়ধ্বনি শূন্যে-শূন্যে রটে, কোথাও বা আমের শিকড়ে
বউলের সম্ভাবনা মাৎ করে, কোথাও কাঁঠাল আনে
কোথাও মহুয়া পাতা ফেলে ফুল খুলে-খুলে আনে
ফাল্গুনের পোড়ামুখে গন্ধের বাহার,
পলাশ বিদ্যুৎ জ্বালে যৌবনের, শাল হঠাৎ প্রস্তুতি পায়
কে বা জেতে কে বা হারে নতুন বরাতে
বাজি রাখে নতুন পাতায় যতই না কুড়ুলে করাতে
অরণ্যে প্রান্তর কর, মাটির গানেই আছে
মাটির প্রাণেই আছে প্রাণের নিস্তার।
তবে হ্যাঁ, প্রান্তর রুক্ষ, মাঝে-মাঝে একা, স্তব্ধ
গাছ ওঠে একক গৌরবে, অরণ্যের সামাজিকতার
সে-ঐশ্বর্য চিত্তে নেই, একা-একা, এখন নিঃশব্দ একার সৃষ্টির
অরণ্যের অনাগত গান করি। তুমিও তো গান কর মনের কথার
প্রাণের কথার, নদীর, বৃষ্টির ॥

২৮ ফেব্রুআরি, ১৯৬৩

## শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সপ্ততি জন্মদিনে

যাঁকে চেনা মনের একটি জয়, মানবিক বড় অভিজ্ঞতা ।
আশ্চর্য সে মন, সর্বদিকে ব্যাপ্তি, শিল্পে সাহিত্যে বিজ্ঞানে
সংগীতে ; অথচ নিত্য জীবনসম্ভোগে, এমন কি জর্দা-পানে
ধূমপানেও—কিংবা ধূমপান ছেড়ে ! বয়স্কের মামুলি বিজ্ঞতা,
এ-জগতে প্রজ্ঞার যা বেশ, সেই যথোচিত ভারিক্কি মাহাত্ম্য,
সিদ্ধিপ্রাপ্ত বৃদ্ধ আত্মপ্রীতি নেই ; নেই কিছু বর্জনের নীতি ।
সকল বিষয় আর সর্বজীবে নির্বিশেষ সন্ন্যস্ত সম্প্রীতি.
প্রবল বাঙালি এই বিশ্বমানবের বক্ষে কেউ নয় ব্রাত্য ।

জিজ্ঞাসার অন্ত নেই—দুর্গম শূন্যের তত্ত্বের তথা দৈনন্দিনে
সন্ধিৎসা প্রখর সদা, জানি না এ-অতিমস্তিষ্কের জটিলতা
কোথায় পেয়েছে তার আত্মভোলা নির্বিকার প্রসাদ সাত্ত্বিক ।
অথচ হৃদয়বত্তা দুর্লভ নির্বোধে মূর্খে, সস্তা বেচে কিনে
যাদের প্রত্যহ যায়, তাই বিশ্বে কূট ঘৃণা, লুব্ধ দুঃশীলতা।

এ-জাতক শৈশবেই প্রতিভায় মহাপ্রাজ্ঞ, শতজন্মদিনে
জরা কেশাগ্রেই ক্ষান্ত, সপ্ততি শিশুর শতবর্ষ স্বাভাবিক ॥

১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৩

## এই দ্বন্দ্বে

এই দ্বৈতে অদ্বৈতও নেই ।
আয়ু আর অন্তের অভেদে
বৃন্দাবনে অনন্ত মাথুর ।

একই দেহে ক্ষিপ্র জিজ্ঞীবিষা
হাসে কাঁদে, সন্নিপাতাতুর
আলিঙ্গনে চুম্বনের তৃষা—

দুহুঁ কোরে দুহুঁর বিচ্ছেদে,
স্নায়ুতে উদ্বায়ু হাহাকার—
ভাদ্রের ধারার শমী জ্বলে।

এই দ্বন্দ্বে মতদ্বৈধ নেই,
দিনে-দিনে বছরে-বছরে,
বস্তুত প্রতিটি পলে, পলে,
অবিরাম কৃষ্ণের আদরে
গোরোচনা মল্লযুদ্ধ করে।

দেখি নিষ্পেষিত কৌতূহলে,
ভাবি ক্ষান্তি আসন্ন কি তাব
চৈতন্যের যমুনোত্রী জলে ?

ক্ষান্তিতে কি শান্তি পাবে আর ?

৬ জানুআরি, ১৯৬৪

## তুমিই বুঝি পাথর

তাহলে তুমিই বুঝি পাথর ?
তাই বুঝি বহু কারিগর
রচনার আনন্দে কাতর
রাজারানি কেটে কুঁদে গড়ে,
না কি সূর্যরতির মন্দির—
দেয়ালে দেয়ালে জীবনের
ভাস্কর্যের ভাস্বর গম্ভীর
লাস্যময় প্রাণের প্রতিমা ?
সৃজ্যমান ক্ষয়িষ্ণু মনের
মানবিক-প্রাকৃত মহিমা
জীবনের গহন শিকড়ে
প্রাণ পায় লক্ষ হাত তুলে;

ভেঙে চুরে নিজ মর্ত্যসীমা
চোখ দেয় মৃত্যুর পুতুলে ?

তাহলে কি তোমাকে ভাস্কর
বাটালিতে ক্ষয় হেনে-হেনে
বর্জনেই এনেছে অমরা ?
মুমূর্ষার অচল মুহূর্ত
কৈলাসিত সাবেকি ইলোরা ;

কিংবা নব্য মানসের মূর্ত
ব্রানকুসি বা মুরের রচনা ?

তাই তুমি নশ্বর পাথর
কেটে ছেঁটে খসিয়ে ধসিয়ে
রৌদ্রে-জলে অনন্ত ব্যঞ্জনা
দিয়েছ কি ? তুমিই ভাস্কর,
পলে-পলে মরণে রসিয়ে
জীবনের মরিয়া বন্দনা ?

৭ জানুআরি, ১৯৬৪

## উত্তর

তখন জিজ্ঞাসা করি : কে তুমি ? কে তুমি ? দুই জনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে ।
হয়তো জীবিত ব'লে । যেহেতু জীবনে এরা কেউ
ভাবেনি যে, সে কে আর ওই বা কে ? স্বচ্ছন্দ নির্জনে
বোধহয় দেখেইনি মুখ পরস্পর, এরা নয় ধনী
বণিক বা শক্তিধর, কোথা সে সময় বা সুযোগ ?
দেখেনি নিজেরই মুখ, প্রতিদিন বড়ই দুর্ভোগ ।

সাহেব-পাড়ায় দেখি সাজানো বাগানে শ্যাম পীত
আমের বউল আজ শীতের বিদায়ে উন্মুখর।
এরা কিন্তু নিরুত্তর আজীবন, আজও নিরুত্তর,
অথবা উত্তর দেয় কানে-কানে। কিন্তু সে-উত্তর
ডুবে যায়. কারণ শহরে গ্রামে হন্যে দেয় ফেউ।
তবু নাম পথে ভাসে, রাজপথে গলিতে দুস্তর,
কাবণ এ-গাজি, আর ও-দক্ষিণরায়, আজ মৃত ॥

জানুআরি, ১৯৬৪

## জানলা খুলি

পূর্বদিকে জানলা খুলি সকালে,
সন্ধ্যা ভাসে কলকাতার গঙ্গায়,
ঘুমের দেশে হৃদয় ঘুম খোঁজে
চৌরঙ্গির মুমূর্ষায় অন্ধ
অ্যাসফল্টে রাজধানীর বনগাঁয়
আকাশ নামে ভয়ে শরীর মেলে,

যানবাহন যখন প্রায় বন্ধ,
পথের লোক পথেই ঘর পাতে,
অনেক সাধ বাঁধানো-শানে ঢালে
গোটা অতীত অতীত দেশে ফেলে,
তখন হাঁটি—ঘুম কোথায় ঘুম ?
ঘুমের কোথা মরণে 'মরশুম' ?

স্বপ্ন আজ নিশি-পাওয়ায় মাতে,
কলকাতাকে ভাসায় গঙ্গায়,
শ্মশান-হাওয়া ছড়ায় তার গন্ধ।

আমার ঘুম ক্লান্ত পদপাতে
ভাঙা-শানের হুঁচোটে চোখ বোজে,
ঘরেই ফেরে, জানলা খোলে সকালে,
মৃত্যু যাতে জীবন পায় সংজ্ঞায় ॥

৯ জানুআরি, ১৯৬৪

## ভৈরবীর পত্রাবলীর পাঠোদ্ধার

(হপকিনস্ অবলম্বনে)

মনস্বিনী, মর্ত্যহীন, সমান, সংবাদী, চৈত্যচ্ছদ, বিরাট, বিতত
সন্ধ্যা তীব্র হতে চায় কালের বিপুল, সর্বগর্ভ, সর্বগৃহ, সর্বশবাধার নিশা,
স্নেহার্ত পাণ্ডুর তার বিষাণপ্রদীপ অস্তে লগ্ন, তার মত্ত অন্তঃশূন্য শুভ্র
হিম-দীপ নভোলগ্ন, দিশা-
হারা অপচয়ে ; তার সায়ন্তন নক্ষত্রেরা, সামন্ত নক্ষত্রবৃন্দ আমাদের
শিয়রে সন্নত
অগ্নিমুখাঙ্কিত মহাকাশে । কারণ মর্ত্যে যে তার সত্তাকে নিষ্ক্রান্ত করে,
তারি বর্ণালি যে ক্ষান্ত হল ; গত-
লক্ষ্য নিরুদ্দিষ্ট, ঝাঁকে-ঝাঁকে, পরস্পরে পরম্পরাহীন, আত্মমগ্ন
আত্মহন্তা অজিহিষা,
বিস্মরণে মতিচ্ছন্ন সকলই এখন । হৃদয়, আমাকে ঘিরে ধরো, এ-বিভীষা
বাঁধো : আমাদের সন্ধ্যা শেষ ; নিশা আমাদের করে ভূত—অভিভূত করে
নিশ্চিহ্ন, নির্গত ।
শুধু তুণ্ডপত্রময় তরুশাখা যেন নাগবংশী ; লোহিত বুনটে কাটে, তন্তুজমসৃণ
নিষ্প্রাণ আলোক কালো,
কালো আর কালো অন্তহীন । আমাদের উপকথা, হে দিব্য কথক । দাও
আহা দাও জীবনকে, জীর্ণ,
খুলে-খুলে দিতে তার জট, একদা বিচিত্র. পঞ্জীকৃত, সংরঞ্জিত স্নায়ু-রেখ
দুটি ভাগে ঘুরনের পাকে ;

এখন সমস্ত-কিছু দুটি যূথ, দুটি জাতি—কালো, শাদা ; জেনো মেনো
এইমাত্র, মন্দ, ভালো ;
মাত্র দুটি, দুটি মাল আবিশ্ব আড়তে, যেখানে কেবলমাত্র এই দুটি
এ-ওর চাহিদা হাঁকে ;
একই কলে, যেখানে স্ববদ্ধ, স্বব্যাবৃত ; নিষ্কাশিত, নিরাশ্রয়, চিন্তার বিরুদ্ধে চিন্তা
আর্তনাদে নিষ্পেষিত, চূর্ণ দীর্ণ ॥

১৭ জানুআরি, ১৯৬৪

## এরা জনা কয়

মানুষকে ভালোবাসে, বেশ জানি, এরা জনা কয় ;
অসামান্যে অবিশ্বাসী, জানে যে মনের স্বাস্থ্য বাঁচে
সাধারণ্যে, প্রাত্যহিক গৃহস্থের আনাচে-কানাচে ;
মনীষার স্বতঃস্ফূর্তি দ্বৈপায়ন গরিমায় নয়,
জানে যে চেতন-অবচেতনের দ্বন্দ্ব নিরাময়
বিশিষ্ট বিলাসে নয় ; তৃণের বিনয় তাই যাচে
আপন বুদ্ধির পায়ে, তাই এরা প্রাদেশিক ধাঁচে
মননবিশ্বকে ঘিরে খোঁজে স্বাদেশিক বরাভয়।

কিন্তু এ-সমাজে, বঙ্গে শতরঙ্গে ভঙ্গুর সমাজে
সংবাদ-সরবরাহ রোজ জ্ঞানের গর্দানে দেয় কোপ ;
বেতার বাজায় ঢাক, উপন্যাসও, কিংবা বায়োস্কোপ ;
এমন কি থীসিস মারে কিংবা রম্যরচনাও সাজে
হয় ন্যাকা বিজ্ঞাপন নয় ঝুটা, এলেবেলে, বাজে ;
সুন্দর-কুৎসিতে সত্যাসত্যে একই নির্বুদ্ধি আরোপ !
সে-ধূর্ত ক্লান্তিতে দেহ নিঃস্ব, মন রসাতলে লোপ।
তাই বেচারিরা ভাবে ট্রামে, বাসে, আপিসে, অকাজে,
সময়হরণ-সজ্ঞে কোথা দেশ, কোথা চেনা মুখ ?

অথচ হৃদয়ে গান, সার্থক জনম এই দেশে,
বিশ্বাস অজেয়, মাগো, তাই দ্বীপগুলি একা ভেসে
শূন্য মোহানায় ঘোরে—যদি লবণাক্ত তীর ঘেঁষে
মেশানো মেলানো যায় পরস্পরে ছিন্ন দুঃখসুখ ॥

২০ জানুআরি, ১৯৬৪

## ইয়েটস্‌কে, এলিঅটকে

***Death seems to be a harsh victory of the species over the definite individual and to contradict their unity:***
**—Economic & Philosophical Manuscripts**

এ-দেশ বৃদ্ধের দেশ নয় ;
সকলই বিচ্ছিন্ন, কেন্দ্রবিন্দু-চ্যুত,
শুধুমাত্র বিশৃঙ্খলা সারা বিশ্বে রাশ ভেঙে মাতে,
রক্তান্ধ অজ্ঞান বান বাঁধ ছেঁড়ে, এবং সর্বত্র
অনাঘ্রাত সারল্যের শুভ্র শুচি ব্রত ডুবে যায় এ-দেশে ও-দেশে ;
শ্রেষ্ঠরা হারায় আস্থা আর নিকৃষ্টেরা মাধ্যাকর্ষহীন
যত্রতত্র আবেগে উড্ডীন লোভে আশঙ্কাতে ।

পঞ্চাশোর্ধ্বে বনে যাওয়া, ছিল ভালো সেকালের রীতি ।
আর আজ ? অশীতি কি পঁচিশেই ? বালকেরও পরদিন নেই ?
বন আজ আণবিক, বন্য মাত্র, বন আজ নব্য নাগরিক ।

পঞ্চাশেই উঞ্ছ আয়ু, প্রেতসঙ্গী বাইশে বত্রিশে,
এমন কি অজাত বা সদ্যোজাত শিশু
অশীতির প্রায়শ্চিত্ত করে যায় জঠরে, জঙ্গলে :
কারণ জন্মেই মৃত্যু, এ-দেশে, এ-কালে—
চোরাই বাজার এ-কাল বৃদ্ধের কাল নয় ।
দেহে আধি, মনে ব্যাধি, সর্বত্র শ্মশানবন্ধু দঙ্গলে-দঙ্গলে,
জীবন কারোই নয়, কেউ কারো নয় ।
একা কে বা কার দেশ ? কারো আশা নেই ।

তবু এই দেশে আজও আমার প্রেতাত্মা শিহরায়,
শরীরের আয়নায়, হৃদয়েও প্রতিদিন !
কেন এই আকুলতা, অক্ষম জরার কেন জীবন্তের প্রীতি ?
শুধু নিকৃষ্টেরা আজ অস্পষ্ট আবেগে বাজে আওয়াজের পূর্ণকুম্ভ ।
এ-কালে শ্রেষ্ঠের ভাষা নেই ।

আমি নই মহাজন, জীবন্তের বা মরণের পথে,
বাংলার বৃদ্ধ মাত্র, সর্বদাই অশীতির পথে,
অশান্ত অতীত আর ভবিষ্যৎ আদি-অন্তহীন ॥

৩০ জানুআরি, ১৯৬৪

## শোনে না সে

একান্ত বন্ধুর কথা শোনে না সে ।
তেপান্তরে তালদিঘি, সভ্যতায় নিস্তব্ধ সে, নিজের দৈনিক দুঃখ
বেঁধে রাখে পাড়ে-পাড়ে, পাঁচিলে-পাঁচিলে, বঞ্চিতের ব্যক্তিগত জ্বালা ।
বিড়ম্বিত, থাকে চুপচাপ, একলা, যখন দশজন
ক্ষোভের প্রকাশে তীক্ষ্ণ, আন্তরিক, অশ্রুপাংশু, রাগে রুক্ষ ;
আবার কেউ বা মুখে ভাষা পায় সাংবাদিকতায় ঢালা—
কিছু বা অসৎজন, অনেকেই সৎ, সবাই অভ্যাসে
রোয়াকে গলির মোড়ে বারান্দায় বৈঠকখানায়
রেডিওর তলায় কিংবা বায়োস্কোপ-বাড়ির লবিতে ।

মানুষের সভ্যতা কি দিনে-দিনে গুহাহিত হৃদয়কে নিজেই হানায়,
মনীষা কি এ-কালে এ-দেশে তিলে-তিলে শ্বাসরুদ্ধ মনের মরণ ?
কবে তার ব্যক্তিগত সংকোচের আত্মাপসারণ
জনারণ্যে মুক্তি পাবে, নাহলে যে মরুবাসী ভব্যতাই তার
হয়ে যাবে দগ্ধশমী আধির কারণ,
হয়ে যাবে নিঃসঙ্গের দেয়ালে নিষ্পিষ্ট মুখ, মৃত্যুর আহার ।
আরো কতকাল যে সে বিশ্রামের নিরাশ সন্ধ্যায়
ছাতে কিংবা ময়দানের স্তব্ধ কোণে চুপিচুপি শূন্যতা জানায়
যেমন জানায় উন্মোচিত শিল্পীরা ছবিতে, কবিতায় ।

কোথা বৃষ্টি ঝোড়ো হাওয়া শালীনের নৈঃসঙ্গ্যের দাঁতে-দাঁত
শূন্য প্রতীক্ষায় ?
ঘৃণা নেই রাগ নেই, কে কোথায় কবে ভালোবাসে !
নৈর্ব্যক্তিক বাসাঘরে মূক সামুদ্রিক স্বপ্নে-স্বপ্নে পঞ্চমুখ বধির দীক্ষায়

অভিন্নহৃদয় বন্ধু তাকে আমি করে যাই প্রত্যহ বারণ ।
শোনে না সে ॥

২৪ জানুআরি, ১৯৬৪

## সত্যেন দত্ত যদি থাকতেন

উড়ে চলে গেছে বুলবুল,
খালি পিতলের পিঞ্জর ।
পিতলকে হত সোনা ভুল,
এমনই বিলেতি জৌলশ !

সে কবে ভেঙেছে জিঞ্জির
বাদশাহি দিন-রাত্রির!
কোথা সে নিলাজ পৌরুষ
বিদেশী সাগরযাত্রীর ?

গঞ্জ কিংবা বন্দর
সাজে কি তখ্‌ত-ঈ-তাউসে ?
তবু কেন হয় এই ভুল ?
গুলবদনের অন্দর

অন্ধ বধির খঞ্জের
বাণিজ্যে হল চৌচির,
ছিন্নভিন্ন অন্তর,
দীর্ণ অস্থিপঞ্জর ।

মালিনীরা সাজে মন্দের
কুটনী এবং বুলবুল
মরে গায় মন্বন্তর ॥

১৭ আগস্ট, ১৯৬৫

## স্বদেশী কবিতা

[ ইয়েটস্ অবলম্বনে ]

গলাবাজি অনেক করেছি যাতে শোনে বোকা ও বজ্জাত ;
ছেড়েছি সে গৌড়ী রীতি এবং এখন
সে-নাটে ভূমিকাটাই চাই পালটাতে নিশ্চয়,
পেতে চাই যোগ্য শ্রোতা, কিন্তু করে না যে কর্ণপাত
দিব্যোন্মাদ আমার হৃদয় ।

খুঁজেছি অনেক শ্রেষ্ঠদের সঙ্গ, কিন্তু তারা প্রতিজনে
সভ্য ভব্য মহাজন, উদারতান্ত্রিক বচন-বাচনে
ঘৃণাকে বানিয়ে দেন এলেবেলে খেলা নয়ছয়,
যা বলেন যা করেন, অক্ষম তা কিছুই গ্রহণে
একাগ্র এ আমার হৃদয় ।

বাংলা থেকে আমাদের বিশ্বে আগমন,
প্রচণ্ড প্রকাণ্ড ঘৃণা, ক্ষুদ্র বাসস্থান,
আরম্ভেই আমাদের বিকলাঙ্গ করে বিপর্যয় ।
মাতৃগর্ভ থেকে আমি করেছি বহন
একলব্য আমার হৃদয় ॥

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

## অনেক ঠেকে

অনেক ঠেকে শিখেছে সে, সমুদ্রকে ডরায়,
বালুকাবেলা যখন হাসে সাগরজলে শুভ্র,
তাই দেখে সে মুগ্ধ । যখন ঊর্মিমালা ছড়ায়
স্বর্ণতটে শরীর মেলে, হৃদয় চায় মাততে
ঢেউয়েরই মতো, হৃদয় তারও ইন্দ্রধনু অভ্রে
দু-চোখে জ্বলে হিরার ধারে বভ্রুকেশ রৌদ্র ।

সমুদ্র সে ডরায় সাধে, জানে, অতল না-ই হোক
তলায় আছে ভরাডুবি বা বহু ভয়াল জন্তু,
শ্বাসরোধের অপঘাতের নানা সম্ভাবনা ।
তাই সে বুক পাততে ডরায় আদিম সমুদ্রে,
সে জানে তাতে অনেক জ্বালা, হতেও পারে শোক ।
তীরের নিরাপত্তা দেখে সেইখানেই সে ক্ষান্ত ।

দেখেই খুশি, দন্তরুচি কথার ফাঁকে হঠাৎ
কিংবা হঠাৎ পাঁচ আঙুলে দেয়ালি-জ্বালা দু-হাত
খোঁপায় তুলে সাজায় উড়ো আলগোছানো অলক
কিংবা আড়চোখে আপন অধর এক ঝলকে
যাচিয়ে নেয়, তাকায় এক মরমে-পশা পলকে
চরম অন্তরঙ্গতাতে, ডোবাতে চায় ত্বরায় ।

তাই তো এই বিজ্ঞ ভীরু সমুদ্রকে ডরায়,
যেহেতু মন শেষ অবধি কেউই জানব না,
সুতরাং হও খুশিই যদি আঁচলটুকু ঝরায় ।
কারণ জলে নোঙর নেই, প্রায়শ সরে চড়ায় ॥

২৫ নভেম্বর, ১৯৬৫

# ছড়ানো এই জীবন

রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলার কলকাতা থেকে আমাদের কালের কলকাতার প্রচুর তফাৎ নিশ্চয়ই। এমনকি, আমাদের শৈশবের কলকাতার সঙ্গে এখনকার কলকাতার মিল খুব কম। এই দ্রুত (বরঞ্চ বললে যেন ভালো হয়—এই অদ্ভুত !) 'পরিবর্তনশীল' কলকাতায় বাস করা আমার মতো অসুস্থ লোকের পক্ষে কষ্টকরই বটে,—গোলমাল, নোংরা, ভাঙা রাস্তা, ভীড়, চেঁচামেচি—অসহ্য হয়ে পড়ে। শৈশবে তো বটেই, তার পরেও কলকাতা বেশ লাগতো, তার একটা বিশেষত্ব ছিলো—নানান ফেরিওয়ালার ডাকের মধ্যেও বেশ একটা ছন্দ যেন ছিলো। এখনকার কলকাতারও নিজস্ব বিশেষত্ব নিশ্চয় আছে, মানতে হবে,—যা বোধহয় এ'দেশের অন্য কোন শহরে নেই। তবে, আগে, আবহাওয়া যেন এতটা দূষিত ছিল না, গোলমালও কম ছিলো, মনে হয়, রাস্তা অনেক পরিষ্কার ও সমান ছিলো, নিয়মমত সারানো হতো, এবং দু'বেলা জল দেওয়া হতো, যাতে অনেক ঠাণ্ডা লাগতো, আর পরিষ্কার দেখাতো, অন্তত। এত ভীড় তো ছিলো না—নানা দুর্যোগ গিয়েছে এই অবহেলিত শহরের উপর দিয়ে। ধোঁয়াধুলোও কম ছিলো। বৃদ্ধ বয়সে শারীরিক দুর্বলতা ও গ্লানির সঙ্গে এইসব আরো স্পষ্ট ও কষ্টদায়ক হয়ে উঠেছে। সেইজন্যই, হয়তো, শ্লথগতির স্বচ্ছ আবহাওয়ার গ্রাম্য-জীবনই আমার বেশী পছন্দ। চুপচাপ বসে নিজেদের অল্প বয়সের কথা মনে পড়ে, সহজ স্বাভাবিকভাবেই। আমাদের পরিবারের নানান গল্প, ছেলেবেলার স্মৃতি, রোমন্থন করতে বেশ লাগে, আপন মনে। তবে, অন্যকে বলা বা লেখা, বাংলা কবিতার কর্মীর পক্ষে—অন্তত বর্তমান লেখকের মতো আত্মসঙ্কুচিত মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। এবং এই বিনীত সঙ্কোচ লেখকটির অল্প বয়স থেকেই।

আমাদের পূর্বপুরুষদের বাসস্থান—চলতি ভাষায় যাকে "দেশ" বলে,—পাঁতিহালগ্রামে—তখন ছিলো হুগলী জেলার অন্তর্গত, এখন হাওড়া জেলায় পড়েছে—বোধহয় হাওড়া জেলাটিকেই বড় করা হয়েছে। ছেলেবেলায়, জ্যাঠাবাবু, বাবাদের সঙ্গে মার্টিনবার্ন সরু-গেজের ছোট ট্রেনের কামরায় চেপে পাঁতিহাল যাওয়া ছিলো 'ডিলাইট্‌ফুল' অভিজ্ঞতা—শৈশবের মহা আনন্দের ঘটনা। চলন্ত ট্রেনের পাশে রাস্তা থেকে ডাব কেটে দিয়েছে, খেয়েছি—এমন মজা খুব কম হয়েছে পরে—ট্রেন চলতো গ্রামের মধ্য দিয়ে, প্রায় বাড়ির উঠোনের পাশ দিয়ে—দারুণ অন্তরঙ্গ ব্যাপার। পরেও, অনেকবার গিয়েছি, অনেক দেশী-বিদেশী বন্ধুদের নিয়ে। মনে পড়ে, ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে, যামিনীদাকে (বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়) নিয়ে "আইলীন এ্যাডরটন" নামে এক আমেরিকান বান্ধবীর সঙ্গে, সুদৃশ্য আরামদায়ক গাড়ি করে গিয়েছিলুম। আমাদের আরেক বন্ধু শ্রীতারাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের শ্বশুরবাড়ির গাড়িও ছিল। তার এক মাস পরেই, যামিনীদার একটি হার্নিয়া অপারেশন করতে ডাক্তার বাধ্য হন। আগে জানতুম না, হাওড়া ময়দান থেকে পাঁতিহাল ১৬ মাইল দূর,—আমাদেরই ভাগ্য বলতে হবে, ওঁর কিছু কষ্ট হয়নি, যাতায়াতের এই ৩২ মাইল পথে। আরেকবার হ্যারি

বেন্‌স—শিল্পী ও তাঁর স্ত্রী পলীন বেন্‌স-দের (অনেকবার ভারতে এসেছেন, ছবি এঁকেছেন, লণ্ডনে প্রদর্শনী করেছেন) নিয়ে গিয়েছিলুম। হ্যারি ছোটখাটো মানুষ, খুব রসিক—খেলাগাড়ির মতো ছোট কমপার্টমেণ্টে ঢেপেই, উপর নীচ চারদিকে তাকিয়ে মহাখুশীতে বলে উঠেছিলো—Just fits me! ডেভিডের (ডেভিড মাকাচিয়ান) সঙ্গে পাঁতিহাল হয়ে জগৎবল্লভপুর আঁটপুর-এর মন্দির দেখতে বেড়াতে গিয়েছি। পরে রেজ (রেজ উইম্‌বল, ব্রিটিশ হাই কমিশনের আপিসে তিনি তখন ফার্স্ট সেক্রেটারি), টিম—টিম লেগাট, ই এম ফরস্টার-এর চিঠি নিয়ে আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে আসেন—এখন আবার কেমব্রিজে ফিরে গেছেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্র্যাহাম ও মিউরিএল ইঙ্গহাম, ডেভিডসন সস্ত্রীক—দফায় দফায় পাঁতিহাল গিয়েছি, বছরের নানা সময়ে। আমাদের গ্রাম দেখে সকলেই খুশী হয়েছিলেন। শেষবার যে পাঁতিহাল গিয়েছিলুম—সে কথা খুব মনে পড়ে—বড় কন্যা ইরা ও জামাতা সত্যেশদের সঙ্গে তাদের মার্কিন বন্ধু জেমস ইউন্‌কিন্‌স, তাঁর স্ত্রী, মার্ক, কার্ক, জেফ্‌ ও এনড্রিয়া—সকলকে নিয়ে তাঁদেরই প্রকাণ্ড গাড়িতে যাওয়া হলো—খোলা মাঠে বাংলার গ্রাম দেখে মার্কিন শিশুদের কি আনন্দ—নিশ্চয় অনেকটা তাদের নিজের স্বভাবগুণে, তবু কিছুটা নিশ্চয়ই—অন্তত আমার বিশ্বাস খোলা আবহাওয়া ও তাদের দেশ থেকে ভিন্ন নৈসর্গিক দৃশ্য ও বাড়িঘরের জন্যও কিছুটা বটে। বিশেষ করে ঠাকুরদালানটা দেখে বাচ্চাদের খুব আনন্দ হয়েছিলো। জ্যৈষ্ঠ মাসে পাঁতিহালে "রক্ষাকালী মন্দিরে" একশ-আটটা পাঁঠা বলি দেওয়া রেওয়াজ ছিলো—সে ভয়ঙ্কর ব্যাপার—এখনও হয় কি না জানি না। তবু, একবার আমরা সে সময়ে গিয়েছিলুম—বলি অবশ্য দেখতে পারিনি, কিন্তু বছরের সব থেকে আঁধার নিশুতি রাতের গাঢ় নীল, তারা ভর্তি আকাশের আশ্চর্য বাহার দেখেছি—সারা রাত প্রায় না ঘুমিয়েই। দেশী বন্ধুদের মধ্যে মনে পড়ে সুনীল জানার সঙ্গে ওর ছোট্ট গাড়িতে একবার যাওয়া হলো—ঘিঞ্জি হাওড়া ময়দান পেরিয়ে দিগন্ত বিস্তৃত খোলা মাঠে গাড়ি এসে পড়াতে সুনীলের সে কি আনন্দ। এখন তো সেই মার্টিনবার্ন রেলপথও ইতিহাস হয়ে গেছে।

পাঁতিহালে আমাদের আদি বাড়িটা বোধহয় ২০০-২৫০ বছরের পুরোনো—ব্রিটিশ আমলের আগে, ছোট ইটে তৈরী। ১৯৩৪-এ বা অন্য কোনো ভূমিকম্পে দক্ষিণ দিকের বড় অংশটা ভেঙে পড়ে। আমরা শেষবার দেখেছি বাড়িটার এবং দোতলা যাবার সিঁড়ি কোঠার ধ্বংসাবশেষ। দোতলায় উঠেই একটা মজার দরজা ছিলো—সেকালে বলতো "চোর কুটুরি"—সেটা উপরে উঠে ফেলে দেওয়া যেতো। দোতলাটা নিরাপদ হতো—অন্তত সেকালের চোরের উপদ্রব থেকে। দোতলার উপর প্রকাণ্ড ছাদও ছিলো, ছেলেবেলায় উঠেছি—যতদূর দেখা যায়, চোখ চলে যেতো—খুব ভালো লাগতো। বাড়িটার দোতলাতে ৬টা ঘর ছিলো। এখন সেখানে ইটের স্তূপ। বাড়ির দক্ষিণে পুকুরের নাম "হেদো"—উত্তরেও আরেকটা পুকুর। খুব মাছ ছিলো। প্রতি বছর কর্তারা মাছের পোনা ছাড়তেন। এই দালানবাড়ির উত্তরে বেশ বড় উঠোন। আদি বাড়িটা ভেঙে যাবার পরই, বোধহয়, জ্যাঠাবাবুরা আরেকটা বাড়ি তৈরী করেন এই উঠোনের পশ্চিম প্রান্তে, ভাঙা বাড়িটার সমকোণে—উত্তর দক্ষিণে লম্বা। আদি বাড়িটা ছিল দক্ষিণ খোলা, পুব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে। এটাতেও একটা "চোর কুটুরি" করেছিলেন—সেটা আমরা শেষবারেও দেখেছিলুম। এই বাড়িটার নীচে দুটি, উপরে দুটি ঘর, বেশ বড় বড় দরজা জানালা সমেত, দক্ষিণে একটা বারান্দা। উঠোনটা

পেরিয়েই "ঠাকুর-দালান", সামনের দিকে—আশ্চর্য বাহারের—জ্যৈষ্ঠ মাসের দুপুর রোদেও কি আরামদায়ক ঠাণ্ডা ! ছোট ইটের তৈরী, খিলেন ছাদ, দেয়ালে মসৃণ পঙ্খের কাজ—আশ্চর্য তার পালিশ এতো বছর পরেও ! ঠাকুরদালানের পাশে ছিলো একটি খাঁড়া, আমিও দেখেছি—ফুট চারেক উঁচু হবে । সেটা, শুনছি, সম্প্রতি উধাও হয়েছে । শুনেছি আগে আরেকটা আরো বড় খাঁড়া ছিলো, জ্যাঠাবাবুর আমলেই সেটাও নিরুদ্দেশ হয়েছিলো—যাহোক, অনেকটা খাঁটি লোহা তো বটে ! ঠাকুরদালানের সামনে আরেকটা বড় উঠোন, সেখানে অনেক নেবু, বাতাবিনেবু গাছ ছিলো, পাঁচিলের ধারে । উঠোনের উত্তর প্রান্তে ঘরের সারি—সব দক্ষিণমুখো । পুব ও পশ্চিম ঘরের সারির মধ্যে বাড়িতে ঢুকবার বেশ চওড়া গলি—সামনে প্রকাণ্ড দরজা । বাড়ির সামনে একটু পুবে আরেকটা পুকুর—এই দুই পুকুরে, এবং আরো ভেড়িতে অনেক মাছ জিয়ানো হতো । বাড়ির চারদিকে অনেক নারকেল গাছ । আমাদের ছেলেবেলায় বাবাদের এক বিধবা আত্মীয়া তাঁর নাতি বাদল-কে নিয়ে পাঁতিহালের বাড়িতে থাকতেন । বাদলকে মনে আছে, আমাদের বয়সী ছিলো, খেলা করেছি ওর সঙ্গে ।

যতদিন তিনি ছিলেন, জ্যাঠাবাবু বাবারা বছরে বার কয়েক পাঁতিহাল যেতেন । এবং লেবু, ডাব, মাছ, তরকারি পাওয়া যেতো । তবু, তিনি অভিযোগ করতেন যে জিনিসপত্র চুরি হয়ে যায়, তিনি রুখতে পারেন না । তাঁর অবর্তমানে, খবর দিয়ে গেলে কিছুই প্রায় পাওয়া যেতো না । হঠাৎ গিয়ে পড়লে, অন্তত গাছ থেকে কিছু ডাব পাড়িয়ে খাওয়া যেতো । একবার মনে আছে, রাঙাদাদার (অজিতকুমার দে) সঙ্গে গিয়েছিলুম—সেবার খুব ভালো এবং প্রচুর পরিমাণে মাছ খেতে পেয়েছিলুম । সেবারই, মনে আছে, মজার অভিজ্ঞতা—আমার স্ত্রী ঝাকড়দা স্টেশনে নেমেছিলো, একটা দোকানে ক্যামেরার রোল পাওয়া যায় কিনা দেখতে । এমন সময়ে আমাদের ছোট ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে—আমাদের যত না চিন্তা, তার থেকে কামরার গ্রাম্য বৌ-মেয়েদের সে কি উৎকণ্ঠা—'ওমা, ও দিদি, গাড়ি যে ছেড়ে দিলো, শিগগির এসো', বলে চেঁচিয়ে তারা প্রণতিকে ডাকলো । তখন সে চলতি ট্রেনে দৌড়ে এসে উঠে পড়লো । ট্রেনের গতিটাও কিরকম ছিলো, এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় । আরেকবার জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার পর ভোরের গাড়িতে ফিরছি, প্রণতি মাছের ভ্যানে উঠে পড়লো, একটা মাছ কিনতে হবেই—সেবার পাঁতিহালে মাছ পাওয়া যায়নি । একটা বড় মাছ পছন্দ হওয়াতে, মাছওয়ালীর সঙ্গে দর ঠিক করা হলো । পরে, এক মাছের ব্যবসায়ী সেই মাছটাকে বেশী দর দিয়ে কিনতে চাইলো, কিন্তু সেই মেছুনী কিছুতেই দিলো না—'ও-মা-কে আমি কথা দিয়েছি'—আমরাই শেষ পর্যন্ত মাছটা পেয়েছিলুম । এখন হলে কি আর পেতুম ? জানি না ! পাঁতিহালে আমাদের খুব ভালো লাগতো—অপুর গ্রামের মতো, ঘেঁটু ফুলের গন্ধ, ঝোপঝাড় জঙ্গল, মাঠঘাট পুকুর । এমন কি—সেদিন পর্যন্ত পাল্কীও ছিলো—স্টেশন থেকে আমাদের বাড়ি বেশ দূরে বলে, সেবার ছোটদের পাল্কীতে তুলে দেওয়া হয়েছিলো । ইচ্ছা হয়েছিলো বাড়িটা সারিয়ে নিয়ে, পুরোনো ইটগুলি ব্যবহার করে, রিটায়ার করে বাকি জীবনটা ওখানেই কাটাবো । কিন্তু সে আর হয়ে ওঠেনি, নানা কারণে । অনেক জমিজমা, মাঠ ভেড়ি ছিলো—রাঙাদাদা তখন সে-সব দেখাশোনা করতেন ।

জমিদার প্রথা উচ্ছেদের সময়ে অনেক জমিজমা প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হলো—১ বিঘা বাড়ির সামনেই মেয়েদের জন্য একটি স্কুলকে—পাঁতিহাল বালিকা

বিদ্যালয়-কে দান করেছিলেন। স্কুলটি এখনও চলে। ক্লাস আমাদের পৈতৃক বাড়িতে হয়। আইলীন এ্যাডরটন দেশে ফিরে গিয়েও আমাদের গ্রামের স্কুলের জন্য ডলার পাঠিয়েছেন চেকে—অন্যের কাছ থেকেও চাঁদা নিয়ে। যামিনীদা স্কুলটিকে তাঁর একটি ছবি উপহার দেন—জানি না সেটা এখনও আছে কিনা। পাঁতিহালের অন্য দিকে ছেলেদের জন্য ভালো স্কুল আছে—পাঁতিহাল হাই স্কুল। পাঁতিহালের লোহা খুব ভালো—ওখানে খুব ভালো বঁটি-কাটারি-দা তৈরী হয়—চাষের কাজের অবসর সময়ে চাষীরা এসব জিনিষ বানায়। হাতপাখা, মাদুর, মাটির ও কাঠের পুতুলের, অন্য জিনিষপত্র—সব কিছুরই বেশ একটা বিশেষত্ব আছে। আমরা একবার গ্রামের একটা মেলা দেখেছিলুম—খুব ভালো মাদুর থেকে আরম্ভ করে—পাখা, খাবার জিনিষ, সৌখিন বড়ি ও যাবতীয় সংসারী জিনিষপত্র দেখলুম।

ফুলকুমারী—আমাদের প্রজার একটি মেয়ে, অনেক বছর আমাদের কলকাতার যৌথ পরিবারে কাজ করেছে—প্রায় অপরিহার্য ছিল সে বাড়িতে খুব বিশ্বস্ত বলে। একান্নবর্তী পরিবারের যত আটা-ময়দা ফুলকুমারী একাই প্রকাণ্ড একটা কাঁসিতে বা কাঠের বারকোষে মাখতো—ছেলেবেলায় মনে পড়ে, অতখানি ময়দা মাখা দেখতে বেশ অবাক লাগতো। বিরাট পরিবারের ভাঁড়ার বার করার সময়ে ফুলকুমারীকে থাকতেই হতো। কতোগুলি ছোট ঘটনা মনে গেঁথে থাকে—ফুলকুমারী যখন চলতো ওর পায়ের হাড় মটমট করতো—আমার খুব অবাক লাগতো—রূপকথার গল্প মনে পড়ে যেতো।

রতন ফুলকুমারীর ভাইপো—তাকেও রাঙাদাদা কিছু জমি দিয়েছিলেন। রতন চাষবাস করতো, বটি-কাটারি-দা বানাতো। মা, জ্যাঠাইমাদের এনে দিতো। মাঝে মাঝে তরিতরকারিও। আমাদেরও এনে দিয়েছে, অনেক বার। পাঁতিহালের মাটি খুব হাল্কা, খুব ভালো কলা ও আলুর চাষ হয়, বিশেষ করে নৈনিতাল। রতন এসব করতো। তার উপর ওর আরও গুণ ছিলো—ভাল তালা বানাতো, লোহার, পিতলের। ১৯৪৮-এর পর পাঁতিহালে একটা সরকারি তালা বানাবার কারখানা খোলা হয়, রতন সেখানে নিজের গুণে একটা কাজ পায়। রতনের বড় ছেলে লেখাপড়া শিখেছিল গ্রামের পাঁতিহাল হাই স্কুলে। অঙ্কে ভাল ছিলো, স্কুল ফাইনাল মোটামুটি ভালই পাস করে। কলেজে ভর্তি হতে চায়। কর্তৃপক্ষকে একটু বলে দিতেই হাওড়ার একটা কলেজে ভর্তি হয়ে গেলো। সে নিজের পায়ে দাঁড়াবে—তার বাবার সাহায্য নেবে না। গ্রাম ছেড়ে, কলেজের কাছে থেকে, নিজের খরচা নিজে চালিয়েছে। অনেকদিন ওদের খবর পাইনি—যাতায়াতের অসুবিধায়। আমাদের গ্রামের একটি পরিবারের তিন পুরুষের কাহিনী, কিন্তু প্রতি স্তরে কিছুটা আলাদা সময় পালটাচ্ছে বোঝা যায়।

এই পাঁতিহাল থেকেই আমাদের প্রপিতামহ—গঙ্গাধর দে বিশ্বাস কলকাতায় আসেন। ব্রিটিশ আমলে ব্যবসা শুরু করেন—"বেনিয়ান" বা "মুৎসদ্দীর" কাজ—ভারপ্রাপ্ত এজেন্ট যেমন—ব্যবসার লেনদেনের কাজ। নিজের কাজের জন্যই, বোধহয়, তাঁকে বেশ ঘুরে বেড়াতে হতো, শুনেছি ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। পরে, গঙ্গাধর তাঁর স্ত্রী (অন্নপূর্ণা তাঁর নাম ছিলো, যতদূর মনে পড়ে) ও নাবালক দুই পুত্র—শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ ও একটি মাত্র কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় আসেন। এখন যে রাস্তার নাম বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট—আগে বলা হতো "কলেজ স্কোয়ার",—বা সাধারণভাবে "পটলডাঙ্গা" নামে খ্যাত ছিলো—ঠিক সংস্কৃত কলেজের সামনে, ছোট একটি বাড়িতে তাঁরা থাকতেন। পরে, সেইখানেই বোধহয় ১৩ কাঠা-টাক জমি কিনে,

তিনিই বা পরে তাঁর পুত্রেরা নিজেদের বাড়ি তৈরী করেন। ব্যবসায় প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো নিশ্চয়, ছেলেরা বড় হবার আগেই, হঠাৎ তিনি মারা যান। তাঁর অসহায় স্ত্রী নাবালক তিনটি সন্তান নিয়ে, অচেনা অজানা কলকাতায় কি মহাবিপদে পড়েছিলেন—সহজেই অনুমান করা যায়। এমন সময়ে, শুনেছি, এক ইংরেজ ভদ্রলোক তাঁর কাছে আসেন এবং পরিষ্কার বাংলায় বলেন—"মা, তোমার পুত্র দুটিকে আমার হাতে দিয়ে দাও। আমি তাদের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে চাই।" ইনিই স্বয়ং ডেভিড হেয়ার। তিনি তখন ঘড়ির ব্যবসা করতেন, এবং অবসর সময়ে নিজের বাড়িতে ছাত্র পড়াতেন। শ্যামাচরণ বিমলাচরণের মা, ছেলে দুটিকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েছিলেন—তিনি এ ব্যবস্থায় সম্মতি না দিয়ে করবেন কি ?

শুনেছি, দেশের থেকে কিছু অর্থ ও জিনিষপত্র এনে তাঁর ওই ছোট্ট বসতি বাড়ির জমিতেই একটা "গোটা পাট্টা"র দোকান দিয়ে নিজের সংসারের ব্যয় চালাতেন। তাই, ডেভিড হেয়ারের কথায় রাজি হলেন, এবং শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণের শিক্ষার ভার সাহেব নিলেন। শুনেছি, তাঁদের মা স্বামীর মৃত্যুর পর বেশীদিন বাঁচেননি। শ্যামাচরণ বিমলাচরণ দুই ভাই আকারে, গড়নে, মননে একেবারে অন্যরকম ছিলেন—বড় ভাই একটু মোটাসোঁটা, খুব লম্বা নয়, রং শ্যামবর্ণ। ছোট ভাই রোগা, লম্বা গড়নের। রং ফর্সা, শুনেছি। ডেভিড হেয়ার তাঁদের রুচি ও ক্ষমতা বুঝে নিলেন অচিরেই, এবং শিক্ষা ব্যবস্থাও আলাদা আলাদা ধরিয়ে দিলেন—শ্যামাচরণের অঙ্কে মাথা দেখে তাঁকে সেই শিক্ষাই দিলেন। তখন এ্যাকাউনটেন্ট জেনেরালের অফিস ছিলো না, রিজার্ভ ব্যাঙ্কও হয়নি, তখন একটিমাত্র দপ্তরখানা ছিলো—"কম্পট্রোলার অফ কারেন্সি"—কোম্পানীর কোনো বিশ্বস্ত সাহেব তার বড়কর্তা ছিলেন। এ্যাসিসটান্ট কম্পট্রোলারের পোস্টে—প্রথম ভারতীয় গেজেটেড অফিসার হলেন এক বাঙালী ভদ্রলোক—শ্যামাচরণ দে বিশ্বাস। পরে, ব্রিটিশ সরকার তাঁর কর্মদক্ষতার গুণে তাঁকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দেন। কিন্তু একান্ত বাঙালী শ্যামাচরণ সে টাইটেল আদৌ পছন্দ বা ব্যবহার করেননি। শ্যামাচরণকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হতো, কারণ তাঁর উপর নানা রকমের হিসাবের কাজ বর্তাতো, নানা গরমিল খতিয়ে দেখে শোধরাতে হতো—সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে, প্রয়োজনমতো নানা জায়গায় ঘুরে তাঁকে হিসাব দেখে ঠিক করে দিতে হতো। এলাহাবাদ, সিমলা যাবার কথা আমরা জ্যাঠাবাবুদের কাছে শুনেছি, আরো কোথায় ঘুরেছেন ঠিক জানি না। একবার ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের খুব গভীর একটা হিসাবের গণ্ডগোল হয়, পার্লামেন্টে গিয়ে সে হিসাব বুঝিয়ে দেবার ডাক পড়ে শ্যামাচরণের উপর। আমাদের বঠঠাকুরদা খুব দেশী লোক ছিলেন। মাদুরে বসে, স্নানের আগে তেল মাখতে ভালোবাসতেন। কেশবচন্দ্র সেন বঠঠাকুরদার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। কেশববাবু তাঁকে এসে উপদেশ দেন, শুনেছি—"বিলেতে যাবেন না, শ্যামাচরণবাবু, তেল মেখে স্নান করতে পারবেন না।" কেশববাবুর উপদেশের জন্যই, না নিজেরই অনিচ্ছার দরুন জানি না, বঠঠাকুরদা বিলেত যাননি। অন্যবারের মতোই পরিষ্কার হিসাব এখান থেকেই করে পাঠিয়ে দেন এবং সেটি পার্লামেন্টে গ্রাহ্য হয় এবং গোলমাল মিটে যায়। রায়বাহাদুর খেতাবের চেয়ে পারিবারিক পুরোনো বিশ্বাস খেতাবটাই বঠঠাকুরদার প্রিয় ছিল। বাড়িটার নামও তাই মুখে মুখে চলত বিশ্বেস বাড়ি!

ডেভিড হেয়ারের কৃতিত্ব, তিনি এই দুই ভাইয়ের আলাদা চরিত্র ও ক্ষমতা বুঝে

তাঁদের নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা করেন। বিমলাচরণ তাই হলেন ইংরিজি ও ইতিহাসের স্কলার—ডিরোজিওর ছাত্র ; মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহপাঠী ও বন্ধু। বঠঠাকুরদার জন্ম ১৮২১ সালে, মৃত্যু ১৮৮৪। ঠাকুরদা বঠঠাকুরদার বছর দুই ছোট—১৮২৩ বা ২৪ সনে জন্ম, তার বন্ধু মাইকেলের মতো। মাইকেলের মতোই আমাদের ঠাকুরদা ছিলেন শৌখীন, খানাপিনাতেও উৎসাহী। তখন কলকাতার একমাত্র হোটেল 'উইলসন'—সেইখানে দুই বন্ধু যেতেন, মাংস চলত (নিষিদ্ধতেও বাধা ছিল না) ও মদ্য সেবন করতেন। তখন মদ্য মানে "শেরী", সেটাই তাঁরা বেশী খেতেন। মাইকেলের "একেই কি বলে সভ্যতা" নাটকের কথা মনে পড়ে। "জ্যাঠাবাবু" যোগেশচন্দ্র দে (শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের এবং যৌথ পরিবারের বড় পুত্র) ও রাঙা-জ্যাঠাবাবু (বিমলাচরণের তৃতীয় পুত্র—অক্ষয়কুমার দে—আমার বাবা অবিনাশচন্দ্র দে-র এক-দেড় বছরের বড় দাদা), এঁরা দুজনেই আমাকে পুরানো দিনের গল্প করতেন, আমিও শুনতে ভালোবাসতুম। জ্যাঠাবাবু আমাকে খুব ভালোবাসতেন, বাপী বলে ডাকতেন। ছোটবেলায় শনি-রবিবার কোর্ট বন্ধ থাকত যখন, আমি সারাক্ষণই প্রায় তাঁর সঙ্গে থাকতুম, গল্প শুনতুম। রাঙাজ্যাঠাবাবুও খুব গল্প করতে ভালোবাসতেন, আমাদের ছোটদের কাছে। একটা গল্প অনেকবার শুনেছি—এক সন্ধ্যায় মাইকেল, তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে আমাদের কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে এসেছিলেন। তখনকার ঘোড়ার গাড়িতে কোচম্যান-বসার জায়গায় দুধারে দুটো চৌকো কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো বাতিদানের বাক্স থাকত, ভিতরে জ্বলতো মোমবাতি। মাইকেলের সেদিন মোমবাতি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি ঠাকুরদাকে বলেছিলেন—"পারো কি—আনিতে বাতি—আমার গাড়িতে ?"—যেন অমিত্রাক্ষর ছন্দে, থেমে থেমে বলা, ইংরিজি বাক্য ভেঙে। আমার বাবা (অবিনাশচন্দ্র দে) গল্প করতেন, ঠাকুরদা ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন বলে ইংরিজিটা ভালোই শিখেছিলেন, ভালো বলতেন, শুদ্ধ উচ্চারণ—তাঁর বন্ধু মাইকেলের মতো। ঠাকুরদা বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ বিষয় প্রস্তাবটি ইংরিজিতে অনুবাদ করেন। রামতনু লাহিড়ী ঠাকুরদার আরেক বিশেষ বন্ধু ছিলেন, কলেজ স্কোয়ারে আসতেন। বাবার বিয়েতে একটা বই উপহার দেন, ইংরিজিতে লেখা—আমার বন্ধু অবিনাশচন্দ্র দে-কে—To my friend, Abinash Chandra Dey যদিচ তিনি ছিলেন ঠাকুরদার বন্ধু—বাবার থেকে বয়সে অনেক বড় !

হিন্দু কালেজে (তখন "কলেজ" কথাটা উচ্চারিত হত "কালেজ") লেখাপড়া করে ঠাকুরদা পৈতৃক কারবার জাহাজের বেনিয়ান—কাপ্তানীর কাজই হাতে নিলেন। তখন এ কাজে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা যেতো—ব্যবসার লেনদেনের কাজ। গঙ্গার ধারে অনেকখানি জমি সমেত একটা বাগানবাড়ি কিনেছিলেন—শিবতলায়, উত্তরপাড়ার ওই পাড়ে। জ্যাঠাবাবু গল্প করতেন—"কাকা আমার জন্য বাগানবাড়িতে একটা ছোট্ট গাড়ি কিনে দিয়েছিলেন, একজোড়া টাট্টু ঘোড়া গাড়ি টানতো, আমি বাগানময় ঘুরে বেড়াতুম। কাকা আমাকে খুব ভালোবাসতেন।" ঠাকুরদার নিজের গাড়ি জোড়া বার্মিস পোনি টানতো। ঠাকুরদার ধৈর্যের কথা আমরা পিসিমাদের কাছেও শুনেছি। বাবা ছিলেন দুই ভাইয়ের পরিবারের ছোট ছেলে। একবার ছেলেবেলায় বাবা নাকি রাত দুটোয় বায়না ধরেন—"লাউ ফুল দেখবো !" সেই রাতে, তিনতলার ছাদের উপরে ঠাকুরদা বাবাকে কোলে নিয়ে, লাউফুল দেখিয়ে আনেন। শ্যামাচরণ ও বিমলাচরণ—দুই ভাইয়ের হৃদ্যতা ও একান্নবর্তী পরিবারের শান্তিপূর্ণ পরিবেশের জন্য "বিশ্বেস বাড়ি" ছিলো

বিখ্যাত। পটলডাঙ্গার জমিটা কখন কেনা হয় জানি না, কেই বা বাড়ি তৈরী করা শুরু করেন তাও সঠিক আমার জানা নেই—তবু খুব পুরানো পোক্ত বাড়ি সেটা বোঝা যায়। প্রপিতামহীর ছোট্ট ঘরটি ঘিরেই কি এই বাড়ির সূত্রপাত ? ঠাকুরদাই বোধহয় বাড়িটা শুরু করেন, পরে বঠঠাকুরদা শেষ করেন বলে শুনেছি। অর্থের তখন সুবিধা ছিল—বাড়ির নকশা অনেকটা পাঁতিহালের বাড়ির মতো—ঘরের সার, মাঝখানে উঠোন, আরেক সার ঘরের পর আরেকটা উঠোন, পিছনের দিকে শেষ ঘরগুলির সার। ঠাকুমার ঘর পড়ে শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের দিকে,—তার দেয়ালে পঙ্খের কাজ—পাঁতিহালের ঠাকুরদালানের মতো—কি পালিশ—এখনকার মিস্ত্রিরা সে কাজ করতে ভুলে গেছে, এবং সে মালমশলাও নেই। কলকাতায় কলের জল হবার আগে পিছনের উঠোনেই, বোধহয়, একটা পাতকুয়া ছিলো। পরে, কল বসতে, সেটা বুজিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু উঠোনের নামটা—"পাত্‌কো-তলা" অনেকদিন পর্যন্ত ছিলো। এমন একটা ঐতিহাসিক বাড়ি—কতোটা থাকবে তাই ভাবি ! অনেকটাই শুনেছি, আমাদের পরিবারের আওতার বাইরে চলে গেছে। বেশ দুঃখের কথা, আমাদের পক্ষে। তখন দুই ভাইয়ের সংসারে কোনোই প্রভেদ ছিলো না। বঠঠাকুমা (শ্যামাচরণের স্ত্রী—আমি তাঁকে দেখিনি, নিজের ঠাকুরদা-ঠাকুমাকেও তো দেখিনি)—আমরা তাঁকে "আমমা" বলে জানতুম, মায়ের মুখে শুনেছি—ছোটখাটো মানুষটি ছিলেন, অপরূপ সুন্দরী, রং নাকি সত্যিই দুধে-আলতায় গোলা, আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো, শরীরের গড়ন নিখুঁত—তাঁর বৃদ্ধ বয়সে মায়েরা যখন দেখেছেন, তখনও নাকি তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছা হতো। অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন—এ সমন্বয় প্রায় ঘটে না। সেই জন্যই, দুই ভাইয়ের পরিবারে এমন সুশৃঙ্খল ও শান্তি ছিলো। আমাদের ঠাকুমা (বিমলাচরণের স্ত্রী) ছিলেন রোগা, লম্বা, ফর্সা, মায়ের কাছে শোনা, ছবি দেখেও তাই মনে হয়—এবং অতি ভালমানুষ, তাঁর জায়ের একান্ত বাধ্য ও অনুগত ছিলেন। ঠাকুরদার ব্যবসায় তখন প্রচুর অর্থোপার্জন সম্ভব হয়েছিল, এবং প্রচুর খরচও তাঁরা করতেন। তখনকাব সময়ে যত নামকরা মনীষী সকলেই বঠঠাকুরদা ঠাকুরদার বন্ধু ছিলেন এবং পটলডাঙ্গার বিশ্বাসবাড়িতে যাতায়াত ছিলো। বিদ্যাসাগব তো নিয়মিত আসতেন—দু বেলায়ই প্রায়—বেটেখাঁটো মানুষটির প্রকাণ্ড মাথা—জ্যাঠাবাবু আমাকে বলেছিলেন, মনে আছে। আমাদের বাড়িতে ঢুকেই সামনে ডানদিকে একটা হলঘর আছে, ফরাস পাতা, তাকিয়া দেওয়া থাকতো—সেখানে ঢুকেই বিদ্যাসাগর মশায় তাকিয়ার উপরে বসে পা দুটি ছড়িয়ে দিতেন।

আমাদের 'দেদা'—ঠাকুরদাদের ছোট বোন বাবাদের একমাত্র পিসি—নাম বোধহয় মৃণ্ময়ী, সধবা অবস্থায়ও আসতেন, বিধবা হয়ে দাদাদের কাছেই এসে ছিলেন। খুব ভালো রান্না করতে পারতেন শুনেছি। বিদ্যাসাগর রান্নাঘরে ঢুকে পিঁড়ি পেতে দেদার হাতে চিংড়ি মাছের ঝোল বা মালাইকারি খেতে খুব ভালোবাসতেন, পরে ধোঁকার ডালনা, এঁচড়ের কালিয়া, ইত্যাদিও। বহু নিকট ও দূর আত্মীয়, বহু ছাত্রও ১৩ নম্বরের বাড়িতে থাকতেন—এ বিষয়ে উদারতা ছিলো—কোনো বাধা ছিলো না। একদিন বঠঠাকুরদার সঙ্গে কোনো একটা বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মতানৈক্য হয়। বঠঠাকুর-

কড়া কথা বলেন—বিদ্যাসাগর বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান, এবং অনেকদিন আসেননি। দুই পক্ষ থেকেই কেউই মিটমাট করতে এগোন না। বাবাদের বড়দি—আমাদের বড় পিসিমা—বঠঠাকুরদার বড় মেয়ে, বিধবা হয়ে যখন প্রথম বাড়িতে ফিরে আসেন, খবর পেয়ে বিদ্যাসাগর কারুকে কিছু না বলে, একেবারে "অন্দরমহলে" ঢুকে গিয়ে, বড় পিসিমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন—"ওরে হেম, তোর কি হলো রে !" তারপর থেকে অভিমানের পালা সাঙ্গ হলো, আবার নিয়মিত আসাযাওয়া, বাড়ির অন্তরঙ্গ একজন। বঠঠাকুরদার মেয়েদের আমরা ডাকতুম—বড় পিসিমা, মেজ পিসিমা, সেজ পিসিমা, ছোট পিসিমা। ঠাকুরদার একটি মেয়ে—বাবারা চার ভাই, এক বোন ছিলেন—আমাদের পিসিমাকে আমরা ডাকতুম—ন-পিসিমা—বাড়ির মেয়েদের মধ্যে তিনি হলেন 'ন'—বড়, মেজ সেজ-র পরে ! জ্যাঠাবাবুদেরও তেমনিই ডাকতুম, বাবার আপন দাদা যিনি ওঁদের মধ্যে বড়, তিনি সেজ জ্যাঠাবাবু, পরে নতুন জ্যাঠাবাবু রাঙা জ্যাঠাবাবু, বাবা ছিলেন সকলের ছোট। ন'পিসিমাকে ইংরিজি পড়াবার ও কথা বলা শেখাবার জন্য একজন মেম বাড়িতে আসতেন। ন'পিসিমার বিয়ে হয় ১৪ বছর বয়সে এবং ঘটকালি করেছিলেন, স্বয়ং বিদ্যাসাগর। ন'পিসেমশায় ছিলেন—নন্দকৃষ্ণ ঘোষ—মেমারি তখন—সেটা বড় গ্রামই ছিলো, এখনের মতো উন্নতি হয়নি। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন শুনেছি—ভালো ছেলে (একটু রং ময়লা হলেও) পরে খুব উন্নতি করবে। এবং পরে, তিনি খুবই উন্নতি করেন। ন'পিসিমা-পিসেমশায়ের বাড়ি ছিলো ৮ ও ৯ কলেজ স্কোয়ার। পরে, সে বাড়ি দুটি বিক্রি করে রাসবিহারী এ্যাভিনিউ-এর মোড়ে আমাদের পিসতুতো দাদারা তিনটি বাড়ি করেন। বাবার জন্মের ৭ বছর পরই ঠাকুরদা মারা যান, ৫২-৫৩ বছর বয়সে ১৮৭৬ সালে। ন'পিসিমা বাবাকে মানুষ করেন, খুব ভালোবাসতেন। ন'পিসিমারা দক্ষিণ কলকাতায় উঠে আসার পর বাবাকেও এদিকে আসতে হলো—ন'পিসিমার সঙ্গে রোজ দেখা করা একটি কর্তব্য ছিলো। পরিবারের আমাদের অংশটির দক্ষিণ কলকাতায় উঠে আসার এটা একটা কারণ।

আমাদের বাড়িটা বেশ গোঁড়া হিন্দু বাড়ি ছিলো—জ্যাঠাইমা-মায়েরা সব পুজো আর্চা করতেন—বেশ বিচার ছিলো,—ডিম-মাংস পাঁউরুটি খেতেন না। ডিম মুর্গী নীচে হলঘরের সামনেই খাওয়া হতো, ভালো করে গোবর জল দিয়ে জায়গাটা মুছতে হতো। ডিম আস্তাবল থেকে আসতো, নীচেই "হাফ বয়েল" করে রাঙাদাদা আমাকে খাইয়ে দিতো, খোলাটা একেবারে বাইরে রাস্তায় ফেলে দিতে হতো। মুর্গী খেলেও "বাবুদের" খবরের কাগজ পেতে খেতে হতো, হলঘরের সামনে, সব সুদ্ধু বাইরের ড্রামে ফেলে এসে ভালো করে হাত ধোয়ার পালা, ও জায়গাটা গোবর জল দিয়ে মোছা। পাঁউরুটি তখন মুসলমান ফেরিওয়ালা ঝাঁকা মাথায় বয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতো, রাখা হতো আলাদা "পিঁজরে"-তে, খাওয়ার পর হাত ধুতে হতো। বাড়িতে দুটো রান্নাঘর ছিলো, একটা নিরামিষ রান্নার জন্য, ঠাকুর থাকতো, অন্যটায় আমিষ—তার আলাদা ঠাকুর। আমিষ ঘরে একটা হাফ পারটিশন দিয়ে ছিলো "পাঁঠার ঘর"—বাড়ির অনেকেই মাংস খেতেন না। বাড়ি ঘর খুব পবিষ্কার রাখা হতো। তবু তো মনে আছে, জ্যাঠাইমা পা উঁচু করে কি রকম চলতেন, যেন অনেক নোংরা এড়িয়ে। অসম্ভব শক্তি ছিলো,—মনে হতো যেন বিনা ক্লেশে প্রকাণ্ড ঘড়া উরুর উপরে তুলে হড় হড় করে জল ঢেলে স্নান করতেন—ছেলেবেলায় অবাক হয়ে আমরা দেখতুম। এই বিরাট পরিবারের ভাঁড়ার

বারকরা এক বিশেষ কাজ ছিলো—ফুলকুমারী ছিলো অপরিহার্য। বিরাট সিন্দুকে পানের মাল মশলা সাজসরঞ্জাম থাকতো, বিশ্বেস বাড়ির পানও খুব বিখ্যাত। মাস কাবারের বাজার যখন আসতো, সেও এক ব্যাপার ছিলো! এই রকম একটা পরিবারের উপর হঠাৎ একটা ঝড় বয়ে গেল। মায়ের মুখে সে ঘটনার বিবরণ শুনেছি :—

একদিন দুপুরবেলা ঠাকুরদা মুখ নীচু করে বিমর্ষ হয়ে ভাত খাচ্ছিলেন। "আমমা" পরিবেশন করছিলেন। ওঁর বসার ও খাওয়ার ভঙ্গী দেখে বুঝলেন কিছু একটা হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলেন, "ঠাকুরপো, তোমার কি হয়েছে, এতো ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?" ঠাকুরদা উত্তর দেন—"জাহাজ ডুবি হয়ে আমার সর্বনাশ হয়েছে!" কিছুক্ষণ, চুপ করে থেকে আমমা বলেন—"তাতে কি হয়েছে? আমার গয়না আছে, ছোট বৌ-এর গয়না আছে—আমরা সব দিয়ে দোবো। তোমার দাদা আছেন—ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে—ভাবনা করো না।" এবং সত্যিসত্যিই তাঁদের নিজেদের সব গয়না দিয়ে দেন। বাড়ির অন্য বৌ-মেয়েরাও দেন শুনেছি। ঠাকুরদা নিজের সখের বাগানবাড়ি এবং অন্যান্য শৌখিন জিনিষপত্র সব বেচে দেন। কয়েক বছর আগে আমার পিসতুতো দাদা—কৃষ্ণচৈতন্য ঘোষ—আমাকে সে বাগানবাড়ির ছবি দেখিয়ে বলেন—"দেখো, তোমার ঠাকুরদার বাড়ি। দালাল এসে ধরেছে—আমাকে কিনতে! নাঃ, ও অপয়া বাড়ি কিনে আমি আবার ডুবি!"

তবু, তারপরেও, অনেক ঝামেলা ও অসুবিধা হয়েছিল শুনেছি। বিদেশী বণিক পাওনাদাররা সহজে ছাড়বার পাত্র কি? অনেক কায়দা করে বঠাকুরদা ভাইকে নিরাপদে রাখেন। তখন তো "ইনসিওরেন্স" ছিলো না, যার সাহায্যে ঠাকুরদা খানিকটা সিকিওরিটি পেতে পারতেন। "ইনসলভেন্সি ফাইল" কবতে পারতেন নিশ্চয়ই কিন্তু ঠাকুরদা করেননি, অপমানজনক বলে। নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও হামলা করার চেষ্টা করেও সাহেব পাওনাদাররা তখন আরো বিপদ সৃষ্টি করতে পারেননি। সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য তো তখন বিদেশী কারবারীর আওতায়। শেকসপিয়ার তাঁর "মার্চেন্ট অফ ভেনিসে" এ্যান্টোনিওকে জাহাজ ডুবি করে সর্বস্বান্ত করে আবার ফিরিয়ে দিতে পারেন—এ সাহিত্যে নাটকে সম্ভব—আমি নিজে অবশ্য ঠাকুরদার জাহাজ ডুবির সত্যতা বিশ্বাস করিনি কখনও। কে দেখেছে, কার জাহাজ ডুবি হয়েছে? সাহেব বণিকরা যা বলেছেন, তাইই মেনে নিতে হয়েছে। সঠিক ঘটনা, কোথায়, কখন কি হয়েছে, কার হয়েছে, পরখ করে দেখা কি সম্ভব ছিলো তখনকার একজন কলকাতাবাসী ভারতীয়ের পক্ষে? কলকাতা থেকে বোম্বাই যাতায়াত তখন সহজ ছিলো না। আরব সাগরে, না কোথায়, জাহাজ ডুবি, কে দেখেছে, জেনেছে কার জাহাজ ডুবেছে? বঠাকুরদা ঠাকুরদা যথাসাধ্য খবরাখবর নেবার চেষ্টা করেছেন, খোঁজখবর করেছেন। কিন্তু কায়দা কৌশল ইংরেজ বণিকদের পক্ষে সহজ কে না জানে? সত্য ঘটনা প্রমাণ করাও অসম্ভব সেও তাদের অজানা নয়। এবং এ সব জেনে তারা যে এ রকম সুযোগের (সম্পূর্ণ) সুবিধা নেবেন না, একথাও বিশ্বাস করা কঠিন। আমরা তো পরবর্তীকালে ইতিহাসে এ বণিক জাতের কার্যকলাপের বৃত্তান্ত বহু পড়েছি! এখনও অহরহই তো দেখছি, কতো কি হচ্ছে! কাজেই আমি যখন থেকে নিজে বুঝতে, বিচার করতে শিখেছি, ঠাকুরদার জাহাজ ডুবির গপ্পো সম্বন্ধে মনে অনেক প্রশ্ন জেগেছে কখনও কথাটা মানতে পারিনি, বিশ্বাস হয়নি!

যাহোক, একটা সাংঘাতিক ঘটনা আমাদের পরিবারের উপর বয়ে গেলো, অনেক আর্থিক ক্ষতি, এবং মানসিক ক্লেশ। ঠাকুরদা অবিশ্যি যে ক'বছর বেঁচে ছিলেন, পরিশ্রম করতে ছাড়েননি। কিন্তু আর্থিক ক্ষতির গ্লানিটা মনে বিঁধেছিলো কঠিনভাবে—মানসিক আঘাতের টাল সামলাতে পারলেন না—মারা গেলেন আমার বাবার সাত বছর বয়সে। কিন্তু বঠঠাকুরদা ভাইয়ের সমস্ত দায়িত্ব—ঋণ সমেত—নিজে তুলে নিলেন। নিজেও প্রচুর উপার্জন করতেন—বহু সম্মান পেয়েছেন—নিজের আয়ব্যয়ের বিষয়ে এমন ব্যবস্থা করে নিলেন—সারা জীবনই তো অন্যের জন্য এই কাজ করেছেন—যে দেখা গেলো, যেদিন উনি অবসর নিলেন কাজ থেকে—তার আগেই ভাইয়ের সব দেনা সুদ সমেত শোধ করা হয়ে গেছে। অবিশ্যি, বাড়ির খরচ দারুণভাবে কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। রাঙা জ্যাঠাবাবু গপ্পো করতেন—"আমরা তখন এক পয়সার জল খাবার খেতুম।"

এখন অবশ্য, ভাবলে মনে হয়—ভালোই খেতেন তাঁরা—তখনকার এক পয়সা এখনকার দশ টাকার সামিল। এবং খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করলে—নির্ভেজাল খাদ্য হিসাবে শতগুণ কেন হাজার গুণও বেশী, বোধহয়!

## ইস্কুলের স্মৃতি

কলেজ স্কোয়ার বা পটলডাঙার বাড়িটা হিন্দু, হেয়ার স্কুল ও প্রেসিডেন্সী কলেজের কাছেই বলে বঠঠাকুরদা, ঠাকুরদা, জ্যাঠাবাবুরা, বাবা, দাদারা প্রায় সকলেই হয় হিন্দু বা হেয়ার স্কুলে ও কলেজে প্রেসিডেন্সীতে পড়েছেন। আমি কিন্তু হিন্দু বা হেয়ারে পড়িনি, মিত্র মেনে ভর্তি হই—আশু মুখুজ্জে ছিলেন একজন কর্তা, তাই জ্যাঠাবাবু বল্লেন "তুমি মিত্রতেই যাও।" আশুবাবু জ্যাঠাবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন আর তখন আশুবাবুর প্রতিপত্তি খুব—বলতে গেলে দু'জনেরই। আমাদের বাড়িতে প্রকাণ্ড লম্বা বেঞ্চি ছিল। হলঘরে ফরাস পাতা থাকত সেখানে রোজ আড্ডা হতো। কাজেই আমি হিন্দু বা হেয়ারে পড়ার ট্র্যাডিশনটি ভাঙি। কলেজ স্কোয়ার আমাদের মামাবাড়ির অঞ্চলেও। ৯-১০ বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হই, কারণ ছেলেবেলায় গ্রীষ্মের সময় জ্বর হতো, আরো কী সব অভাব ছিলো। বাবাদের ডাক্তার বন্ধুরা তার ব্যবস্থা করতেন, যেমন ইটালীয়ান অলিভ অয়েলে আলট্রা ভায়োলেট রে দিয়ে ডাক্তার নৃপেন্দ্রচন্দ্র চন্দর নিজে বাড়িতে পৌঁছে দিতেন, সে তেল মা আমার গায়ে মালিশ করে মাখিয়ে চান করিয়ে দিতেন। খাওয়া বিষয়েও ধরাকাটা ছিল—ইক্‌মিক কুকারে ভাত ও মুর্গীর ঝোল বা 'স্টু' করে দিতেন মা, ঠাকুমার ঘরে। আমায় খাইয়ে চান করে সংসারের কাজে ফিরে যেতেন। আর বড়পিসিমা বলতেন মনে পড়ে "বাপের জন্মে শুনিনি বাবা ইস্টু বিস্টু খাওয়া!" প্রায় নব্বই বছর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন অন্ধ হয়েও। তিনি যখন মারা যান—বেশ বাদলা দিন ছিল, চোখের সামনে ভাসছে সেই ছবি—নজ্যাঠাবাবু দালানে পায়চারী করছেন আর আপনমনে বলছেন: "বড়দি এই বাদলা দিনে যাচ্ছেন—এতদিনই ছিলেন কাল গেলেই তো হতো! ছেলেগুলির কষ্ট হবে!" বড় পিসিমার একমাত্র ছেলের নাম গবা—অময়নাথ। জ্যাঠাবাবু যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায়, তখন আমি ওঁর পাশে বসে গপ্পো করতুম। ছেলেবেলা থেকেই আমাকে খুব ভালোবাসতেন, 'বাপী' বলে আদর করে ডাকতেন। আমি শনি রবিবারেও ওঁর কাছে পালিয়ে আসতুম—মা জোর করে দুপুরে আমায়

শোয়াতেন বলে—আর মা ডাক দিলে জ্যাঠাবাবু ডেকে বলতেন, "ছোট বৌমা, বাপী আমার কাছে আছে।" আমার অন্ধকার করা ঘরে শুয়ে থাকা (ঘুম তো কিছুতেই হতো না দুপুরবেলা) থেকে ছুটি হতো তাই খুব আনন্দ হতো। জ্যাঠাবাবুকে ঘরে বাইরে সকলে খুব শ্রদ্ধা করতো। অনেক গণ্যমান্য লোক জ্যাঠাবাবুর বন্ধু ছিলেন—রাসবিহারী ঘোষ, দেবপ্রসাদ ও সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী—আরো অনেকে। তাঁদের সকলের নাম জানতুম না। আশুতোষ মুখুজ্জে জ্যাঠাবাবুর খুব বন্ধু ছিলেন, প্রায়ই আসতেন। আমাদের বাড়িতে আশুবাবুর আইসক্রীম খাওয়ার দৃশ্য এখনও মনে আছে—আমরা তখন ছোট ছিলুম, দাঁড়িয়ে দেখেছিলুম। জ্যাঠাবাবু খুব শৌখীন মানুষ ছিলেন। তাঁর চান করবার একট মস্ত বড় ট্যাঙ্ক ছিল—ঠিক বাথটব নয়, কিন্তু প্রায় সেরকমই বড়। আমার তাতে চান করতে খুব ভালো লাগত—মাঝে মাঝে করেওছি,—তারপর জলটা ফেলে দিতুম। মনে আছে জ্যাঠাবাবুর কাজের লোক 'নির্বাণ' সে এটা জানতে পেরে খুব শক্‌ড হয়েছিল। সেও খুব পরিপাটী লোক ছিলো। জ্যাঠাবাবুর আসবার সময় নির্বাণ কৃষ্ণদাস পালের মূর্তির নীচে পানওয়ালার কাছ থেকে একটা ছাঁচি পান খেয়ে এসে আমাদের খেলা থামিয়ে দিতো—'আস্তে, বাবু এখন আসবেন।' বিকেলে আমরা সামনের বড় উঠোনে খেলা করতুম। আমরাও চুপ করে যেতুম। জ্যাঠাবাবুর অসুখ যখন প্রথম আরম্ভ হলো তখনও আমি ওঁর কাছে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দাঁত মাজতে মাজতে,—সেকালের বিলিতি রবাবের ব্রাশ দিয়ে মাজতেন—কালো রক্ত বমি করলেন। সে দৃশ্য এখনও ভুলতে পারিনি। জ্যাঠাবাবু অনেকদিন মার্বেলের মেঝের ওপর মোটা গদী তোষক দেওয়া বিছানায় শুয়ে থাকতেন, আমি ওঁর পাশে বসে গপ্পো শুনতুম, যখন ওঁর ভালো লাগতো। আগে জ্যাঠাবাবুর বিছানা ছিল প্রকাণ্ড খাটের ওপর, খুব মোটা গদী, একদম সাহেবী কায়দায়। জ্যাঠাবাবু খুব লম্বা ছিলেন না—তাই বিছানায় ওঠবার জন্য একটা চৌকী দেওয়া থাকতো—সেটা আমার খুব মজাও লাগতো—ভালোও লাগতো। জ্যাঠাবাবুর সব কিছুই আমার খুব ভালো লাগতো। একদিন জ্যাঠাবাবু আমায় বললেন, "জানো বাপী, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে গবার বন্ধু ছিলো। সে সিঁড়িটার পাশে যে তক্তাপোষ ছিলো সেখানে বসে গবার সঙ্গে গপ্পো করতো বই দেখতো (অনেক বইয়ের আলমারীও সেখানে ছিল) গান করতো।" পরে আমি ভেবে দেখেছি জ্যাঠাবাবুদের আমলে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ছিল দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে বলে। পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেও আমাকে একবার বলেছিলেন—গবা—অময় আমার বন্ধু ছিল জানো হে। আমি তোমাদের বাড়ি গেছি, গল্প করতুম গান করতুম। তুমি বোধহয় তাকে দেখোনি। আমি ওঁকে জানিয়েছিলুম যে তখন আমার জন্মই হয়নি। গবাদাদা জোড়াসাঁকো তো যেতেন, আমাদের অন্য দাদাদের কাছে সে বাড়ির অনেক গপ্পো বেশ বড়াই করে বলতেন। বড় পিসিমা খুব ফর্সা, সুন্দর দেখতে ছিলেন—গবাদাদাও শুনেছি ভালো দেখতে ছিলেন। কিন্তু শেষ কালে যক্ষ্মা হয়ে মারা যান।

জ্যাঠাবাবু আশুবাবুকে বলে দেন—আমি তাই মিত্র স্কুল মেন্-এ ভর্তি হই, সেভেনথ্ ক্লাশে বোধ হয়। এখন হলে এতো দেরীতে কোনো স্কুলে ভর্তি হতে পারতুম না। আগে মায়ের কাছে, পরে বাবার কাছে পড়েছি। বাবা ইংরিজি ভালো জানতেন। স্কুলে কিন্তু আমার বেশী ভাল লাগতো না, জ্যাঠাবাবু বলেছেন বলেই যেতুম। পরীক্ষাতে ভা[illegible] করেছিলুম বলে জ্যাঠাবাবু বলেছিলেন, "আশুকে বলে দেব তোমাকে ডবল প্রোমশন

দিয়ে দিতে।" বাবাকে সে খবরটি জানাতে বাবা বললেন, "না সেটা ঠিক নয়—আমি বড়দাকে বারণ করে দেব।" আমি খুব অবাক হয়ে গেলুম এ কথায়। কিন্তু সে বছরই জ্যাঠাবাবু মারা গেলেন, কাজেই সে কথা আর বলা হয়নি। জ্যাঠাবাবুর মৃত্যু আমাকে খুব আঘাত করেছিলো। অভাবটা কিছুতেই ভুলতে পারছিলুম না—অনেকদিন পর্যন্ত—এখনও মনে আছে। মিত্রতে পড়ছি যখন তখনই রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা তো বটেই, পড়েছি। তার শিক্ষাদর্শ মনে প্রাণে মেনে নিয়েছিলুম। এই সময়ে তাঁকে একবার দেখবার সুযোগ হয়েছিলো। অ্যালফ্রেড থিয়েটারে একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন—বোধহয় "সমস্যা ও সমাধান।" যেমন দেখতে সুন্দর, তেমনি তাঁর চিন্তাধারা। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের লেখা আমাকে ইম্প্রেস করেছিলো, নাড়া দিয়েছিলো।

বছর দশ বারো থেকে হাতের কাছে যা পেয়েছি পড়েছি। রাঙা জ্যাঠাবাবুর এক আলমারী ইংরেজী বই ছিলো, ন'জ্যাঠাইমার দুই বড় আলমারী বাংলা বই ছিলো। তাঁর বড় ছেলে সন্তুদাদার অনেক ইংরেজী বই ছিল। অনেক দামী উপহার পাওয়া বই ছিলো—যেমন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী, রামতনু লাহিড়ীর প্রেজেন্ট লিখে দেওয়া বই সব। সিঁড়ির তলায় দুটো আলমারী ছিলো, একটাতে অনেক চিঠিপত্রও—বিদ্যাসাগরের রবীন্দ্রনাথেরও। এবারে শুনলুম, সে আলমারীও আর নেই। ছেলেবেলায় সে সব বই আমি নাড়াচাড়া করতে পারতুম, কোনো বারণ ছিলো না—ইংরিজিতে যাকে বলে browse করা—আমার মনে হয় ছেলেবেলায় সেটা খুব সাহায্য করে। রবীন্দ্রনাথের লেখাও হাতের কাছে যা পেয়েছিলুম পড়েছিলুম। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা সব ভুল তাঁর লেখা পড়ে আমার সিদ্ধান্ত হলো, তাই রবীন্দ্রনাথের মতো স্কুল কলেজে পড়বো না ঠিক করে ফেললুম। এই নিয়ে বাবা, বাবার পার্টনার, ও আরো অনেকের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। আমার পিসতুতো দাদা নসুদার (শচীন্দ্রমোহন ঘোষ) গুরুদেব গৌরাঙ্গ বাবাজীর সঙ্গেও একদিন কথা হয—ওঁদের বাড়ি ৮ ও ৯ নং কলেজ স্কোয়ারের সরু বারান্দায় সন্ধ্যাবেলায় একদিন এ-কথাগুলি বলেন। সমস্তক্ষণ হাতে মালাজপ করছেন, চোখের দৃষ্টি wandering, যেন অনেক দূরের কথা ভাবছেন। "তুমি যে লেখা পড়া ছেড়ে দেবে—তোমাদের সমাজে তো একটা বৃত্তির প্রয়োজন, কি করবে তুমি? দেখনা আমি কৃষ্ণের জন্য সংসার ছেড়ে চলে এলুম, তবু প্রতি বছর আসি শচীনের কাছে অর্থ সংগ্রহের জন্য।"

গৌরাঙ্গ বাবাজী বললেন, "আমার আখড়া আছে, ৩০ জন লোককে খেতে দিতে হয়। সংসার ছেড়ে চলে এলেও সংসার সঙ্গে সঙ্গে চলে। জানো তো, উপনিষদে বলেছে—অন্নই ব্রহ্ম। কাজেই লেখাপড়া ছেড়ে তুমি কী করবে—অন্ন তো চাই। তুমি কবিতা লেখো। সে খুব ভালো কথা। কবিতায় মনের ঐশ্বর্য বাড়ে। তুমি কী বিষয়ে কবিতা লেখো? প্রকৃতির বর্ণনা শুধু? সে তো নিকৃষ্ট কবিতা। মানুষ নিয়ে লিখতে পারো কী? সে কবিতায় মনের উন্নতি হয়।"

পরিবারের সকলেই বেশ বিচলিত হয়েছিলেন আমার সিদ্ধান্তে। কারণ সে সময়ে, অল্প বয়স তো, লেখাপড়া বেশ ভালোই করছিলুম। শেষকালে অনেক তর্কাতর্কির পর,

বাবার অনুরোধ "মিত্র" স্কুল ছেড়ে "সংস্কৃত স্কুলে" এসে ভর্তি হলুম। তখন সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি, বয়স বোধহয় চৌদ্দ হবে। জ্যাঠাবাবু বাবা দাদারা সকলে হেয়ার কিংবা হিন্দু স্কুলে পড়তেন। বিদ্যাসাগর মশায় আমাদের পরিবারের বিশেষ বন্ধু ছিলেন, রোজ আসতেন বাড়িতে। তাই বোধহয় মনে হলো সংস্কৃত স্কুল যদি একটু তফাৎ হয়। কলেজ স্কোয়ারে আমাদের বাড়ির সামনেই স্কুল—স্কুল-কলেজ-বইয়ের দোকানের পাড়া—খুব সুবিধা। কিন্তু তখন আমরা নিজেদেব বাড়ি তেরো নং কলেজ স্কোযার ছেড়ে ন'পিসিমার একটা বাড়ি ছিলো ১০৯, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটে, সেখানে উঠে গেছি। পুরনো বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে আমরা মানুষ হয়েছি—বাড়িটা বড হলেও—তখন লোকজন অনেক—একটু জায়গার অভাব হতোই—ঘরের দিক থেকে—অন্য অল্পস্বল্প অসুবিধেও একটু হয়েছিল। সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট কাছেই, কাজেই একই পাড়া থেকে গেল। সংস্কৃত স্কুল থেকে তেরো নম্বরে টিফিনের সময চলে আসতে পারতুম।

সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের কথা মনে করলেই, প্রথমেই মনে পড়ে যায় একটি নাম—রায় সাহেব আদ্যানাথ রায়। হিন্দু স্কুলেব হেডমাস্টার মশায় তখন ছিলেন রায বাহাদুর রসময় মিত্র। মিত্র স্কুলের হেডস্যারের নাম যেমন মনে পড়ে—সতীশ মুখুজ্জে—ফর্সা রং, উঁচু নাক, খুব অর্থডক্স হিন্দু ছিলেন। স্কুলের তেতলায় ওঁব ঘর ছিলো। গামছা পবনে, কানে পৈতে লাগিযে পায়খানা যেতেন। পরে স্নান কবে জপতপও করতেন বোধহয়, ঘোর ব্রাহ্মণ, আশুবাবুব সঙ্গে খুব যাতাযাত ছিলো। একটা স্কুলেব হেডমাস্টার নামেব জন্যই, বা পার্সনালিটির জোবের জন্যই স্কুলের নাম—এখনও বোধহয় তাই আছে—স্কুলের প্রাণকেন্দ্রই হন হেডমাস্টাব মশায। সংস্কৃত স্কুলেব হেডমাস্টার রায় সাহেব আদ্যানাথ রায় মশায় খুব ঘুবে বেড়াতেন। ক্লাশগুলি সব ঘুরে ঘুরে পরিদর্শন করতেন। তবু তারই মধ্যে স্কুল পালাতুম মাঝে মাঝে। তখন স্কুলে পড়াই তো বাবার অনুরোধে—স্কুলের পড়া কিছুতেই ভালো লাগত না। নিজেব পডাব অন্য প্রয়োজন ও তাগিদও ছিলো। কবিতা, বিশ্বসাহিত্য, নানা বিষয়ে কৌতূহল ও প্রশ্ন ছিলো, স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে যার কখনোই উত্তর মিলতো না। তাই একটা স্কুল পালাবার পন্থা আবিষ্কার করলুম। রোজ স্নান করে ভাত খেয়ে সাড়ম্বরে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতুম। মা জানলেন আমি স্কুলে গেছি। আগেই খিড়কির দরজার খিলটা নিঃশব্দে খুলে রেখে দিতুম। স্কুল পর্যন্ত না গিয়েই বা স্কুলে গিয়ে শরীব ভালো নেই অজুহাত দেখিয়ে, খিড়কি দিয়ে পড়ার ঘরে—একতলায়, ঢুকে নিজের বই নিয়ে বসতুম। বাবা বই কিনবার টাকা দিতেন। একটু আপত্তি করে বলতেন, "তোমার এতো বই কিনতে হয় কেন?" কিন্তু শেষ পর্যন্ত টাকা দিয়ে দিতেন। তখন বই কত সস্তা ছিলো। এক শিলিঙ, দুই শিলিঙে বেশ ভালো বই পাওয়া যেতো। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বইয়ের দোকানে ইউসুফ ডেকে বই দেখাতো, দিতো—deferred payment করেও দাম দিতে পারতুম। পাড়াতে সকলে চিনতো—সুবিধে ছিলো। "নাদুবাবু" বুক কোম্পানীর মালিকের ছোট ভাই খালি গায়ে খালি পায়ে খেলা দেখতে যেতেন। ওঁদের দোকানে ওঁরা বই আনাতে জানতেন। ভেতরের ঘরে গিয়ে আমি বসে বই ঘাঁটতুম—rummage করতুম—বসে পড়তুম। পাড়ার বইয়ের দোকান—যেমন এস কে লাহিড়ী বা চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী বই ধারও দিতেন, পরিষ্কার করে রেখে ফেরৎ দিতুম। স্কুল পালানোর একটা মজার ঘটনা—একদিন স্কুলে না গিয়ে এস কে লাহিড়ীর দোকানে বই ঘাঁটছি—গল্প নাটক কবিতা বা ওরকম কিছু—বাবা রাস্তা পার হয়ে আমি

যাচ্ছিলেন, দোকানে দেখতে পেলেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললেন, "তুমি আজ স্কুলে যাওনি ?" আমি তৎপর উত্তর দিলুম "হ্যাঁ"। বাবা বললেন, "আমি যে তোমাকে দেখলুম এস কে লাহিড়ীর দোকানে।" আমি বললুম, "ভুল দেখেছেন"। বাবা বললেন, "তোমাকে আমি ভুল দেখেছি ?" আমি তখনও বললুম, "ভুল তো হতে পারে।" তাতে বাবা বললেন, "হ্যাঁ, philosophically speaking ভুল হতে পারে সত্যি।" নানা ফন্দি ফিকির করে স্কুল পালাতুম। কোনোদিন অনুমতি নিয়ে আসতুম, কোনোদিন গল্প বানাতুম! একদিন মা ধরে ফেললেন। বাবা আপিসের পর বাড়ি আসতে বাবার কাছে নালিশ করলেন। বাবা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন—আমি বললুম, "অতুলবাবু মারা যাচ্ছেন (মিত্র স্কুলের একজন মাস্টার মশাই। তখনও আমি মিত্র মেনে পড়ি—বয়সও খুব কম) তাই স্কুল বন্ধ হয়ে গেলো।" পরে বাবা খবর নিয়ে জানলেন—বাজে কথা। আমায় বললেন, "তুমি সেদিন আমায় বললে অতুলবাবু মারা গেছেন, আমি তো আজ তাঁকে দেখলুম।" আমি তো হার মানবার পাত্র নয়, তক্ষুনি বললুম, "আশ্চর্য, সবাই আমাকে বললো উনি মারা যাচ্ছেন, না গেছেন—স্কুল ছুটি হয়ে গেছে, আমি তাই বাড়ি চলে এলুম।" বাবা ধমক দিয়ে বললেন, "তুমি স্কুল পালাবে বলে মাস্টারমশাইদের মেরে ফেলছো!" এরকম করে স্কুলের পড়াশোনা চললো—কোনোবার ফেল, কোনোবার পাস, কোনোবার অঙ্কয় ১০০য় ১০০, কোনোবার ০। বাবা অনেকবার স্কুলে খবর নিতে গেছেন। কোনো আপত্তিকর বা বিরূপ মন্তব্য কখনো শোনেননি বোধহয়—অন্যমনস্ক, কিন্তু ভালো লিখতে পারে। লেখার তারিফ মিত্র থেকে সংস্কৃত স্কুল ও কলেজের মাস্টার-মশাইরা করে গেছেন। মিত্রতে পঞ্চাননবাবু একজন শিক্ষক ছিলেন, আমাকে খুব ভালোবাসতেন, বোধহয় খানিকটা spoil করতেন। আমাকে ক্লান্ত দেখলে খুব স্নিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করতেন, 'বাড়ি গেলে মা কি খেতে দেবেন ?' আরেকজন ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভট সাগর—রাঙা জ্যাঠাবাবুর ক্লাসফ্রেণ্ড, আশুতোষ কলেজে পার্টটাইম্ পড়াতেন। তিনি ছিলেন মিত্র মেন-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার। আমাকে খুব খাতির করে ডাকতেন, দে মশায়। স্কুলে চুলটা একটু ঘেঁটে রাখতুম পূর্ণবাবুর সামনে। দেখেই বলতেন, "দে মশায়, শরীরটা যেন একটু খারাপ দেখাচ্ছে।" খুব সহজেই শরীর খারাপ করতে বা দেখাতে পারতুম (মা তো আমার এই ক্ষমতাকে ভয়ই করতেন, বলতেন, "না, না তোমাকে আর জ্বর করতে হবে না)—আমার স্কুলে ভালো লাগত না তাই ওঁর কথায় সায় দিতুম। উনি বলতেন, "আমি দরোয়ানকে লিখে দিচ্ছি ছেড়ে দিতে, বাড়ি চলে যাও।" আমি সানন্দে চলে যেতুম, আর অন্যদের যে কি রকম লাগতো সে কথা ভেবে আরো মজা পেতুম। উনিই ক্লাসে খবর নিতেন, "দে মশায়, কি লিখছেন ?" আর লেখা পড়েই বলতেন, "আহা কী লিখেছেন।" সংস্কৃত স্কুলে একজন মাস্টারমশাই ছিলেন ক্ষেত্রগোপাল মুখোপাধ্যায়, ট্রিপল্ এম এ। পরে তিনি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে চলে যান—আমাকে বিশেষ ভালোবাসতেন। ছবি দেখতে ভালবাসতুম বলে রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ছবির বই কিনে উপহার দিতেন—অনেক সাহায্য—রুচির উন্নতি করেছেন। খুব সহজ ভাবে এসে বলতেন, "এটা আমি তোমায় দিচ্ছি।" ক্ষেত্রবাবুর খুব হাই ব্লাড প্রেসার ছিলো, সব সময়ে হাতে তালপাখা একটা থাকতো। সংস্কৃত স্কুলের শেষ পরীক্ষার পর একটা রূপোর পদক দেওয়া হয়েছিলো—"উপেন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার"—বসুমতীর তরফ থেকে দেওয়া—দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মশায়ের ব্যবস্থাপনায়। সংস্কৃত স্কুলের ক্লাসগুলিতে ছাত্র কমই ছিলো—২০জন মাত্র। আমাদের ক্লাস হতো

একতলাতে কলেজ স্কোয়ারের দিকে, আর কলেজের ক্লাস ও সংস্কৃত পণ্ডিতদের টোল হতো গোলদীঘির দিকে। একদিন মনে পড়ে দক্ষিণী সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রী লক্ষ্মণ শাস্ত্রী ক্লাসে এসে আমার সঙ্গে সংস্কৃততে কথা বলতে আরম্ভ করে দিলেন। তিনি বাংলা বা ইংরিজি বলতে পারতেন না—শুধু সংস্কৃত। মহা বিপদে পড়লুম। সংস্কৃত তো ভালো জানি না, তার উপর ওরকম উৎকৃষ্ট দক্ষিণী সংস্কৃত। আমি হেঁহেঁ করে কোনো মতে পালিয়ে বাঁচলুম।

আমাদের গৃহশিক্ষক তখন ছিলেন রামরেণু আচার্য—আগে সাধনদাকে (জ্যাঠতুত ভাই—জ্যাঠাবাবুর ছোট ছেলে) পড়াতেন, পরে আমাকে। আগে সাধনদার সঙ্গেও খুব ঝগড়া হয়ে যেতো—আর পরে আমিও খুব তর্ক করতুম তাঁর সঙ্গে নানা বিষয়ে। রোজ পড়ার বদলে তর্ক আর চলে যাবার সময়ে রামরেণুবাবু বলতেন, "দেখো, আজও তুমি তর্ক করে সারাক্ষণ কাটালে, পড়লে না। কাল আর তর্ক করবে না।" তিনিও ট্রিপল্ এম এ ছিলেন।

অনেক সময়েই তখন, এরকম নানারকমের দুষ্টুমী করে রসিকতা করেছি। পরে নিজেই লজ্জা পেয়েছি। যেমন একদিন ১৩ নম্বরে দাদাদের নকল করে দেখাচ্ছি সেন্ট জেভিয়ার্সের একজন প্রফেসরের চলন বলন। সকলে খুব তারিফ করে হাসছিলো। হঠাৎ খেয়াল হলো সকলের চাউনী যেন আমাকে পেরিয়ে আরো পেছনে। ফিরে দেখি যাঁকে নকল করছি তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে। সে ভদ্রলোকও বললেন, "চলুক না!" কোনো মতে পালালুম—কলেজ স্কোয়ারে বুদ্ধদেবের একটা হল আছে (মহাবোধি সোসাইটি হল) সেখানে গিয়ে ঢুকলুম, দেখলুম দেয়ালে বড় বড় হরফে লেখা "Do not indulge in idle talk!"

অবশ্য এই ধরনের ঘটনা আমার আরো একবার ঘটেছিল—সে কিছুকাল পরে—একবার প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ডেকে পাঠিয়েছেন—বরানগরে ওঁর বাড়ি—আপিসেও—গেছি সেখানে। জীবন্ময় রায়ও তখন সেখানে থাকতেন। তা আমি প্রশান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করলুম। তার পরে জীবন্ময়বাবুর খোঁজ করলুম—প্রশান্তবাবু তাঁর সেই ভঙ্গী ও ভাষায় বললেন, "আছে আছে।" ওঁর তখন ছোট ইউনিট—এখনকার তুলনায়—তারপর তো অনেকই বড় প্রকাণ্ড ব্যাপার হয়েছে—তা আমি ভাবলুম একটু আড্ডা দিয়ে যাই সমরবাবু রাজকুমারবাবুদের সঙ্গে, তাঁরা সকলেই এখন খুব গণ্যমান্য লোক। ইয়ার্কি করেই প্রশান্তবাবুর নকল করছি, হঠাৎ মনে হলো সবাইকার চোখ অন্য দিকে—মুখও যেন কী রকম বদলে গেছে। তাকিয়ে দেখি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ মশাই দরজায় দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড লম্বা গম্ভীর লোক—আমায় দেখে তাঁর সেই বিশেষ ভঙ্গীতে বললেন, "বিষ্ণু, তোমার এখানকার কাজ শেষ হলে আমার কাছে আরেকবার এসো। একটু কথা আছে।" বলেই ফিরে গেলেন। মনে আছে সেবারও খুব লজ্জা পেয়েছিলুম। এই বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়। একবার প্রমথ চৌধুরী ও ইন্দিরা দেবীও এসেছিলেন। সেদিন মনে আছে খুব বৃষ্টি হয়েছিলো—রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো।

সংস্কৃত স্কুলে পড়বার সময়ে আমার ক' বছরের সহপাঠী ছিলেন ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়। গেরুয়া রঙের জামা কাপড় পরনে, মাথায় বাবরি চুল—বোধ হয় ওর মায়ের কোনো মানত ছিল,—চোখ সব সময়েই অন্যমনস্ক, সারাক্ষণই আপন মনে গান করছে—গল্প করার, কথা বলার বা খেলা করার সময় একেবারেই নেই। আর ম'

মাঝে মাথা নীচু করে নিজের নাকমলা, কানমলা—গানের ভুল হয়ে যাচ্ছে—নিজেই বুঝে নিজের দোষ শুধরে নিচ্ছে, ক্ষমা চাইছে—কার কাছে কে জানে—নাক-কান মুলে নিজেই প্রতিজ্ঞা করে নিচ্ছে নিজের কাছে ও ভুল আর করব না। রাস্তায় চলাও ওইরকম উদাসীন অন্যমনস্ক ভাবে, আশেপাশের কিছুর সঙ্গে সংশ্রব নেই। আর থেকে থেকে সেই নাক-কান মলা! গানের সমুদ্রে ডুবে থাকতো যেন, আর সমস্তক্ষণ মনে মনে তার রেওয়াজ। ক্লাশের বেঞ্চের উপর হাঁটু তুলে তার মধ্যে মুখ গুঁজে আপন মনে গুনগুন করে গান করতো, শিক্ষক কি পড়াচ্ছেন, বলছেন বা বোঝাছেন সে বিষয়ে মনোযোগ তো নেইই—সর্ব বিষয়ে সে উদাসীন—একাগ্র মনে সে নিজের কাজ করে যাচ্ছে—গানের একলব্য সে। তখন ওর গুরু কে সে একাই জানতো। বোধহয় ওস্তাদ বাদল (বদল) খাঁ—আমরা ঠিক জানতুম না। আমরা ওর সহপাঠীরা কেউ কিন্তু তার ব্যবহারে অবাক বা বিস্মিত হইনি, কখনো ওকে কিছু বলিনি, হাসি ঠাট্টা বা ভুল বোঝা তো একেবারে দূরের কথা। মাস্টারমশাইরাও তার এই অন্যমনস্ক ব্যবহার মেনে নিয়েছিলেন। কেউ কখনও তাকে কিছু বলেননি। কেবল মধ্যে মধ্যে রায় সাহেব আদ্যানাথ রায় হেডমাস্টারমশায়, স্কুল ঘুরে ঘুরে যখন দেখতেন, আমাদের ক্লাশে ভীষ্মদেবকে দেখলেই বলতেন, "এই ভীষ্ম, হেঁটো নাবা, হেঁটো নাবা।" ভীষ্মদেব লজ্জা পেয়ে মাথা হেঁট করে পা ঝুলিয়ে বসতো সকলের মতো।

কিন্তু তিনি চলে যাবার পরই যেমন ছিলো তেমন করেই ভীষ্মদেব আবার নিজের কাজ চালিয়ে যেতো। জানি না, কোন অঞ্চলে হাঁটুকে হেঁটো বলে। নাকি রায় সাহেব রসিকতা করে ভীষ্মদেবের হাঁটুকে হেঁটো নামকরণ করেছিলেন। প্রায় রোজই রায় সাহেব এরকম হেঁটো নাবা বলতেন তখনই হেঁটো নেবে যেতো—কিন্তু তার পরমুহূর্তেই গুন গুন গান নাকমোলা কানমোলা চলতো। গানই ওর প্রাণ—আমরাও বুঝেছিলুম। ফলে টেস্টে ফেল করলো। তখন ওর বাবা এসে হেডমাস্টার মশায়কে অনুরোধ করলেন ওকে পরীক্ষায় বলসে দিতে (অ্যালাউ করতে—যাকে বলে)। ওঁর বিশ্বাস ও পাস করে যাবে। কিন্তু রায় সাহেবের বিশ্বাস তো তা নয়—অনেক তর্কাতর্কি হলো, ওর বাবাও ছাড়েন না রায় সাহেবও টিঁটে। আমরা ভীষ্মদেবের সঙ্গে বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছি কি হয়। শেষ ওর বাবা বললেন, "আমি আমার নাক কেটে ফেলব যদি ও পাস না করে।" রায়সাহেব বললেন, "আমি আমার নাক কান দুইই কেটে ফেলবো যদি ও পাস করে।" যাহোক, শেষ পর্যন্ত ভীষ্মদেবকে পরীক্ষা দেবার অনুমতি মঞ্জুর হলো। আমরাও হাল্কা মনে বাড়ি ফিরে যেতে পেরেছিলুম। সেনেট হলে আমাদের সীট পড়েছিলো। আমি এইসব পরীক্ষা বিষয়ে খানিকটা উদাসীন ছিলুম। আমার এক ভাগ্নে বিনু (বিনয়েন্দ্রনাথ মুস্তাফী—এখন সিউড়ীতে ডাক্তার) আর এক ভাইপো গোবিন্দ ("গোবিন্দ প্রসাদ ঘোষ) আমার সীট খুঁজে আমায় পরীক্ষার হলে বসিয়ে দিয়ে গেলো। পরীক্ষার ফলাফল বা রেজাল্ট জেনে দেওয়াও গোবিন্দ ও বিনুর দায়িত্ব ছিলো। আমার এই বয়সে আমাদের পরিবারেই আমার অনেক বন্ধু ছিলো—আমার প্রায় সমবয়সী—আমার ভাগ্নেরা—মেজ দিদির ছেলেরা মনু, হান্তি, পাগা, পচা, সেজ দিদির ছেলেরা রাঙা দিদির ছেলেরা অশোক, অমিয়। গোবিন্দ, কেশি, বিনু—ন'পিসিমার নাতিরা। ধীরেন—নতুন

দিদির ছেলে। ধীরেনের সঙ্গেই নতুন জামাইবাবুর (নরেন্দ্রকুমার বাসু, হাইকোর্টের উকীল) খুব দামী সিগারেটের নেশাটির হাতে খড়ি। ওদের বাড়িতে খুব হৈ হৈ হতো—গানবাজানার চলও ছিলো খুব। একবার আমার মনে আছে—সে অনেক বছর পরে—একটা আসরে দিলীপ রায় গাইছেন। ভীষ্মদেবও ছিলো শ্রোতাদের মধ্যে। খানিকটা পরে ধীরেন বলল, ভীষ্মদেবকে—'তুমি একটা গাও।' তখন দিলীপ রায় বারবার বলতে লাগলেন ভীষ্মদেবকে মালকোষ গাইতে—সে অনেকবার বললেন। শেষটা এগারটা নাগাদ উনি চলে গেলেন অনেক মিষ্টি টিষ্টি খেয়ে। তারপরে ভীষ্মদেব মালকোষ ধরলে— ঝাড়া এক ঘণ্টা আলাপ।

সেনেটে ভীষ্মদেবের সীট পড়েছিলো ঠিক আমারই পিছনে। অন্য সব দিনের পরীক্ষা বেশ নিয়ম মাফিক হয়েছে। শুধু ইতিহাসের দিনটায় একটু গোলমাল বেধে গেলো। বোধহয় ভালো তৈরী হয়নি অথবা অন্যমনস্ক হয়ে ভীষ্মদেবের মন নিজের সঙ্গীত জগতে ঘুরছিলো। আমাকে বারবার পিছন থেকে খোঁচা দিচ্ছে, "বল্ না আকবর কতো পাতা।" আমার কি তখন মনে আছে আকবর কতো পাতা। আমি কোনো মতে বললুম, "আমার তো মনে নেই।" তখন পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি নিয়ম বেজায়, কথা বলা বারণ—অনেক বিপদ হতে পারতো। তাই অতি সন্তর্পণে নীচু গলায় কথা কটা বলতে হয়েছিলো।যা হোক, শেষ পর্যন্ত পৃষ্ঠা খুঁজে পেয়েছিলো বোধহয়, কারণ ফলাফল বের হবার পর মার্কশীট আনালে আমরা সবাই দেখলুম ভীষ্মদেব ইতিহাসে ৬০-এর ওপর নম্বর পেয়েছে। আমাদের তখন একবার কৌতূহল মেশানো ভয় হয়েছিলো যে রায়সাহেব কি এবারে নাক কান কাটবেন ? দেখলুম রক্তারক্তি কোনো ব্যাপার ঘটলো না। হয়তো ভীষ্মদেবকে আকবরের কথা প্রশ্ন না করে তাঁরই সমসাময়িক তানসেনের বিষয়ে প্রশ্ন করলে ভীষ্মদেব অনেক কিছু লিখতে পারতো, যা হয়তো পরীক্ষকেরাও বুঝতে পারতেন না। এই তো আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি, আমার আর একবার মনে হোলো।

রায়সাহেব আদ্যনাথ রায় হেডমাস্টার মশায়ের কড়া শাসনের আরেকটা মজার গল্প প্রায়ই শুনেছি। আমাদের এক বন্ধু স্কুলের গণ্ডী পার হয়ে সবে কলেজে ঢুকেছে, তাই সে বিষয়ে ও নিজে খুব খুশী—এবং সকলকে সাহায্য করতে উৎসুক। আমাদের ক্লাশের দুই বন্ধুর খাতা স্কুলের একটা পরীক্ষায়, হল থেকে বার করে গোলদীঘির দিকে বসে উত্তর লিখে দিয়েছে। দুটো খাতাতেই একই হাতের লেখা—সহজেই পরীক্ষকরা ধরে ফেললেন ! রায়সাহেব ডেকে পাঠালেন দুজনকেই—আমরা ক'জন বন্ধু মিলে বাইরে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কী হবে। বন্ধুদের খাতা দেখাতে ওরা বললে : আমরা একসঙ্গে পড়েছি, মুখস্ত করেছি, আর আমাদের দুজনেরই একরকম হাতের লেখা, সেজন্য এরকম হয়েছে। রায়সাহেব বললেন, "লেখ্ !" হঠাৎ কি আর আলাদা হাতের লেখা একরকম হয়ে যায় ? একজন কায়দা করে গায়ের জোরে নিবটাই ভেঙে ফেললো। আরেকজন বললো, "আমি রিলীফ নিবে লিখি।" রায়সাহেব দরোয়ানকে দিয়ে নানা রকমের নিব আনালেন—দুবার বোধহয় নিব ভাঙলো, কাগজ ফুটো হয়ে, খাতা ছিঁড়ে কিছুতেই হাতের লেখা খাতায় লেখার সঙ্গে মিল হয় না—লেখা কি অত সহজে বদল করা যায় বা একরকম করা যায় ! শেষকালের মানতে হলো টোকাটুকি হয়েছে। আবার বোধহয় পরীক্ষা দিতে হলো—ঠিক কী শাস্তি হয়েছিলো আমার মনে নেই—বেশি কঠিন কিছু নয় বোধহয় কারণ ধরা পড়ে সকলেই লজ্জা পেয়েছিলো। তখনকার এই একই বন্ধুটি (সে

তখন first year-এ পড়ে) খুব বড়াই করতো—সব সময়ে আমাদের বলতো কলকাতার বেশীর ভাগ বড়লোক ওর আত্মীয়—যেমন পুলিশের একজন বড় অফিসার ওর মামা। সব সময়ে আমাদের ওরকম বলত—Brass আর কী! একদিন খুব মজা হয়েছে। শরৎচন্দ্র বসু (আমার ভগ্নীপতি, রাঙা জ্যাঠাবাবুর মেয়ে বিভাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয়) একদিন বিকেলে কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে এসেছেন। সেই বন্ধুটি বললো, "এই রে আমার পিসেমশাই হন, আমাকে দেখলেই কথা বলবেন।" আমি বল্লুম "চল না আমারও ভগ্নীপতি হন উনি।" সেবার সে খুব লজ্জা পেয়েছিলো।

রায়সাহেব আদ্যানাথ রায় ট্রান্সফার্ড হয়ে যাবার পর আসেন ব্রহ্মকিশোর মুখোপাধ্যায়—যেমন নাম, তেমনি গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ঘোরতর বিচার, গামছাপেতের পুনরাবৃত্তি—বরং আরো বেশী। তিনি গঙ্গাজল ছাড়া জল খেতেন না। বড় পিসিমার জন্য ঘড়া করে গঙ্গাজল এনে রাখা হতো কলেজ স্কোয়ারে। দারোয়ান স্নান করে সেই জল নিয়ে যেতো ওঁর জন্য। একবার ডি পি আই ওটেন সাহেব (সুভাষ বসুর সময়ে খ্যাত) সংস্কৃত স্কুলে এলেন। ওঁর কাছ থেকে আমার একটা প্রাইজ নেবার কথা। আমি লুকিয়ে পড়লুম—অনেক তলব এলো—খোঁজাখুঁজি—কিছুতেই পাওয়া গেলো না। পরে অনেক ভর্ৎসনা শুনতে হয়েছিলো। স্কুলে ওঁরা কাজ করতেন—ওঁদের নিয়মকানুনে শ্রদ্ধা জানানোর দরকার—আমাদের ছাত্রদের নিয়ে টানাটানি কেন? সব থেকে মজার কথা আমাকেই পরবর্তী জীবনে সেই একই নিয়মানুবর্তিতায় শিক্ষকতা করতে হয়েছে। সাহিত্যে, যাকে বলে ড্রামাটিক আয়রনি।

ভীষ্মদেবের জন্য আমাদের সকলেরই খুব সহানুভূতি ছিলো। খেতে ও খুব ভালোবাসতো। আমরা সকলেই কোনো কোনো খাবার খেতে খুব ভালোবাসতুম—তেমন আলুকাবলী। আলুকাবলীওয়ার কাছে আমার ধার ছিলো, তবে নন্দকিশোর সেনের মতো নয়—গোলগাল মোটাসোটা ছেলে, জবাসুকুম তেলের বাড়ির ছেলে, মিত্র স্কুলে আমার সঙ্গে পড়তো—ওর ২০ টাকা ধার ছিলো। ছেলেবেলায় আমিও কিন্তু চপকাটলেট খেতে খুব ভালোবাসতুম। কিন্তু শরীর ভালো নয়—গ্রীষ্মকালে heat fever হতো। মা নিজে মাংস, ডিম, পেঁয়াজ খেতেন না, বিচার সত্ত্বেও ভিতরে ঠাকুমার ঘরে ইকমিককুকারে মুরগীর ঝোল বা স্টু ও ভাত রেঁধে দিতেন—তারপব স্নান করে সংসারেব কাজে যেতেন। আমার তখন বাড়ন্ত বয়েস ওই খাওয়াতে চলবে কেন? আমি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটে ছোট্ট একটা পূর্ববঙ্গীয় লোকেদের দোকানে গিয়ে খেয়ে আসতুম—তাঁরা খুব ভালো লোক ছিলেন। ঠিক ইন্ডিয়ান পায়োনীয়র্স-এর দোকানের পাশে। একদিন বোধহয় মাত্রাটা বেশী হয়েছিলো। শরীরটা খারাপ লাগলো—সামলাতে না পেরে জ্যাঠাবাবুরা যে হলঘরে বসতেন তার সামনের উঠোনেই বমি করে ফেললুম। জ্যাঠাবাবুদের সম্পূর্ণ সহানুভূতি—"ছোটবৌমা নিজে হাতে রেঁধে ছেলেকে মুরগীর ঝোলভাত খাইয়েছে—তার এই রকম বমি হয়। ছেলেটার লিভারটা একদম গেছে—ভালো চিকিৎসা করাতে হবে।" বাবা কিন্তু একদিন আমাকে দেখে ফেলেন আপিস যাবার সময়ে। তখন কিছু বলেননি, সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে বললেন, "তুমি ঐ দোকানে বসে কী খাচ্ছিলে?" শেষকালে চপকাটলেট খাওয়া ছেড়ে দিতেই হলো। ক্ষিদে পেলে একটা করে সন্দেশ খেতুম—অনেক নিরাপদ।

একবার অনেক নামকরা গায়করা গাইছেন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে। ভীষ্মদেবও গাইছিলো। অনেক মান্যগণ্য লোক ছিলেন—স্যার হাসান সুহ্‌রাওয়ার্দী, স্যার

দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী আরো অনেকে। ভীষ্মদেবের গলা তখন অন্যরকম ছিল—খুব জোরালো। ভীষ্মদেব একটি গান করলো—সবটা এখন আর মনে নেই—তার একটা কলি হচ্ছে "ও ছুঁড়ি তুই..." ইত্যাদি—একেবারে বিশুদ্ধ মার্গসঙ্গীত জাতীয় গান—গানের কথাগুলিই ঐ রকম। কিন্তু ভীষ্মদেব বেমালুম গেয়ে গেলো—খুব তারিফও হলো। কথাগুলির জন্য কেউ কিছু মনে করলো না—আমাদের কজনের খারাপ লেগেছিলো। পরে সেই জোরালো, প্রায় কর্কশ গলা কি মোলায়েম না করেছিলো, আব্দুল করিমের মতো, সাধনা করে! অনেক বছর পর একবার বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে ভীষ্মদেব গান গাইবে বলে খবর পাঠায়। যেতে হলো—এবং স্টেজে উঠে ভীষ্মদেবের কাছে বসতেও হলো। বেশ গাইছিলো—পুরনো রেকর্ডের গানও একটা দুটো গেয়েছিলো—শ্রোতারা বলছিলেন, ভালোও লাগছিল সকলের। হঠাৎ বলে উঠল, আর গাইব না—ভালো লাগছে না।" আমার দিকে চেয়ে—"চল্, কিছু খেয়ে আসি" বলে উঠে পড়লো। সকলে বোধহয় একটু দুঃখিতই হলো—বেশ ভালো গাইছিল—শেষের দিকে শুনেছি ওইরকম খেয়ালী হয়েছিলো, কিছুক্ষণ গেয়ে থেমে যেতো। সেদিন ধরে নিয়ে গেলো "চল্ একটু চপ কাটলেট খাই" ঠিক ছেলেবেলার মতো। আমি বললুম, "আমি তো ওসব খাই না।" খুব আশ্চর্য হয়ে গেলো তাতে। "চপ কাটলেট তো ভালো জিনিষ। খাস্ না!" নিজে কিন্তু অনেক কিছু খেলো আমাকে পাশে বসিয়ে। শেষটায় যখন উদ্যোক্তা বা কর্মকর্তারা চারটে বড় বড় রাজভোগ নিয়ে এলেন প্লেটে করে, ভীষ্মদেব পুলকিত হয়ে—খুব একটা জিত হয়েছে এইভাবে আমায় বলে উঠলো,"এটা তো খাস্!" নিজে খেলো দুটো, আমাকেও জোর করে খাওয়ালো দুটো। অনেক পরে আরেকবার দেখা হয়েছিলো ভীষ্মদেবের সঙ্গে—আলী আকবর কলেজ অফ মিউজিকে—তখন সেটা আমাদের বাড়ির কাছে ছিলো। প্রমোদ মুখার্জী ওর বিয়েতে নেমেন্তন্ন করেছিলো। আমাকে ফিস-ফিস করে ভীষ্মদেব বললে, "আমার দাঁতগুলো সব পড়ে গেছে—আমার দিকে তাকাস্‌নি।" তবু প্রমোদের বিয়েতে আনন্দ করে খেয়েছিলো।

ম্যাট্রিক পাশ করে আবার সংস্কৃত কলেজেই আই এ পড়েছি। বোধহয় ভীষ্মদেবও পড়েছিলো—ঠিক মনে নেই—যদিও আমরা দুজনেই এই শিক্ষাব্যবস্থাকে সমর্থন করতে পারিনি কোনোমতেই। তবু অল্প বয়স থেকে অনেক কাল ধরে দৈনন্দিন দেখাশোনা, অধ্যয়ন, ঘোরাফেরা আনন্দস্মৃতি মনে রয়ে গেছে।

মিত্র স্কুলে পড়বার সময়েই "সন্দেশ" পত্রিকায় একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিলো। একটি ছবির ওপর কবিতা লিখলে দশ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। কবিতা পাঠিয়ে দিলুম, পুরস্কার অবশ্য পাইনি—কিন্তু মজা লেগে গেলো কবিতা লেখা বিষয়ে, তাই লিখতে লাগলুম। কবিতা লিখেছিলুম—চ্যালেঞ্জটার জন্য না পুরস্কারের জন্য, মনে নেই—নিশ্চয়ই দশ টাকার ওপর লোভও ছিলো! এবং পুরস্কারটা না পেলেও কবিতা লেখার মজাটা পেয়ে লিখে গেছি নিজের খুশীতে নানা রকম কৌতূহলে—যদিও তখন স্বাভাবিক ভাবেই মুগ্ধ ছিলুম সত্যেন দত্তর ছন্দের বাহারে। আত্মীয় বন্ধুর বিবাহের পদ্যও লিখেছি অন্য এক তাগিদে বা ফরমায়েশে। একটি রচনা মনে পড়ে 'প্রবাসী'র মতো উচ্চবর্ণ পত্রিকাতে পাঠিয়েছি—এবং একটু অবাকই হয়েছিলুম, যখন ডাকটিকিট সত্ত্বেও ফেরৎ আসেনি। উল্টোদিকে আবার অবাক হয়ে যাই—মনে আছে—এর কিছু কাল পরে—'বিচিত্রা' কাগজের কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্বতঃপ্রবৃত্ত উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়। তখন লিরিক্যাল কবিতাই বেশী—সত্যেন দত্তর ভক্ত। হঠাৎ স্কুলে পড়তেই নিজের এই

ধরনের কবিতার বিষয়ে, নিজের লেখার বিষয়ে বিতৃষ্ণা আসে—শ'দুয়েক কবিতা ড্রামাটিক ভাবে ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দিই। শ্যামল রায় ছদ্মনামে গল্পও লিখেছি। তার পর ছেড়ে দিলুম। মনে হলো—"দে কেম সো প্যাটি"—ইংরিজিতে যেমন বলে—সহজে সাহিত্যসৃষ্টি হয় না। সেই অল্প বয়সেই উপলব্ধি হয়েছিলো যে কবিতা আসলে লেখকের ব্যক্তিস্বরূপের প্রকাশ নয়—আসলে তা ব্যক্তিস্বরূপ থেকে নিষ্ক্রমণ। কবিতা তো আসলে লেখাই হয় শব্দের ছন্দে তার অবচেতন Subconscious-এর তাড়নায়। ভাষায় সত্তা প্রকাশ পায় তার নিজস্ব শক্তিতে সবচেয়ে বেশী কথার ধ্বনিতে। অবিশ্যি একজন কবির মনে সবসময়ে এই চাপের বোধ থাকবে এমন কোনো নিয়ম নেই! এই ছন্দমিলের পালাকীর্তনের পর লেখার ধরন বোধহয় একটু পাল্টে গেলো। "জন্মাষ্টমী" কবিতার শেষাংশের আরম্ভের প্রথম দশ লাইন এই সময়ে এসে যায়। অসমাপ্ত দশ লাইন—কিন্তু ঝোঁকটা বোধহয় আন্তরিকই ছিলো। সবটাই সম্পূর্ণ হয়ে গেলো প্রায় দশ বছর পরে এবং ওই আগের দশ লাইন স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেল দীর্ঘ কবিতাব মধ্যে (জন্মাষ্টমী)। অনেকের মতে যার নাম হয়েছিল "থান ইঁট।"

বছব সতর-আঠারো যখন বয়স তখন সীতারাম ঘোষ স্ট্রীটের বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটতে দেখি যা আমায় মর্মাহত ও লজ্জিত কবেছিলো,মনে আছে এক বছর রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। আমার ডিডাকটিভ লজিক পড়তে ভালো লাগত না। ইনডাকটিভ লজিক ভালো লাগতো। বাবা তাগাদা কবতেন। একদিন রাত জেগে ওই রকম পড়ছি—এক ভদ্রলোক, তাঁর এক ইয়ার ও একটি মেয়েকে নিয়ে ট্যাক্সি করে আমাদের বাড়িব সামনে এসে থামেন। কেউই খুব প্রকৃতিস্থ অবস্থায় নয়। সামনেই তাঁদের বাড়ি—দোতলাব জানালায় তাঁব মা দাঁড়িয়ে—বেশ ভালো ও নামকরা লোক ছিলেন পাড়াব—সেবাশুশ্রূষার কাজ করতেন—ভদ্রলোকের স্ত্রীও ঘোমটা দিয়ে মায়ের (শাশুড়ীর) পাশে দাঁড়িয়ে। এই দৃশ্যটাতে আমি খুব শক্‌ড হই। পরের দিন পরীক্ষা দিতে পারিনি। এক বছর রাত্রে ঘুমোতে পাবিনি। লিখে লিখে কবিতা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পবের বছর বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই-এ পরীক্ষা দিই। এই সময়ে প্রফেসর নীরেন্দ্রনাথ রায ঠিকমতো পরীক্ষার পড়া হচ্ছে কিনা দেখতেন। নীরেনবাবু আমার জ্যাঠতুতো দাদা সন্তুদাদাব (সুকুমার দে) ক্লাশ ফ্রেন্ড ছিলেন। এই সময়ে আঠারো-উনিশ বছর বয়সেই "উর্বশী ও আর্টেমিস" লেখা হয়। আই-এ পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সীতে না গিয়ে সেন্ট পলস্ কলেজে ভর্তি হই। স্কুলে থাকবার সময়েই প্রগতি, কল্লোল, ধূপছায়া, পূর্বাশা এই সব পত্রিকার সঙ্গে জড়িত ছিলুম। বাবা মাঝে মাঝে একটু বিচলিত হতেন—"তুমি কাদের সঙ্গে মেশো ? তারা তো বয়সে তোমার থেকে অনেক বড়ো। তুমি রাত আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে বাড়ি ফেরো না—এটা ঠিক নয়।" আমি বলতুম, "না, আমি তো আটটা সাড়ে আটটার মধ্যেই বাড়ি ফিরি।' এবং ফিরতুমও। প্রগতির জন্য চাঁদা তুলে পাঠাতুম ঢাকায় বুদ্ধদেববাবুর কাছে। প্রগতি কোয়ার্টার্লি কাগজ। রাজশেখর বসু (আমার ন-জামাই বাবু, ভীষণ গম্ভীর, আমাকে খুব স্নেহ করতেন—আমাদের সকলকেই) তখন বেঙ্গল কেমিক্যালস-এর ম্যানেজার। বিজ্ঞাপনের জন্য চাঁদা দিতেন, তিন মাস অন্তর প্রগতির জন্য টাকা দিতেন। যখন সেকেন্ড ক্লাসে পড়ি তখন একটা মজার ঘটনা ঘটে। ন-দিদি (রাজশেখর বসুর স্ত্রী—ভালো নাম মৃণালিনী) এসে মায়ের কাছে বলেন—"তোমাদের জামাই বলছিলেন বিষ্টু কি সব লিখছে—ওর বিয়ে দেওয়া দরকার।" মা খুব বিচলিত হয়ে রাত্রে বাবাকে

বললেন। বাবা আমাকে বললেন, "তুমি কি সব লিখেছো—রাজশেখর বলেছে, তোমার ন'দিদি তোমার মাকে বলেছে!" আমি বললুম, "পড়ে দেখতে পারেন।" প্রেমের কবিতা লেখা তো সব থেকে সহজ, আর আমি তো তখন নানা রকম ছন্দ নিয়ে বাংলায় এক্সপেরিমেন্ট করছি—ট্রিওয়েলট, ভিলানেল, বালাদ—এই রকম নানান ফরাসী ও অন্যান্য ছন্দের ফর্ম। বাবাকে পড়তে দিলুম। বাবা বললেন—"বুঝতে পারি না। তবে তোমাকে একটা কথা বলি—যখন তোমার সামনে প্রেমের কোনো অবজেক্ট নেই অবজেক্টলেস বিষয়ে কবিতা লেখা তোমার মনের একটা খারাপ অভ্যাস হয়ে যাবে না তো?" তখন আমার মনে হয়েছিল বাবার একিউট অবজারভেশন-এ দারুণ পয়েন্ট ও ডেপথ আছে—উনি তো সাহিত্য বা ফিলসফি পড়তেন না, কিন্তু ওঁর এই মন্তব্যটা খুবই সত্য এবং লিটেরারি ক্রিটিসিজম-এর দারুণ কথা। বাবাই আমার প্রথম বই "উর্বশী ও আর্টেমিস" ছাপাবার টাকা দিয়েছিলেন।

বাবার জন্ম জুন ১৮৬৯ (জ্যৈষ্ঠ ১২৭৬)—ঠিক ১১০ বছর পূর্ণ হলো। বাবার কথা, রাঙা জ্যাঠাবাবুর কথা, জ্যাঠাবাবুর কথা—,পুরনো দিনের কথা খুব মনে পড়ে যায়—ছোট ছোট ঘটনা ভাবলেও এখন মজা লাগে, যেমন বাবার জন্মের বা নামকরণের কথা। আমাদের ঠাকুমা শুনেছি যদিও জনাইয়ের মিত্তির বাড়ির মেয়ে ছিলেন, সংসারের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করতেন—লোকজন থাকা সত্ত্বেও। যেমন—বাসন মেজে রেখে গেলে সেগুলি আবার জল দিয়ে ধুতেন। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখা, কাপড় কাঁচা, তরকারী কোটা, পান সাজা, এমনকি শুনেছি বাচ্চাদের যদি ঠাণ্ডা লেগে যায়, তাই নর্দমায় পর্যন্ত কাগজ ঠুসে গুঁজে দেওয়া এরকম কাজ সারাদিন করতেন—পিসিমা-জ্যাঠাইমাদের কাছে গল্প শুনেছি। বাবাদের নামকরণের মজার গল্প আছে। রাঙা জ্যাঠাবাবুর জন্ম-কথা শুনেছি একেবারে অভিনব। বঠঠাকুমা, যাঁকে আমরা অনেক পরে আসা সত্ত্বেও ডাকতে বা তার বিষয়ে উল্লেখ করতে শিখেছিলুম 'আমমা' বলে,—তিনি ঠাকুমার চানের ঘর থেকে বেরুতে দেরী দেখে বাড়ির ভেতর দিকের স্নান পায়খানার ঘরের সামনে গিয়ে ডাক দেন (তিনি নিজেই পরে গল্প করেছেন কারুর কাছে)—"ও ছোট বউ অতক্ষণ কি করছ?" ফিস ফিস স্বরে জবাব পেলেন—"ছেলে হয়ে গেছে।" ফিস ফিস কারণ ভাসুর তো রয়েছেন বাড়ির সামনের দিকে, যদিও অনেক দূরে, তবু যদি গলা শুনতে পান। আমমা বললেন, "বেরিয়ে এসো, ওখানে থেকে কী করবে?"—এই রকম কিছু বোধ হয়। তারপর, তাঁদের সব ব্যবস্থা হলো। ইনিই হলেন আমাদের রাঙা জ্যাঠাবাবু—অক্ষয়কুমার দে—অক্ষয় তৃতীয়ার দিনে জন্ম বলে বোধ হয়। আমাদের জ্যাঠাবাবুরা, জ্যাঠাবাবু (যোগেশচন্দ্র), মেজ জ্যাঠাবাবু (সুরেশচন্দ্র), ন জ্যাঠাবাবু (নরেশচন্দ্র), বঠঠাকুরদা শ্যামাচরণ দে বিশ্বাসের তিন ছেলে, আর সেজ জ্যাঠাবাবু (পাঁচকড়ি), নতুন জ্যাঠাবাবু (শশিভূষণ) তখন আমাদের ঠাকুরদা বিমলাচরণের এই দুই ছেলে ছিলেন। এই কয় ভাই মিলে সদ্যোজাত ভাইয়ের নাম রাখলেন 'গু' পায়খানাতে জন্মেছেন বলে। কিন্তু, সেই নামে তো আর ডাকা যায় না—যখন ভাই বড় হলো তার পরবর্তী ডাক নাম হল জাং (বা যাং)। বাবা জন্মান তার বছর দুই পর—তাই বাবার ডাক নাম হলো 'গোবর', ব্যাস্, সব শুদ্ধি হয়ে গেলো। বাবার ডাক নামটি ছিলো

তাই,—নামকরণের ইতিহাসটি হলো এই। বাবা দেখতে খুব সুন্দর ছিলেন। রোগা, ৬ ফুট লম্বা—স্ট্রেট (আমার মতো কুঁজো নয়) খুব ফর্সা, নাক টিকলো—তাই আমাদের দাদামশায় (গিরীন ভোঁশ) বাবাকে 'সাহেব' বলে ডাকতেন। বাবার চেহারা, শরীরের গঠন ও স্বভাবের জন্য। বাবাদের বড় দুই ভাইয়ের পর মেয়ে, আমাদের ন-পিসিমা, কুমুদিনী নাম ছিলো—তারপর আবার ছোট এই দুই ভাই। ঠাকুমা, ঠাকুরদা, বাবার জন্মের অল্প কিছুকাল পরেই মারা যান, সেজন্য ন-পিসিমার, এবং পরিবারের সকলেরই বলতে হয় বাবার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও যত্ন ছিলো—বাড়ির সব চেয়ে ছোট ছেলে বলে, আর নিশ্চয়ই বাবার স্নিগ্ধ স্বভাবের জন্যও। আমার মনে পড়ে একবার কলেজ স্কোয়ারের বাড়িতে কড়াইশুঁটির কচুরী হবে বলে—বা অন্য কিছু—সরস্বতী পুজোর খিচুড়ী হয়তো—আমাদেব, ছোটদের দলের ডাক পড়লো কড়াইশুঁটি ছাড়াতে। আমাদের বাড়িতে যা কিছুই হতো তা সবই লার্জ স্কেলে—অনেক বেশী পরিমাণ করতে হতো—সরস্বতী পুজোর পবের দিন গোটা সিদ্ধ ডাল—ডিলেকটেব্‌ল্‌! বা দশহরার ফলার—সে ঢালাও ব্যবস্থা হতো—অপূর্ব লাগত হৈ হৈ করে সকলের সঙ্গে খাওয়া—অবশ্য এখনও লাগে। সেবার আমরা সব ঝুড়ি ভর্তি কড়াইশুঁটি ছাড়াচ্ছি, এবং সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য সকলেই চুপি চুপি একটু একটু উদরস্থও করছি,—বড় পিসিমাব সেটা নজরে পড়েছিলো। কিন্তু ওঁর মনটা তখনই চলে গিয়েছিলো অনেক পুরনো একটি ছবিতে—আমাদের বাবা ওঁদের সবচেয়ে ছোট ভাই—সেও এরকম কড়াইশুঁটি ছাড়াতে গিয়ে খেতো ঠিক আমাদেরই মতো। তিনি আমাদের বললেন, "তোদের বাবা যত না কড়াইশুঁটি ছাড়াতো তার থেকে বেশি খেতো!" মনে পড়ে বাবার ছোটবেলায় বসে কড়াইশুঁটি ছাড়াচ্ছেন ও খাচ্ছেন ঠিক আমাদেরই মতো—আমাদেরই বাবা, ছোট কি রকম বোঝা তো যাচ্ছে না। বড়রা ছোট সেটা যেন ছোটবেলায়, ভালো উপলব্ধি করা যায় না। আরেকটা গল্পও মনে পড়ে, মায়ের কাছে, আরো অনেকেব কাছেও শুনেছি বাবার চেহারা খুব সুন্দর ছিলো, রং খুব ফর্সা বলে জ্যাঠাবাবুর বড মেয়ে আমাদের বড়দি, বিয়ের পর থাকতেন এলাহাবাদে, মাঝে মাঝে আসতেন কলকাতায়—তখন বাবাকে চান করিয়ে দিতে ভালোবাসতেন—পিঠে সাবান মাখিয়ে দিতেন—বাবার বিয়ের পরও। মা খুব খুশী।—খুব আহ্লাদ ও গর্ব করে এই গপ্পোটি করতেন। আমার ভাইবোনদের মধ্যে আমিই ছিলুম সবচেয়ে কালো। কেউ কত কালো তার তুলনা করতে হলে বলতেন—"কার মত কালো—বিষ্টুর মতো?" আমাকে বাড়ির সবাই "বিষ্টু" বলে ডাকতো। একদিন এরকম তুলনা করে বলছিলেন, আমাদের মেজদিদি (মেজদিদি—নলিনী, লম্বা ফর্সা ও খুব সুন্দরী ছিলেন। মেজজামাইবাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসুরও অপূর্ব গড়ন ও রং ছিলো; খুব গম্ভীর লোকও ছিলেন।) আপত্তি করেন—"ছোট কাকী, কী যে তুমি বলো! বিষ্টুর সোনার মতো রং, একটু রোদে পুড়ে পুড়ে রংটা জ্বলে গেছে—তাকে বলছ তুমি কালো!"—আমি যা খুশী হয়েছিলুম—আমার সামনেই কথাটা হয়েছিলো। বাড়িতে পরে, বাবার মতো, আমিও দিদিদের সকলের জ্যাঠাবাবু রাঙাজ্যাঠাবাবু, আমাদের একান্নবর্তী পরিবারের সকলের আদরযত্ন ভালোবাসা পেয়েছি। ন-জ্যাঠাইমা আমাদের অতবড় সংসারের দায়িত্ব নিয়ে থাকতেন, মানুষ হিসেবে ওঁর মতো লোক আমি কমই দেখেছি। তাঁর নামটিও সুন্দর ছিলো কৃষ্ণবিনয়িনী—আমাকে তিনি অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তাঁর দুই আলমারি বইয়ে আমার অবাধ গতি ছিলো। এখনও মনে আছে ফুলবৌদিদি, সন্তুদাদার স্ত্রী, সবেমাত্র

তখন বিয়ে হয়েছে, ন-জ্যাঠাইমাকে বলেছিলেন, "মা, শরৎ চ্যাটার্জীর বই আপনি আমাকে পড়তে দেন না, কিন্তু বিষ্টুঠাকুরপোকে তো দেন !" সন্তুদাদার জন্মের অনেক বছর পরে, ন-জ্যাঠাইমার ছোটছেলে সুধীর যখন জন্মালো, আমি নাকি তখন বলেছিলুম একটা অশ্বত্থ গাছ থেকে তাকে ফেলে দেবো। ন-জ্যাঠাইমার কাছেই গল্পটি শোনা। ন-জ্যাঠাইমার দু-একটি বই আমার জন্যই হারিয়েছে—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সংস্করণ, ব্রজেন বাঁড়ুজ্যে সাহিত্য পরিষদের কাজের জন্য আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, রসিদও দিয়েছিলেন—কিন্তু সে বই দুটো সজনীকান্ত দাসের হাতে চলে গিয়ে আর পাওয়া গেল না। আমার নতুন-জ্যাঠাইমার কথাও মনে পড়ে আশ্চর্য চরিত্রবলের জন্য। নাগপুর ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার বিপিনকৃষ্ণ বসুর মেয়ে—সরোজিনী। ১৬ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। নতুন জ্যাঠাবাবু ৬ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা, খুব সুন্দর চেহারা, ভালো ডাক্তার হয়েছিলেন, খুব স্নিগ্ধ স্বভাব ছিলো, সকলকে সাহায্য করতে ভালোবাসতেন। তিনি এক ভাগ্নেকে বাঁচাতে গিয়ে পুরুলিয়াব সাহেব-বাঁধে পানিফল লতা জড়িয়ে দুজনেই ডুবে মারা যান—নতুন জ্যাঠাবাবু সাঁতার জানতেন, ভাগ্নেটি জানতেন না। পুরুলিয়ার সাহেব-বাঁধে একটা ফলকে লেখা আছে। তার একটা নকল আমাদের বাড়িতেও ছিল। এটা আমাদের বাড়ির একটা বড় ট্রাজেডি, যা কেউ ভুলতে পারেনি। নতুন-জ্যাঠাইমা তাঁর বাবার কাছে নাগপুরে থাকতেন। তাঁদের প্রকাণ্ড জমি-সহ বাড়ি ছিল. গন্ড পরিবারদের থাকবার কোয়াটার্স ছিল। নতুন-জ্যাঠাইমা গন্ড পরিবারদের সেবাশুশ্রূষা করতেন নার্সের মতো, তাদের ছেলেপিলে হওয়া থেকে অসুখ-বিসুখে। পটলডাঙায় আসতেন ও থাকতেন বছরে এক মাস করে—তখন ঠিক আমাদের অন্য জ্যাঠাইমা মায়েদের মতোই থাকতেন। ভালো ইংরেজী বলতে পারতেন, আদবকায়দা সব জানতেন। পরে নতুন জ্যাঠাইমার ক্যানসার হয়—নানা জায়গায় অপারেশন করেন আবার অন্য জায়গায় ক্যানসার ধরে, কিন্তু ধৈর্য হারাননি। শেষবার তাঁদের উত্তর কলকাতায় হোগলকুড়িয়ার বাড়িতে এসেছিলেন, ৮০-বছরের-ওপর-বয়স বৃদ্ধ বাবার সঙ্গে। আর ছিলো সেই পুরোনো গন্ড় ভৃত্য যে শেষ পর্যন্ত নতুন জ্যাঠাইমার সেবাশুশ্রূষা করে। নিজের চিকিৎসার ব্যবস্থা নিপুণ ছিলো, আশ্চর্য ধৈর্য ও সহ্য ক্ষমতা দেখেছি। বাবা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে করে, "চলো নতুন বউদিদিকে দেখে আসি।" সমস্ত শরীরটা চাদর দিয়ে ঢাকা, খালি মুখের ওপর একটা ছোট্ট মশারি, নিজেরই সেলাই করা। আমরা গিয়েছি জেনে বললেন, "ছোট ঠাকুরপো, এসেছো বসো", বলে মশারিটা সরিয়ে আস্তে আস্তে কথা বলেছিলেন—আমাদের সব খবর নিয়েছিলেন। নতুন জ্যাঠাবাবু মারা যাবার পর ঠাকুমা কান্নাকাটি করেন খুব, খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করে দেন। তখন সেজ জ্যাঠাবাবু ঠাকুমাকে বলেছিলেন শুনেছি, বাবার নাম করে, "তাহলে ওকে খেতে দেবো না।" বাবারা ওঁদের মাকে "তুই" বলে সম্বোধন করতেন। আমরা মা-বাবা দুজনকেই "আপনি" বলতুম। কিন্তু সম্পর্ক অত্যন্ত সহজ ছিলো। ঠাকুমা তাতে খেতে রাজি হন, কিন্তু রাঙা জ্যাঠাবাবুকে কলকাতা চলে আসতে হয়। রাঙা জ্যাঠাবাবু তখন মেদিনীপুরে, ওকালতিতে ভাল পসার জমিয়েছিলেন। নতুন জ্যাঠাবাবু খুব ভালোভাবেই ডাক্তারী পাস করেন। ভালো ডাক্তার হয়েছিলেন। স্বভাবটাও খুব সুন্দর ছিলো। অনেক ডাক্তার বন্ধুরাও আমাদের বাড়িতে আসতেন। রাঙা জ্যাঠাবাবু ও বাবা দুজনেই নতুন জ্যাঠাবাবুর কাছে ওষুধ বানাতে শিখেছিলেন। সিঁড়ির তলায় প্রকাণ্ড একটা আলমারি ছিল, সেখানে ছোট-বড়

পেস্‌ল-মরটার (হামানদিস্তা) ওজন করার যন্ত্রপাতি সব ছিলো। ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীও রাঙা জ্যাঠাবাবুকে ও বাবাকে, নতুন জ্যাঠাবাবু মারা যাবার পরও, সাহায্য করতেন, শেখাতেন। আমাদের বাড়িতে দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসার পরেও, বাবা অনেক ওষুধ নিজে করে দিয়েছেন—কিছু যন্ত্রপাতি এখনও আছে।

খুব অল্প বয়স থেকেই বাবার সঙ্গে আমার একটা বিশেষ সম্পর্ক ছিলো—নিজের মনে আমি তাকে "বন্ধুত্ব"ই বলি, যদিও, মা-ও জানি মাঝে মাঝে বাবাকে বলতেন বাবা আমাকে বেশী প্রশ্রয় দিচ্ছেন। বাবা খুব ধীর শান্ত লোক ছিলেন, খুব ধৈর্যও ছিলো, আমাদের কখনও বকেছেন বলে মনে পড়ে না, আমাদের কোনও অন্যায় ব্যবহার দেখলে হয়তো একটু আয়রনিক্যাল হতেন, একটু হাল্কা সুরে, ঠাট্টার মেজাজে কিন্তু খুব গম্ভীরভাবে কথা বলতেন। বিশেষ করে খাবার ফেললে এরকম বলতেন, যেমন একবার বলেছিলেন, "ও কি ফেলেছো—সিঙ্গাড়ার খোসা না বিচি ?" মা সিঙ্গাড়া বানিয়েছিলেন বাড়িতে। আমার ছোটভাই কেশব, মাধব বা আমার, প্রতিদিনের ঘটনাগুলি বেশ সহজভাবে বাবার কাছে সন্ধ্যাবেলায়, আপিস থেকে ফেরার পর শুয়ে শুয়ে গল্প করা নিয়মেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো। এ অভ্যাস ও সম্পর্কটা আমাদের সকলকেই খুব আনন্দ দিতো, বাবা নিজেও তাঁর দিনের ঘটনা আমাদের বলতেন। আরও ছোটবেলায় মনে আছে রাঙাজ্যাঠাবাবু ও বাবা, দুই ভাই পাশাপাশি শুয়ে থাকতেন—অল্প কথা হতো হয়তো—আমিও পাশে গিয়ে শুয়ে থাকতুম। সেই থেকেই হয়তো এই নিয়মটা আমাদের হলো। তারপর চা এবং একাধিক ভদ্রলোকের আসা, এবং আড্ডা। পটলডাঙার বাড়িতে চা খাওয়াও একটা পর্ব ছিলো—প্রকাণ্ড কেটলি—দুই হাতে অতি সাবধানে তুলে ধরে চা ঢালতুম, তার সঙ্গে প্রত্যেকের প্রয়োজনমতো দুধ-চিনি দিতুম. তার পরিবর্তে এক প্লেট চা খেতে পেতুম। এই চা করার পালা সকালে ছিলো, সেজন্য আমি খুব সকাল সকাল—৬টা নাগাদ উঠে পড়তুম, শোবার ঘর—দোতলা-থেকে নেমে আসতুম, রোজ।

বিকেলের আড্ডায় অনেকেই আসতেন.। জ্যাঠাবাবুকে সকলেই খুব শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। ভালোও বাসতেন। জ্যাঠাবাবু-বাবাদের বন্ধুদের চরিত্রে বেশ বিশেষত্বই ছিলো, প্রত্যেকেরই আলাদা ডিস্‌টিন্‌কটিভ পারসোনালিটি ছিলো। অনেকেই নামকরা, যেমন স্যার রাসবিহারী বা স্যার আশুতোষ। স্যার রাসবিহারী ঘোষ আমাদের অন্য জ্যাঠাবাবুদের সঙ্গে, যেমন বড়জ্যাঠা বা বাবাদের "ক্যাদ্‌দা"র সঙ্গে মদ্যপান করতেন, মনে নেই জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে খেতেন কিনা। বাবাদের "ক্যাদ্‌দা" জমিদার ছিলেন ময়মনসিং-এর, বেশ পয়সাওলা লোক নিশ্চয়ই—নাম বোধহয় ছিল কেদার ঘোষ, সবাই এখানে "ক্যাদ্‌দা" বলেই ডাকতেন, বছরে অনেকবারই কলকাতা আসতেন। ওঁর মদ্যপানে নেশা ছিলো, কিন্তু হলঘরে জ্যাঠাবাবু ঢুকলেই মদের গেলাসটা পেছনে সরিয়ে রাখতেন। আমরা সকলেই দেখতে পেতুম, আমার মনে হয় জ্যাঠাবাবুও দেখতে পেতেন, কিন্তু "যোগেশের সামনে খাওয়াটা তো উচিত নয়", তাই গেলাসটা পেছন দিকে সরাতে হতো। এক এক সময়ে এতো বেশি খেয়ে ফেলতেন যে বে-সামাল হয়ে যেতেন। ছোটবেলায় দেখেছি বলে কথাটা এখনও বেশ মনে আছে। খুব দামী কোঁচানো ধুতি ও গিলেকরা পাঞ্জাবি পরে আসতেন। পরে চোখটা খারাপ হয়েছিলো, খুব মোটা লেনসের চশমা পরতেন। প্রায় ৯০ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিলেন– ১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে আমাদের বিয়ের সময়ে এসেছিলেন। বাবা আমাকে বলেছিলেন আমাদের

বাড়ির খাওয়ানোর দিনে, "ক্যাদ্‌দাকে তুমি দেখো, মাছের কাঁটা বেছে দিও, যত্ন করে খাইও।"

বড়জ্যাঠা-বাবাদের আরেকজন বন্ধু ছিলেন—আমাদের নিজের লোকই হবেন। তাঁর নাম ছিল—মদন মিত্তির, কোন্নগরের জমিদার ; বোধহয় উকিল ছিলেন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন, বেশ ইনটারেসটিং লোক। দিদিমণিদের খুব ভালোবাসতেন—দিদিমণি হলেন 'মা' আর ছোট্‌দিমণি 'মাসি'। আমাদের ছোটদের খুব পছন্দ করতেন। নানারকম আজগুবি গপ্‌পো করতেন। তাঁরও একটু মদ্যপানে অভ্যেস ছিলো কিন্তু 'ক্যাদ্‌দা'র মতো নয়। বড়জ্যাঠা কত কী যে জানতেন—বিয়ে ইত্যাদির সব নিয়মকানুন, ন'জ্যাঠাইমা পর্যন্ত ওঁকে জিজ্ঞেস করে নিতেন—যদিও ন'জ্যাঠাইমা সবই জানতেন, তবু ভুল যেন না হয়। আমাদের পটলডাঙার বাড়িতে দুটো হেঁসেল ছিল—আঁষ-নিরামিষের জন্য, দুজন ঠাকুর ছিলো। যদি কখনও কেউ না আসতো বা অসুখ-বিসুখ করতো, বড়জ্যাঠা গামছা পরে সেই বিরাট হাঁড়ির ভাত চাপাতেন, নামাতেন, ফ্যান গালতেন। সব রান্নাবান্নার ব্যবস্থা হতো—কুটনো তো জ্যাঠাইমা-মায়েরাই কুটে দিতেন রোজ। পান সাজার পর্বও ছিলো বিরাট, নিখুঁত, বেশ খ্যাতিও ছিল। আরেকজন ছিলেন শরতজ্যাঠা। রং লালচে ফর্সা, সাদা চুল, ছোট ফ্রেন্‌চ কাট্‌ দাড়ি, খুব বাবু—শৌখীন লোক ছিলেন—তিনিও জমিদার, পদবী বোধহয় 'মিত্র' ছিলো। প্রায় রোজই কলেজ স্কোয়ারে আসতেন। নিয়মিত রোজ ৮ আউন্‌স ব্র্যানডি খেতেন—বেশীও নয়, কমও নয়।

একবার ক'দিন শরতজ্যাঠা আসেননি। আমাদের বাড়ির কাছেই তাঁর বাড়ি ছিল, মেছোবাজারের কাছে। বাবা এক সন্ধ্যায় আমাকে বললেন, "চল আমার সঙ্গে, শরতদা অনেকদিন আসেননি। দেখে আসি গিয়ে, অসুখ-বিসুখ করলো না কি!" আমি তাই বাবার সঙ্গে গেলুম। দোতলার ঘরে শরতজ্যাঠা, মোটা গদি, তার ওপর নরম তোশক পাতা ধবধবে ফর্সা বিছানায় শুয়ে আছেন। খুব জ্বর। জ্যাঠাইমা পাশে বসে স্পিরিট ল্যাম্‌পে প্যানে দুধ গরম করে গেলাসে ঢেলে দিচ্ছেন, সঙ্গে মেপে দু আউনস করে ব্র্যানডি। জ্বরে রং আরো লাল হয়ে উঠেছে। বাবা মৃদু আপত্তি করে বললেন, "শরতদা, ব্র্যানডিটা এতো জ্বরে খাওয়া কি উচিত?" শরতজ্যাঠা বললেন, "তাই তো তোমার বউদি গরম দুধে ঢেলে দিচ্ছেন—দুধের মধ্যে খাচ্ছি।" যেন তাতে দোষ কেটে গেলো। বাবা আর কিছু বলেননি। ক'দিনের মধ্যেই সেরে উঠে আবার নিয়মিত পটলডাঙায় যাতায়াত। শরতজ্যাঠার গলার স্বর নরম, কথা বলার ঢং খুব বিনীত ছিলো।

শরতজ্যাঠার বাড়িটা ছিল বড়। পিছন দিকে থাকতে দিয়েছিলেন আমাদের পরিবারের আরেকটি বিশেষ বন্ধু-পরিবারকে। তখন তাঁরা দুঃসময়ে পড়েছিলেন। চার ভাই ছিলেন—বড় হৃষীকেশ মুখার্জি, আমরা ডাকতুম গোঁদোদা বলে। পরে, ম্যানচেসটারে গিয়ে ভালো ট্রেনিং নিয়ে আসেন এবং খুব উচ্চপদস্থ অফিসার হয়েছিলেন—বোধহয় কাসট্‌মসে। পরের ভাই 'মনোদা'—মণিকুমার ছিলেন আইডিয়েল', এমন ভালো লোক কমই ছিলেন সেকালেও। পরের দুই ভাইও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁদেরই চেষ্টায় বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক হয়। ফেল করে, একেবারে

অন্য লোকের অন্যায়ে। এখনও, দেশপ্রিয় পার্কের দক্ষিণে তাঁদের প্রকাণ্ড বাড়ি আছে। মনোদার সকলের সঙ্গে, আমার সঙ্গে তো বটেই, খুব হৃদ্যতা ছিলো। বঙ্গবাসী কলেজে ইংরিজির অধ্যাপক হয়েছিলেন, অত্যন্ত ভালো ও পরিশ্রমী লোক ছিলেন, সকলকে সাহায্য করতে উৎসুক। শরতজ্যাঠার বাড়িটার যে অংশে মনোদারা থাকতেন—একতলায়, বেশ অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে, যেমন কলকাতার সেকালের পুরনো অনেক বাড়িই ছিল, উত্তর কলকাতায় এখনও নিশ্চয়ই কিছু আছে। প্রায়ই শুনতুম মনোদাকে বিছে কামড়েছে—আশ্চর্য, আর কারুকে কামড়াতো না, মনোদাকেই সব সময়ে কামড়াতো! বোধহয় বাড়ি পরিষ্কার করা, কোণাঘুঁজির মধ্যে ঢুকে ছোটখাটো কাজ করতেন, যা আর কেউ করতে বাজি হতো না। দরজার কোণা, খিল এইসব সাফ করতেন, যত বিছে ওঁকেই কামড়াতো। কিন্তু, তাতে মনোদার কিছু হতো বলে মনে হতো না—যেমন কাজ করতেন তেমনিই তো দেখতুম—ইংরিজিতে যাকে বলে আনডিটারড্। মনোদাকে বিছে কামড়ানটা আমরা শুনতুম একটা মজার খবর হিসেবে—মনোদাকে আবার বিছে কামড়েছে। বিছে কামড়ানোর টোটকাও বোধ হয় একটা জেনেছিলেন কারুর কাছ থেকে। জানি না সেটা কতখানি ব্যবহার করতেন। সহ্যশক্তি অসাধারণ, নির্লিপ্ত, সব সময়ে তো আমরা হাসিমুখই দেখেছি। মনোদা খুব ভালো ছাত্র ছিলেন। কিন্তু এক বন্ধুকে সাহায্য করতে গিয়ে পরীক্ষার হলে দুজনেই বিপদে পড়েন। কিন্তু, পরে যখন পরীক্ষা দেবার অনুমতি পান ফার্স্ট না সেকেণ্ড হয়েছিলেন। যেন বিছে কামড়ানোরই আরেক পর্ব। বালিগঞ্জ ব্যাঙ্ক থেকে কাঁকুলিয়া অঞ্চলটা ডেভেলপ করে অনেক ছোট ছোট বাড়ি করে বিক্রি করেন। স্যাঁতসেঁতে জলা জায়গাটার অনেক উন্নতি করেন—ওঁদের অনেক লাভও হয়েছিলো। এখন তো ওখানে লোকের বসতি খুব ঘন—খুব উন্নতি হয়েছে। ওঁরাই যতদূর মনে পড়ে কাজটা শুরু করেন।

জ্যাঠাবাবুর আরেকজন বন্ধু ছিলেন—খুব সম্ভ্রান্তঘরেরই নিশ্চয়—তাঁর চেহারা, রং, পোশাক, কথা বলার ধরন দেখে মনে হতো। রং খুব ফর্সা, ছোট ফ্রেন্চ কাট্ দাড়ি, এটাই বোধহয় তখনকার ফ্যাশন ছিলো, নাক খুব উঁচু তীক্ষ্ণ, চোখ উজ্জ্বল—কথা বলতেন শরতজ্যাঠার মতোই খুব আস্তে আস্তে, নরম গলায়। তাঁর পোশাকটা অন্যদের থেকে একটু তফাত ছিলো বলে তাঁকে বেশ মনে আছে। পরনে দামী কোঁচানো ধুতি, উপরে শার্ট—সামনেটা অনেকটা গোল স্টিফ্, সে সময়ে এরকম শার্টের খুব প্রচলন ছিলো বোধহয়। শীতকালে তার উপরে পরতেন কোট। খুব ভালো ইংরিজি বলতে পারতেন, মজলিসি লোক ছিলেন। আমাদের দেশের 'কালচার' বিষয়ে সাহেব-সুবোদের সঙ্গে খুব গপ্পো করতেন—এ বিষয়ে তখনকার কিছু কিছু সাহেবদের জানবার বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ ছিলো। সাহেবী আদবকায়দা রপ্ত ছিলো, সাহেবী পার্টিতে নেমন্তন্ন হতো, ইংরেজিতে গল্প করে মাতিয়ে হাসিয়ে রাখতে পারতেন। তাই তাঁর কদর খুব ছিলো। কিন্তু যতদূর মনে আছে বা জানি, ধুতি ছাড়া ট্রাউজারস পরনে দেখিনি। 'গপ্পে' লোক ছিলেন কিন্তু coarse কখনও হননি বোধহয়। ছেলেকে ভালো কাজে ঢুকিয়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু নিজের অতিরিক্ত খরচের বহরে বোধহয় শেষকালে আর্থিক অনটনে পড়েছিলেন। বাবারা বলতেন প্রিয়দা—কিন্তু, পদবীটা মনে নেই।

এঁরই মতো আরেকজনের কথা মনে পড়ে, ষষ্ঠীজ্যাঠা—সাহেবদের একান্ত ভক্ত। একেবারে পাগলের মতো বাবুগিরি করতেন—হাইকোর্টের বেস্ট জজদের সঙ্গে

যাতায়াত, দহরম-মহরম, খানাপিনা। তাঁরও জমিদারি ছিলো—শেষকালে বোধহয় কিছু ভাটা পড়েছিলো। তিনিও ফর্সা, লম্বা ছিলেন, গলাটা খুব জোর ছিলো। সাহেবরা কী ভাবতেন জানি না—সামনে খুব খাতির করতেন, কেই বা তা না করবেন—আড়ালে হাসতেন কিনা জানি না। কেউ যদি সাহেবদের বিষয়ে ওঁর সামনে বিরূপ মন্তব্য বা ক্রিটিসাইজ করতেন, অমনি ষষ্ঠীজ্যাঠা জোর গলায়, প্রায় চিৎকার করে ভারি গলায় তক্ষুনি আপত্তি জানাতেন—"না-হে-না—তোমরা কী যে বলো, সাহেবরা কক্ষনো ওরকম করে না, বা বলে না! চীফ জাস্‌টিস কী বলেন জানো? র‍্যান্‌কিন (আরেকজন মস্ত জজ) কি বলেছিলেন?" ইত্যাদি। সাহেবদের এরকম ভক্ত-চ্যামপিয়ন কমই দেখেছি। "ক্যাদ্‌দা"ও কিছুটা এরকম ছিলেন। আমরা খুব মজা পেতুম এঁদের কথা শুনে, কিন্তু রাঙাজ্যাঠাবাবু আর বাবা খুব বেজার হতেন। সাহেবী পোশাকে দেখেছি বলে মনে নেই কিন্তু এরকম সাহেবভক্ত গভবনরস হাউসে বা বড় বড় জজেদের বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে নিশ্চয় বিদেশী পোষাক পরতেন। আমাদের বাড়িতে আসতেন দামী ধুতি ও শার্ট বা পাঞ্জাবি পরে।

বাবার ছোটবেলার কথায় আবার ফিরে যাই—যা ওঁর কাছে শুনেছিলুম। আমাদের বাড়ির সকলেই কাছের স্কুলে হেয়ার বা হিন্দুতে পড়তেন। বাবা পড়েছিলেন হেয়ার স্কুলে। তখন ওঁর সহপাঠী ছিলেন সুধীন ঠাকুর (দ্বিজেন ঠাকুরের এক ছেলে), সুরেন ঠাকুর (সত্যেন ঠাকুরের ছেলে)। বলেন ঠাকুরও—(আরেক ভাই বীরেন ঠাকুরের ছেলে) পড়তেন, বাবা বলেছিলেন, কিন্তু তিনি বেশি কথা বলতেন না কারুরই সঙ্গে প্রায়। ওঁর কাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওঁকে খুব ভালোবাসতেন, বলতেন ও সাহিত্যিক হবে—তাই গর্ব। লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, একটু খুঁড়িয়ে চলতেন, 'বায়রনের' মতো। কিন্তু অল্প বয়সেই মারা যান। সুধীন ঠাকুর ও সুরেন ঠাকুরের সঙ্গে বাবার সম্পর্ক পরেও ছিলো, কারণ তাঁরাও বাবার মতো অ্যাটরনি হন। আমরা যখন পি-২৪১ডি রাসবিহারী অ্যাভেনিউ-এর বাড়িতে (এখন সে রাস্তার নাম হয়েছে দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্‌ট) ছিলুম ১৯৩৫-১৯৩৮ পর্যন্ত, তখন একদিন সুরেন ঠাকুর এসেছিলেন বাবার কাছে। পটলডাঙার বাড়িতে, বাবা গপ্পো করেছেন জ্যোতি ঠাকুর ভোরে ঘোড়া চেপে আসতেন। মজার পোশাক—পায়জামার ওপর দিয়ে খানিকটা কাপড় কোঁচা বানিয়ে গোঁজা—কারণ পায়জামাটা তো আমাদের দেশীয় পোশাক নয়, কিন্তু ধুতি পরে ঘোড়া চড়া বা অন্য কঠিন একসারসাইজের কাজ করা সহজ নয়, তাই পায়জামাটাকেই খানিকটা ধুতির সঙ্গে মিলিয়ে দেশীয় পোশাক করতে হবে! তাঁর স্ত্রীকেও ঘোড়া চাপিয়ে আনতেন, সাইড স্যাড্‌লে—মেয়েদেরও তো স্বাবলম্বী হতে হবে। আমাদের বাড়ি হয়ে গড়ের মাঠ—তারপর ফেরত জোড়াসাঁকো।

জ্যাঠাবাবু ও রাঙাজ্যাঠাবাবুর গাড়ির জন্য ঘোড়া ছিলো—মাঝে মাঝে সঈস আস্তাবল থেকে বাড়িতে আনতো, রাঙাজ্যাঠাবাবু হাতে দানা নিয়ে খাওয়াতেন। ঘোড়াটা দেখতে খুব ভালো, কিন্তু চোখগুলো দেখতে আমার ভয় করতো। জ্যাঠাবাবুর ঘোড়াটা ছিলো রোগা কিন্তু উঁচু। দাদামশায়ের বাড়ি ছিলো হ্যারিসন রোডে—বাবাকে রোজ দেখা করতে যেতে হতো, খুব ভালোবাসতেন। একদিন আমি ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, দেখি একটা ঘোড়া পাগলের মতো হ্যারিসন রোড দিয়ে ছুটছে। ঠিক সেই সময়ে বাবা দাদামশায়ের বাড়ির ফটকের কাছে এসে পৌঁছন, ঘোড়াটা ওঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়, বাবা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আমার খুব ভয় হয়েছিলো। তখন

থেকেই মনে ঘোড়া বিষয়ে ভয়-মিশ্রিত আকর্ষণ ছিলো। মায়ের কাছে ছেলেবেলায় বাংলা আর অঙ্ক শিখেছিলুম, একটু বড় হয়ে বাবার কাছেই পড়তুম। খানিকটা ইংরিজি শিখবার পর বাবা আমাকে রয়াল রীডার কিনে দেন, তার প্রথম লাইনটা খুব মনে আছে—দ্য হর্স ইজ এ নোবল অ্যানিম্যাল—নোবল কথাটার কত মানে হয় বুঝলুম একটু। ইংরিজি ভাষায় বৈচিত্র্য ও গভীরতা তখনই আমার খানিকটা উপলব্ধি হয়। ভয় অবশ্য আমার আরো কোনো কোনো জিনিষে—যেমন জলে। মিত্র স্কুলে পড়বার সময়ে, সম্ভবত ১৯১৯-এ কলকাতায় খুব বৃষ্টি হয়, রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়। মা আমাকে স্কুল থেকে আনবার জন্য আমাদের বাড়ির কাজের লোক বিশ্বনাথকে পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বনাথ স্কুলে এসে আমায় বলল, "বাবু আমার কাঁধে চাপো।" আমার তখন দশ বছর বয়স, খুব পৌরুষে লেগেছিল। আমি বললুম 'আমি হেঁটেই যেতে পারব।' কিন্তু এত জল—যেই নেমেছি অমনি পড়ে তলিয়ে গেলুম—মাথা প্রায় নীচের দিকে—ডুবে গেলুম প্রায়—বিশ্বনাথই টেনে তুললো। সেই থেকে আমার খুব জলে ভয়। শেলীর ডেথ বাই ড্রাউনিং নয়, জলে পড়ে যাচ্ছি ভাবলেই মনে হয় হার্ট ফেল করবো। আমি সেইজন্য কখনো পুরীর সমুদ্রেও চান করিনি, যদিও ছোটবেলা থেকে বহুবার পুরী গেছি—পুরী ভালোও লাগে।

বাবার নানা ধরনেব যত্নের কথা মনে হয়—যেমন আমার বাড়ন্ত বয়সেই আমি একটু কুঁজো হয়ে চলতে আরম্ভ করি। বাবা নিজে ছ'ফুট লম্ব ছিলেন, রোগা হলেও শিরদাঁড়া সোজা, একদম স্ট্রেট। আব বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেলেই বাবা আমাকে বলতেন—'উঁহু, উঁহু কুঁজো হয়ে যাচ্ছো, সোজা হয়ে হাটো—শিরদাড়া সোজা রাখো।'

আমার খুব রাগ হতো, কিন্তু কিছু বলতে পারতুম না। এতো সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও কুঁজো হয়ে গেলুম কি করে জানি না। আরেকবার, আমার খুব একটা কোমরে ব্যথা হয়েছিলো, সায়াটিকা না লামবাগো জানি না ঠিক—তখন বি· এ· পড়তে আরম্ভ করেছি। খুব কষ্ট পেয়েছিলুম কদিন মনে আছে। অনেকে অনেক রকম ওষুধ ও সারাবার প্রক্রিয়া বলে দেন। মিসেস মিলফোর্ড বলেন তোয়ালে গরম জলে ডুবিয়ে নিংড়ে তার উপর গরম ইস্ত্রি চালিযে দিলে ব্যথা কমে। কি করে সাবলে মনে নেই—যে যা বলেছেন মা-বাবা সব কিছুই করেছেন ও ডাক্তার বন্ধুদের সাহায্যেই সেরেছি। কিন্তু যাতে আর না হয়, বা হয়তো কোনো ডাক্তার-বন্ধু বাবাকে বলেন, একটা হাইব্যাক চেয়ার করে দিতে। সেজনা বাবা আমার জন্য একটা স্পেশ্যাল চেয়ার বৌবাজারের 'প্রবর্তক ফার্নিশাস;' দোকান থেকে ১৬ বা ১৭ টাকা দিয়ে কিনে দিয়েছিলেন। এখনও সেই চেয়ারটাই আমার পক্ষে সবচেয়ে আরামদায়ক।

পুজোর ছুটিতে কোর্ট বন্ধ থাকতো সেজন্য আমরা প্রতি বছরই দেওঘরে যেতুম। বাবা-মা দুজনেই মহারাজ বালানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য ছিলেন। আমাদের বাসনকোসন বিছানাপত্র সবকিছু যেতো—মায়ের বাসনের যে একটা সিন্দুক যে সে একটা বিরাট ব্যাপার! আমাদের সঙ্গে আবার একটা বক্স হারমোনিয়ম যেতো। জামাইবাবু, (শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ মিত্র)। ভালো গান গাইতেন; জুডিশিয়ারী সার্ভিসে ছিলেন—কাজেই কোর্ট ছুটি হলে যেতে পারতেন। ভালো গান গাইতেন। মহারাজকেও শোনানো হতো।

মহারাজ রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে পছন্দ করতেন। এসব লাগেজ যেতো অনেক আগে ঠেলা গাড়ি করে, আমাদের ঠাকুর বা বিশ্বাসী লোক সঙ্গে যেতো হাওড়া স্টেশনে। তবু তো আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্তর কাছাকাছিও হতো না। একবার শুনেছিলুম ৭৫টা মাল যাচ্ছে ওঁদের সঙ্গে। গিরীন্দ্রশেখর বসুরও ঐরকম মাল যেতো—এমনকি বসে চান করার জলচৌকিটা পর্যন্ত। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার বা পার্সেলস এক্সপ্রেস এরকম স্লো ট্রেনেই যেতুম। শেষের দিকে বাবা খুব বেজার হয়ে উঠতেন—আমার খুব অবাক লাগতো—ট্রেনে তো যতক্ষণ থাকা যায় ততই মজা—একবার বাবাকে জিজ্ঞেসও করেছিলুম, "আপনার ট্রেনে যেতে ভালো লাগে না?" এখন অবশ্য বুঝতে পারি নিজেরও বেজার লাগে, কষ্টও হয়। তখন দেওঘর অনেক ফাঁকা ও সুন্দর ছিলো। করণিবাগ (?) আশ্রমের কাছে একটা সুন্দব শালবন ছিলো। আশ্রম থেকেই আমাদের বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হতো, প্রায়ই দেওঘর স্টেশনে গাডিব ব্যবস্থাও থাকতো, স্টেশনে বিশেষ কিছু পাওয়া যেতো না। একবার গাড়ি পাওয়া যায়নি বলে গরুব গাডি করে মা-বাবা মালপত্র নিয়ে বওনা হলেন। আমি বললুম, আমি হেঁটেই যাব। ভোরবেলা নানা রকমের গাছ পাতা ও ফুলের গন্ধে মাঠের মধ্যে দিয়ে যেতে খুব ভালো লেগেছিলো। অনেক আগেই পৌঁছে গিয়ে বাড়ির রোয়াকে বসেছিলুম। অনেক দেরিতে মা-বাবারা পৌঁছুলেন। একবার খুব ওয়ার্ডসওয়ার্থিয়ান মেজাজে প্রকৃতির সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ করবো ঠিক করি—শালবনে পায়খানা কবা যায় কিনা 'এক্সপেরিমেন্ট' করতে গিয়েছিলুম—সুবিধে হয়নি। নিজেরই লজ্জা করলো—তাছাড়া বড্ড হাওয়া।

মহারাজ বালানন্দস্বামী ব্রহ্মচারী আমাকে খুব ভালোবাসতেন—পাশে ডেকে বসাতেন, যদিও অনেকের বিষয়ে ওঁর বিচার ছিলো। মারাঠি ব্রাহ্মণ, ইমপ্রেসিভ চেহারা, চোখ বড় বড়, দারুণ পার্সন্যালিটি, গায়েব রং ফর্সা, গায়ে মাছি পিছলে যায়—যদিও তেল কখনও মাখতেন না। গলায় দারুণ জোব ছিলো। ন'বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়ে যান, ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। আমরা অনেক গল্প শুনেছি ওঁর নিজের মুখেই। শেষকালে দেওঘরে তপোবনে তপস্যা কবতে বসেন। মহারাজের পরে ছিলেন সাধু পূর্ণানন্দ স্বামী। তিনি নেপাল থেকে খুব জাঁকালো দেবীমূর্তি এনেছিলেন। মহারাজের মা সারা ভাবত ঘুরে ঘুরে নিজেব ছেলেকে খুঁজে বেডিয়েছিলেন। বৃদ্ধ বযসে তপোবনে এসে ছেলেব দেখা পান। কিন্তু মহাবাজ মাকে চিনতে পেরেও মানেননি। সাধকদের মানতে হয় না, শুনেছি। কিন্তু নর্মদাবাঈ, মহারাজের মা, নিজের বুক খুলে বলেন, 'আমার এখানে বলছে—তুমি আমার ছেলে।' তখন মহারাজ মানতে বাধ্য হন। পরে নর্মদাবাঈ ওখানেই দেহরক্ষা করেন। একটা মন্দির করে দিয়েছেন মহারাজের শিষ্যরা। আমার মায়ের রাম-মামা ছিলেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট—বোধহয ব্যারাকপুরেই—এ গল্প অনেকবার আমবা শুনেছি। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাগানে গাছতলায় এক সাধু গিয়ে বসেছিলেন। সাহেব আর্দালিকে হুকুম দেন, 'উসকো নিকালো।' তখন সাধু উঠে গেলেন, সাধুদের তো ঐ নিয়ম ছিলো। শুধু বোধহয় একবার ফিরে তাকিয়েছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কী মনে হলো, আর্দালিকে আবার বললেন, 'উসকো আনে বোলো'। সাধুদের তো কখনও রাগ বা অভিমান করতে নেই—তাই ফিরে এলেন। তারপর কথাবার্তা এবং একেবারে সাহেবের চরিত্র বদল—তারপরে দেওঘরে রামনিবাস আশ্রম। মহারাজ আগে প্রায়ই তপোবনে

থাকতেন নিজের তপস্যার বা ধ্যানের জন্য। মায়ের খুব গর্ব ছিলো, মহারাজ আমাকে খুব ভালোবাসতেন বলে। আমার নাম উচ্চারণ করতেন সংস্কৃত 'বিষ্ণু' (Vishnu)। মাকে বলতেন, আমার মাথা টিপে টিপে, মাঈ তোমার ছেলের মাথার গড়ন খুব ভালো।' মায়ের যা অহঙ্কার হতো—চোখেমুখে খুশী স্পষ্ট হয়ে উঠতো। ছেলেবেলায় আমার বুঝি একবার হাঁপানী হয়েছিলো। মহারাজ খবর পেয়ে খামে করে একটা ওষুধ পাঠিয়ে দেন, তাতে আমি সেরে যাই। মা সেবার পুজোর ছুটিতে আমার মামাদের যাঁদের হাঁপানী ছিলো, তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলেন—মহারাজের কাছে ওষুধ চেয়েছিলেন তাঁদের জন্য। কিন্তু মহারাজ দেননি—'আমি তো ডাক্তার নই'—বলেছিলেন। তপোবনে অনেক সময় থাকতেন। দেওঘরে একটু ভীড় হলেই পালিয়ে যেতেন। কাঠার খড়ম পায় খুব উঁচু, কি অসম্ভব হাঁটতেন, আমরা দৌড়ে ওঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারতুম না। বিকেল বেলায় ডালের মণ্ডা দিতেন হায়নাদের—প্রচণ্ড জোর গলায় আঃ আঃ করে ডাকতেন আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। মা-বাবা নিয়মিত মহারাজের সঙ্গে তপোবনে দেখা করতে যেতেন, মাঝে মাঝে আমাদের নিয়ে যেতেন। কিন্তু মহারাজ সন্ধ্যের আগেই চলে আসতে আদেশ দিতেন। একবার মনে পড়ে, আমার তখন ৯/১০ বছর বয়স হবে, আমায় নিয়ে যাননি। আমি গরুর গাড়ির পেছনে অনেকটা পথ ছুটেছিলুম। বাবা বললেন, 'কেন এসেছ'? আমি বললুম, 'আপনারা কখন ফিরবেন জানতে এলুম।' মা প্রায় কেঁদেই ফেললেন, ফলে আমায় তুলে নিতে হলো। মহারাজ খুব খুশী হয়েছিলেন—আমি তো অবশ্যই—সেটাই তো আমার মতলব ছিলো। মহারাজের কথার গভীরতা সব সময়ে আমরা কেন বড়রাও বুঝতে পারতেন না। আমার বড় পিসতুতো দাদা "নিবুদা" (ললিতমোহন ঘোষ) খুব ভুগছিলেন অনেকদিন ধরে। ওঁর ছেলে গোবিন্দ আমার সমবয়সী এবং আমার বিশেষ বন্ধু, সেও মহারাজের আশীর্বাদ পেয়েছিলো। ওকেও খুব ভালোবাসতেন, শিষ্যও ছিলো। গোবিন্দ সেবার জিজ্ঞেস করেছিলো মহারাজকে—"বাবা কি করে সারবেন।" মহারাজ বলেছিলেন, 'এবারে ও শান্তি পাবে।' গোবিন্দ ভুল বুঝেছিল, ভেবেছিল এবারে অসুখটা কমবে। নেহাৎই ছেলে মানুষ, অল্প বয়স ছিলো। তার কিছুদিন পরেই নিবুদা মারা যান। গোবিন্দ এটা একেবারেই ভাবতে পারেনি—কেঁদে মহারাজের কাছে গিয়েছিলো। মহারাজ বলেছিলেন, 'ললিতের তো এতেই শান্তি—আর কোনোভাবে ওকে তোমরা আরাম দিতে পারতে না।'

বাবার পড়াশোনার কথাই আবার বলি। বাবা প্রেসিডেন্সীতে বি· এ পাস করে এম এ· পড়ছিলেন। তখন প্রেসিডেন্সীতে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস হতো,—অনেক সাহেব প্রফেসর ছিলেন। বাবার ইংরিজি উচ্চারণ খুব ভালো ছিলো। উচ্চারণ নিয়েও বাবার সঙ্গে আমার খুব তর্ক হতো,—বাবারই উচ্চারণ ঠিক, তবু আমি হার মানতুম না। যেমন একবার আমি 'সাবার্ব'-কে 'সুবুর্ব' বলেছিলুম। বাবা আমাকে ইংরিজি উচ্চারণটা বলেন। আমি গম্ভীর ভাবে বলেছিলুম, মনে পড়ে, "আমি তো ল্যাটিন উচ্চারণ করেছিলুম।" বাবাও গম্ভীর ভাবে বললেন : (আমার বিদ্যাবুদ্ধির বিষয়ে ওঁর সম্পূর্ণ জ্ঞানই ছিল!) "আমি তো তোমার মত ল্যাটিন জানি না, আমি ইংরিজি উচ্চারণটা জানি।" বাবার সঙ্গে আমার আরেকটা মজার রসিকতা ছিলো—সেটা বোধহয় শুরু হয় যখন আমি আই· এ· পরীক্ষায় একটা লজিক পেপার দিতে পারিনি, তৈরিও হয়নি, ভালোও লাগতো না—ডিডাকটিভ লজিক। বাবা তাই বারবার তাগাদা

দিতেন—লজিকটা পড় । আমি একদিন সকালে নীচে পড়ার ঘরে টেবিলের উপর পা দুটি তুলে দিব্যি বসে আছি, হঠাৎ বাবা এসে বললেন, "কই, তুমি পড়ছ না যে !" আমি তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়েছিলুম—"খালি পড়লে তো আর হয় না ! চিন্তাও করতে হয় ।" বাবা 'ও' ছাড়া কিছু বললেন না । কিন্তু যখনই দেখতেন আমি ও রকম আরাম করে টেবিলে বসে আছি, বাবা বলতেন, "তুমি 'চিন্তা' করছ বুঝি !" বাবার সঙ্গে সম্পর্কটা এই রকমই ছিলো । তাই বোধহয় মা ঠিকই বলতেন, বাবা আমাকে বেশী প্রশ্রয় দেন । এম· এ· পড়বার সময়ে বাবার টাইফয়েড হয়—কাজেই এম· এ· পড়া ছেড়ে দিয়ে এটর্নির আপিসে আরটিকলড হলেন—ও সি গাঙ্গোলীর (Gangolee—বানান ছিল) আপিসে । পাস করে সেই আপিসেই কিছুকাল কাজ করেন । এটর্নিশিপ যখন পড়ছিলেন, তখনই গোপাল দাস ক্ষত্রিয়র (পুরো সংস্কৃত উচ্চারণ করতেন ওঁরা নিজেদের পদবীটা ক + ষ—দুটোই পুরো উচ্চারণ করতেন—সুন্দর শোনাতো) সঙ্গে আলাপ হয় । পরে ওরা দুজনে 'দে এ্যান্ড ক্ষত্রিয়' নামে আপিসে গেলেন । দুজনেই রোগা লম্বা ফর্সা, কম কথা বলতেন । দুজনের স্বভাবও প্রায় এক রকমের ছিলো—বাবার বাঙালী মক্কেল, গোপালবাবুর অন্য প্রদেশীয় । প্রথমে আপিসটা হেস্টিংস স্ট্রীটে ছিল, পরে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে উঠে যায় । গোপালবাবুরা ছিলেন মীরাটের গোঁড়া ব্রাহ্মণ । মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে দেওঘরে গিয়েছেন । স্বপাক রাঁধতেন, একেবারে নিরামিষাশী—মা তরকারি কুটে সব যোগাড় করে দিতেন, নিজে রাঁধতেন । কলকাতাতেও মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়ি থেকে আমাদের জন্য খাবার আসতো, বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা লুচি তরকারি, সে কি দারুণ স্বাদ । আমরা প্রায়ই দেওঘরে আশ্রমের কাছে বাড়ি ভাড়া পেতুম—মহারাজের নির্দেশে । তবে, একবার মনে আছে 'কারস্টেয়ার্স টাউনে'—"সান্ত্বনা কুটিরে" ছিলুম—প্রণতির ঠাকুরদা । দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরীর একটি বাড়ি সেবার বাবা ভাড়া করেছিলেন । দেবীবাবুর দেওঘরে চারটে বাড়ী ছিল—প্রভাত কুটির (প্রণতির বাবার নামে) সান্ত্বনা কুটির (প্রণতির পিসিমার নামে), বিশ্রাম কুটির ও প্রণতি কুটির । ১৯৩৯-এ পুজোর সময়ে এই দুটো বাড়িতে আমরা ছিলুম—আমাদের সঙ্গে সেবার চঞ্চল, দেবী (কামাক্ষীর ভাই), আইয়ুব, প্রজ্ঞান (সুনুবাবু-প্রণতির ছোট ভাই) ও আর একটি বন্ধু । তখন মহারাজ বালানন্দ স্বামী দেহরক্ষা করেছেন—আমরা একদিন মোহনানন্দ স্বামীর সঙ্গে আশ্রমে দেখা করতে গিয়েছিলুম । আর, আইয়ুব তপোবন দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন—কি দৃশ্য ! কিন্তু তখনই কি অল্প খেতেন । আমরা ওঁর সঙ্গে খেতে বসলে মনে হতো রাক্ষসের পরিমাণে খাচ্ছি—নিজেদেরই লজ্জা করতো । সুনুবাবু সে সব বাড়ী বিক্রি করে দিয়েছে—আমাদের কারুকে না জানিয়ে । হয়তো প্রণতি কুটিরটা আমরা রাখতে পারতুম । 'সান্ত্বনা কুটিরে' থাকতে আমাদের খুব চুরি হয়েছিল—আমার মনে নেই—আমি তখন খুব ছোট ছিলুম । অনেক বছরই 'মিত্রালয়ে' থেকেছি—ছোটদিমণির শ্বশুরমশাই—উপেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়ীতে । ওঁরও তিনটে বাড়ি ছিল—একটা দোতলা, বাকি দুটো একতলা । একবার আমার দেওঘরে অসুখ হয়েছিলো, মা-কে আমার জন্য থেকে যেতে হয়েছিলো, বাবা একা কলকাতা ফিরে এসেছিলেন, আপিস খুলে গিয়েছিলো । আমি সেরে গেলে, বাবা, আমাদের গিয়ে নিয়ে আসেন । সে সময়ে, মনে আছে, উপেনবাবু রোজ সন্ধ্যায় আমাকে গ্রহ-নক্ষত্র চেনাতেন । দেওঘরে তখন আকাশ আশ্চর্য পরিষ্কার ছিলো । কলকারখানা হয়ে এখনকার মতো হয়নি, ধোঁয়াটে নোংরা

দেখাতো না। সে হিসেবে রিখিয়ার আকাশ এখনও কি পরিষ্কার—দেখতে ভাল লাগে—যতদূর চোখ চলে যায়, কোন বাধা নেই—কানেরও কি আরাম। দেওঘরে ছুটিতে আমাদের কাছে অনেকেই যেতেন—জ্যাঠাবাবু—আমাদের সকলের খুব ভালো লাগতো, কারণ আমাদের সকলকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন সকাল, বিকেল—রাঙা জ্যাঠাবাবু, একবার 'ন'জ্যাঠাবাবু গিয়েছিলেন। রাঙাদাদাও অনেকবার গিয়েছে। আরো অনেকেই হঠাৎ গিয়ে হাজির হতেন। একবার খুব মজার ঘটনা ঘটেছিলো, মনে আছে। ন'জ্যাঠাবাবুর সঙ্গে দাদা ও আমি শুতুম, একটা ঘরে। বেশ রাত্রে চোর এসেছিলো। ন'জ্যাঠাবাবু টের পেয়েছিলেন, ভয়ও হয়েছিলো। আমাদের তো বটেই। কিন্তু উপস্থিত বুদ্ধি হারাননি। আমরা দেখেছি উনি ভয়ে কাঁপছেন, কিন্তু জোর গলায় বললেন—'কেষ্ট (আমার দাদার নাম)—আমার বন্দুকটা দে তো!" চোরটা পালিয়ে গেলো, আমরা টের পেলুম। গোবিন্দ আমার পিসতুতো ভাইপো, আমার খুব বন্ধু ও সমবয়সী, একবার দেওঘরে রাত দুটো—এ রকম সময়ে একটা বীভৎস মুখ দেখেছিলো জানলায়—অনেক বছর, রাত্রে ও ঘুমোতে পারেনি—খুব শরীর খারাপ হয়ে গিয়েছিলো সেজন্য। এখন ভাবতে মজা লাগে বঠঠাকুরদা একবার শরীর খারাপের পর হাওয়া বদল করতে বর্ধমান গিয়েছিলেন—তখন রেল লাইন বর্ধমান পর্যন্ত হয়েছিলো। পরে আরেক বার মুঙ্গের গিয়েছিলেন, তখন মুঙ্গের পর্যন্ত ট্রেন চলতো।

এমনিতে বাবা যেমন ধীর স্থির সাবধানী মানুষটি ছিলেন, তেমনি খুব গোছানো স্বভাব ছিলো। মায়েরও। ধোপাবাড়ি থেকে জামাকাপড় আসলে, নতুন কাচা কাপড়গুলি নীচে রেখে আগেরগুলি উপরে তুলে দিতেন—আলমারি গুছিয়ে রাখতেন ফলে বাবার জামাকাপড় অসম্ভব টিকতো। জুতোও উল্টেপাল্টে পরতেন ফলে জুতোও ছিঁড়তো কম। নিজেই বেজার হয়ে বলতেন—"ভোগালে, এ জোড়া যে ছিঁড়ছেই না!" আমিও বাবার থান ধুতি পরতে ভালবাসতুম, চাইতুম—বাবা দিতেনও—মা আপত্তি করতেন—বাবার জীবিত কালে থানধুতি ছেলের পরা নিয়ম নয়। রাঙা জ্যাঠাবাবু অত সাবধানী ছিলেন না—এক এক সময়ে কেস করে, আলিপুর থেকে ১০,০০০-১৫,০০০ টাকা পেলেও, খোলাটানায় ফেলে রাখতেন সন্ধ্যাবেলায় আমি দেখেছি। আমার বেশ লোভ হতো, বই কিনতে ইচ্ছা হতো—চক্রবর্তী-চ্যাটার্জী বা লাহিড়ীদের দোকান থেকে। বাবাকে বলেও ছিলুম রাঙা জ্যাঠাবাবুর অসাবধানতার কথা—বাবা রাঙা জ্যাঠাবাবুকে বলেন, বিকেলে আপিস থেকে ফিরে টাকা ঠিক করে রাখতে। একবার দাদার একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিলো, টেবিলের উপর ফেলে রেখেছিলো। বাবা, আমার মনে আছে, দাদাকে বলেছিলেন—"তোমারই দোষ, কেন বাইরে ফেলে, গরীব লোককে টেম্পট করেছো?" বাবার চরিত্রের জন্যই আমরা বোধহয় খানিকটা গোছানো ও সাবধানী হতে শিখেছি। মায়ের নানা রকম অসুখ হয়—একটা টিউমারও হয়েছিলো। নতুন জামাইবাবু (নরেন্দ্রকুমার বসু) ওঁদের দেশের কৃষ্ণনগরের লোক—এক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার অশ্বিনীকুমার ভট্টাচার্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। মা বেশী কড়া ওষুধ সহ্য করতে পারতেন না (তাও এখনকার অ্যান্টি বায়োটিক তো নয়!) তাই হোমিওপ্যাথিক করতেন। অশ্বিনীবাবু বসতেন লাহিড়ী কোম্পানীতে, ওষুধের প্রকাণ্ড দোকান, মেডিকেল কলেজের ঠিক সামনে। একটু খুঁড়িয়ে চলতেন, পুজোআর্চা করতেন, মাথায় টিকি ছিল। আমাকে পছন্দ করতেন। বাবা-মাকে বলেছিলেন, 'ওকে পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে, আমি ওকে ওষুধ দিতে শিখিয়ে দোবো।' আমিও গিয়েছিলুম এবং সেই

থেকে একটু আধটু ওষুধ দিতেও শিখেছিলুম। মা তো আমাকে বাড়িতে নিয়মিত ছোটোখাটো ব্যাপারে ওষুধ দিতে বলতেন। অশ্বিনীবাবু খুব ভালো হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন, মানুষটিও খুব ভালো। বাবা অ্যাটর্নী ছিলেন কিন্তু অত্যন্ত ভালোমানুষ ছিলেন—কখনও জোরে কথা বলতেন না। ফলে ওঁকে অনেক কষ্ট পেতে হয়েছে। ন্যায্য fees বা খরচা অনেক মক্কেলই দেননি, এমন কী অনেক সময়ে মক্কেলের কোর্টের খরচা পর্যন্ত নিজের পকেট থেকে দিতে হয়েছে। আমি অনেক সময়ে দেখেছি বাবা কাজ করে দিয়েছেন, আপিসের বিল হয়েছে হাজার টাকা, বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলেছেন—অর্থবান মক্কেল—হীরের আংটি বোতাম—'আপনি আমার বাবার মতো, ৩০০ টাকার বেশী দিতে পারবো না।' কেস করাবার আগে কথাটি মনে পড়ত না। বাবা আপত্তি করতেন—"আপিসের খরচই হচ্ছে না," বললেও, শুনতেন না। বাবার পক্ষে জোর করা বা রাগারাগি করে আদায় করা অসম্ভব ছিলো। ফলে গোপালবাবু, বাবার পার্টনার যখন আপিস ছেড়ে দিলেন, বাবা খুব অসুবিধেয় পড়েছিলেন এবং আর্থিক ক্ষতিও হয়েছিলো। গোপালবাবুর বড়োবাজারে দুটো বাড়ি ছিল। আর ওঁর মেজ ছেলে পান্নালাল এলাহাবাদে উকিল হয়ে চলে গেলেন, বড় ছেলে হীরালাল কী করে জানি, হারিয়ে গেলেন। ছোট ছেলেটি কলকাতায় ডাক্তার হয়েছিলেন। তাই গোপালবাবু আপিস ছেড়ে দিলেন। আমি বাবার একটা ছোট্ট ডায়েরী পেয়েছিলুম, এক বছরের—তার মধ্যে অনেক কিছুই লেখা আছে—যেমন জন্ম তারিখ সব, স্কুল পরীক্ষাগুলিতে আমার ভাই কেশব কত নম্বর পেয়েছে। পরের বার কীরকম উন্নতি করেছে। বা ওষুধের প্রেসক্রিপশান, বাবার নিজের কী কী অসুখ করেছিল, কবে এবং কী করে সারল নানা কথা। তার সঙ্গে তাঁর উপার্জনের কথাও আছে—যেমন একবার লিখেছেন একটা মামলায় কত হাজার টাকা পেয়েছেন, এক জায়গায় লেখা আছে ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ৬০,০০০ টাকা। আবার লেখা আছে কাকে কাকে কত ধার দিয়েছেন। তাঁরা সে টাকা শোধ করেছেন কিনা লেখা নেই। বাবা হয়তো চাইতেও পারেননি। শেষ পর্যন্ত আদায় হয়েছে কিনা বোঝবার উপায় নেই। একটা কেসের গল্প নিজেই আমাদের কাছে করেছিলেন। একজন খুব নামকরা ভদ্রলোক তাঁর বিধবা বৌদিদিকে তাঁর প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টায় উইল জাল করে বাবার কাছে এসে বলেছিলেন, 'অবিনাশবাবু, আপনি এই কেসটা করবেন?' আমি বুঝতে পারি এখন খুবই অস্বাভাবিক কেস তো—বিধবা স্ত্রীকে না দিয়ে অর্থবান ভাইকে সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া—কিন্তু অবিনাশবাবু এতো ভালো লোক—তিনি যদি কেসটি প্রেজেন্ট করেন এমন কি জজরাও ভাববেন 'জেনুইন কেস'। বাবা শুনে বলেছিলেন, "ও কাজটা কি আপনি ঠিক করছেন? আপনার বৌদিদিকে ঠকানোটা অন্যায় হচ্ছে না?" ভদ্রলোক বাবাকে রুক্ষ মেজাজে বলেন, "অবিনাশবাবু, আপনার কাছে আমি মরাল ইনস্ট্রাকশান (moral instruction) চাইতে আসিনি—আপনি কেসটা নেবেন কিনা বলুন। যদি জিতিয়ে দিতে পারেন, অনেক টাকা পাবেন।" বাবা স্বভাবতই কেসটি নেননি। এরকম ঘটনা অনেক ঘটতো ফলে বাবার অ্যাটর্নীর কাজটা ভালো লাগতো না। আমি এম এ পড়বার সময়ে বাবার কাছে আর্টিকেলড হয়েছিলুম—একদিন কোর্টে লম্বা ফিরিস্তি পড়তে হয়েছিল। যিনি আমাকে এইসব পড়িয়ে আর্টিকেলড করছিলেন—তাঁর অফিসিয়াল ডেসিগনেশ্যনটা ভুলে গিয়েছি এখন—তিনিই আমাকে থামিয়ে বলেন, 'অবিনাশবাবু, আপনার ছেলে ওকে এত পড়াবার কি দরকার আছে?' তাই আমি

খানিকটা পার পেয়ে গেলুম। একদিন, কী কারণে জানি ভুলে গিয়েছি, আমাদের ক্লাশ হয়নি—এম এ পড়ছি তখন—ভাবলুম বাবার আপিসে যাই। আমাকে দেখেই বাবা বললেন, "তুমি এখানে কেন ?" আমি হেসে বলেছিলুম, মনে পড়ে, "আমি আপনার আর্টিকেলড ক্লার্ক না।" বাবা বললেন--"তা হলেই বা। এখন কেন এসেছ ? ক্লাশ হচ্ছে না ?" বাবারও ইচ্ছে ছিল না আমি অ্যাটর্নী হই পরীক্ষা দিয়ে।

যখন এম এ পাস করার পর আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ও রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষমশাই আমাকে বলেন, ও কলেজে কাজ নিতে, মাইনে অনেক কম সত্ত্বেও বাবা মত দিলেন। ওঁর মনে হলো অ্যাটর্নী হওয়ার থেকে পড়াশোনার জগতে থাকলে বোধহয় আমার মনের দিক থেকে ভালো হবে, আনন্দ থাকবে বেশী। ছোটবেলা থেকেই বাবার সমর্থনেই আমি আমার সাহিত্য চর্চা এবং নিজের খুশীমত পড়াশুনো চালাতে পেরেছি। বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক এতো সহজ ছিলো—কিছু ভালো লাগলে বাবার সঙ্গে সে বিষয়ে আলোচনা করতুম—বাবাও তাঁব মতামত দিতেন। আমার পছন্দমতো বই কিনবার জন্য—নতুন বা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড, টাকা বাবার কাছ থেকেই পেতুম। মাঝে মাঝে অল্প আপত্তি করতেন—"তোমার এতো বই কিনতে হয় কেন ?" কিন্তু শেষ পর্যন্ত দিয়ে দিতেন। 'উর্বশী ও আর্টেমিস' ছাপাবার খরচও বাবাই দিয়েছিলেন। অল্প বয়স থেকেই—স্কুলে পড়বার সময় থেকেই নানা সাহিত্যিক আড্ডায় যেতুম—বাবা একটু বেজার হতেন—মনে করিয়ে দিতেন রাত আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরে আসতে হবে—এ বিষয়ে বাড়ির ও বাবা মায়ের কড়া নিয়ম ছিলো। আর সাহিত্যিকরা সকলেই তো বয়সে আমার থেকে বড়ো এবং খানিকটা বোহেমিয়নও ছিলেন, সে জন্যও বাবার চিন্তা ছিলো। যে সাহিত্যিক আড্ডায় তখন যেতুম মনে পড়ে—পটুয়াটোলা লেনে দীনেশ দাস বা গোকুল নাগ—ছোট্ট ঘর—তারা একেবারেই ব্রাহ্ম। ২২ নম্বর সুকিয়া স্ট্রীটে রবিবার আড্ডা হত—প্রেমাঙ্কুর আতর্থীব সঙ্গে দেখা হয় ওখানেই। তিনিও ব্রাহ্ম, রং ফর্সা, লম্বা, কাঁধে জামাটা ফেলা থাকতো—আর সব কথায় "শালা" বলতেন—আমি প্রথমে একটু অবাক হয়েছিলুম। কিন্তু পরে বুঝতে পারি ওটা ওঁর একটা অভ্যাস বা মুদ্রাদোষ—কিছু mean করে বলতেন না। সেখানেই সত্যেন দত্তকেও দেখি—তিনিও বোধহয় দেখাদেখি আড্ডার দলে মুখ খারাপ করে কথা বলছিলেন—আমি তখন ওঁর খুব ভক্ত—কিন্তু একেবারে বাংলা ছাড়া কোনও কথা বলেননি সেটা এখনও মনে আছে, ভালো লেগেছিল। এই রকম এক আড্ডাতেই মণি গাঙ্গুলীর সঙ্গে আলাপ হয়—খুব ভালো লোক, খুব সুপুরুষ, বিশেষ করে চোখ দুটি আশ্চর্য সুন্দর ভাসা-ভাসা, খুব গম্ভীর লোক। শ্বশুব বাড়ি ৫নং দ্বারকানাথ ঠাকুর লেনে থাকতেন, অবনঠাকুরের জামাই। তাঁর সঙ্গে আমার আগে ও পরেও অনেকবার দেখা হয়—কলেজ স্কোয়ারের বাড়ির সামনে দিয়ে তিনি রোজই তাঁর এক বন্ধুর বাড়ি যেতেন আমায় বলেছিলেন। একদিন আমায় কত্থক নাচ দেখাবার নেমন্তন্ন করেন তাঁর শ্বশুরবাড়িতে—"মদের গেলাস মাথায় রেখে কত্থক নাচবে, আমার শ্বশুরমশাই এস্রাজ বাজাবেন।" বাবাকে জিজ্ঞেস করাতে বাবা বললেন, 'এখন নাই বা গেলে তুমি'। বাবার ওটা হয়তো ভালো লাগেনি—আর আমার বয়স তখন বেশ কমই

ছিলো। ফলে আমার সেই কথক নাচ দেখা হলো না।

আমার ১৫/১৬ বছর বয়স যখন—সেই রকম সময়ে—অচিন্ত্য সেনগুপ্তর সঙ্গে আলাপ হয়। নজরুল ইসলামও তখন ঐ পাড়ায় আসতেন যেতেন। একদিন অ্যালবার্ট হলের এক সভায় নজরুল জোর গলায় 'টলমল টলমল পদভবে, বীরদল চলে সমরে' গান করেছিলেন। সুভাষ বসু সেই সভাতেই বলেছিলেন, "আমাদের ছেলেরা যখন দেশ জয় করতে যাবে তখন এই রকম সঙ্গীতের সঙ্গে মার্চ করে যাবে।" নজরুল আমাদের বাড়িতেও আসতেন কিন্তু নজরুলের আসাটা যেন একটা আবির্ভাবের মতো ; আর কার সঙ্গে কী কথা বলছেন বিচার করতেন না—যেন তার সময় ছিলো না। ন' জ্যাঠাবাবুর তামাক খাওয়া অভ্যেস ছিলো। একদিন হলঘরে একা বসে তামাক খাচ্ছেন, নজরুল হঠাৎ ঢুকে পড়ে বললেন, "বেশ, একা বসে বসে গুড় গুড় করে তামাক খাওয়া হচ্ছে।"—যেন ইয়ার আর কি—ফ্যামিলিয়ারিটির চূড়ান্ত—আমরা একটু অবাক হই, কারণ ন'জ্যাঠাবাবু অনেক বড় ও গম্ভীর ছিলেন, আমরা তাঁকে সমীহ করতুম। আরেকদিন, মনে পড়ে নতুনদিদি (নরেন্দ্রকুমার বসুর স্ত্রী সুহাসিনী)—ওঁদের বাড়ি ছিল ভবানীপুরে আশু বিশ্বেস রোডে—দুপুরে ভাত খাচ্ছিলেন একলা বসে, ছেলে ধীরেন ও মেয়েদেরও খাওয়া হয়ে গেছে—হঠাৎ নজরুল বাড়িতে উপস্থিত—"বাঃ বাঃ মা বেশ ছেলেকে ফেলে একা বসে বসে খাচ্ছো"—বলেই সামনে বসে নতুনদিদির সেই পাত থেকেই খেতে লাগলেন। নতুনদিদিদের বাড়িতে, ধীরেনের খাতিরেই প্রায়ই গানের জলসা হতো। সেখানে ভীষ্মদেবও গান করতো।

নজরুলের সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয় এ পাড়ায় আসার পর। কলেজ যাবার সময় আমি খালি ট্রামে উঠব বলে কালীঘাট ট্রামডিপোর কাছে দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ দেখি নজরুল, কপালে প্রকাণ্ড সিঁদুরের টিপ, চোখ তো বরাবরই বড, আমাকে দেখে আরো যেন বড় করে তাকিয়ে বললেন, "কী দেখছেন ? ম্ ? ম্ ? আপনারও এরকম হবে, বযস হলে।" বোধ হয় কালীঘাটের মন্দিরে কিংবা কোনো সাধুর কাছে গিযেছিলেন। কল্লোলের সময় থেকে এঁরা যা সব কাণ্ড করতেন। একবার একটা বইয়ের জন্য নজরুল কিছু টাকা পেলেন—টাকাটা তো খরচ করতে হবে—কী করা যায় ? হঠাৎ ঠিক করে ফেললেন ঢাকা যাবেন। সবাই মিলে হৈহৈ করে ঢাকা চলে গেলেন—একদিন দুদিন পরেই পয়সা খরচা হয়ে গেলো—ফিরে এলেন—শ' চারেক টাকা শেষ। সঙ্গে অচিন্ত্যবাবুও ছিলেন বোধ হয়, বুদ্ধদেববাবু ছিলেন কিনা মনে নেই, দীনেশ দাস ছিলেন না। মণীশ ঘটক এঁদের দলে ছিলেন। মণীশবাবুর সঙ্গে আমার একটু আলাপ ছিল---বেশী না। কান্তিচন্দ্র ঘোষ আমাকে মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন। তখনও তাঁর বিবাহ হয়নি। বিচিত্রা কাগজের সম্পাদক। অচিন্ত্যবাবুও যেতেন বিচিত্রায়। তখনো উনি আইন পাসটাস করেননি, শুধুই লেখেন। তারপর কান্তি ঘোষ তো বিবাহ করে পাশ্চাত্য জগতে চলে গেলেন। নরেন্দ্র দেবের সঙ্গেও এরকম সময়ে বেশ অল্পবয়সেই আলাপ হয়। মস্ত বড় বড় চোখ, প্রকাণ্ড জাঁকালো গোঁফ, ঠনঠনের কালীবাড়ির কাছে পুরনো বাড়ি—ওদের তিন ভাইয়েরই তখন ওরকম গোঁফ ছিল। আমাকে শ্রীবিষ্ণু বলে ডাকতেন—মজা করে। ওঁর কাছে যেতে হতো, উনি প্রগতির জন্য ৫ টাকা করে চাঁদা দিতেন। প্রগতি কোয়ার্টার্লি কাগজ ছিলো, প্রতি সংখ্যার জন্য নরেনবাবু টাকা দিতেন। খুব সস্নেহ ব্যবহার, ভালো লোক ছিলেন খুব। অচিন্ত্যবাবুও চিনতেন। উনি তখন রোজ এদিকে আসতেন। অচিন্ত্যবাবুর প্ল্যানে অচিন্ত্যবাবু আর আমি ওঁকে একদিন

ফলো করি জগুবাবুর বাজার পর্যন্ত। স্রেফ ছেলেমানুষী দুষ্টুমী আর কি! তারপরে আমরা ওঁর বিয়ের খবর পেলুম। কান্তি ঘোষও আমাকে শ্রীবিষ্ণু বলে ডাকতেন। আমি এইসব সাহিত্যিকদের কাছে যেতুম, বাবা অল্প আপত্তি করতেন—"তুমি এঁদের সঙ্গে ঘোরো, তোমার তো সে রকম বয়স নয়"—আর বেশী কিছু বলতেন না। রাঙাদাদা—অজিতকুমার দে—প্রথমে বাবার আপিসে আর্টিকেলড হয়েছিলেন অ্যাটর্নীশিপের জন্য। পরে চলে যান প্রভুদয়াল হিম্মৎসিংকার আপিসে। আমরা দক্ষিণ কলকাতায় চলে আসার সময় বাবা তাঁর অনেক মক্কেল রাঙাদাদাকে দিয়ে দেন। তারপর গোপালবাবুও আপিস ছেড়ে দেন। ওঁর বড় ছেলে হীরালাল হারিয়ে গেলেন। জামাইবাবু তখনই এবং পরেও চাকরীসূত্রে অনেক ঘুরেছেন—ওঁর খোঁজখবর পাবার চেষ্টা করেছেন কিন্তু কোনো হদিশ পাননি। এই সময়ে এই সব কারণে বাবার অনেক ক্ষতি হয়। আমি এম-এ পাস করার পর রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ আমাকে যখন ওঁর কাছে কাজ করার সুযোগ দিলেন আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলুম। বাবা আমার চরিত্র ও মতামত জানতেন এবং রবিবাবুর কাছে কাজ করা যে কত সম্মানের ও আনন্দের কথা সেটা বুঝেছিলেন। রবিবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন—কেন জানি না খাতিরও করতেন। অনেক সময়ে অন্যদের চুপ করতে বলতেন—"শোনো না ও কি বলে"—বলে আমাকে কথা বলার সুযোগ করে দিতেন। আমিও তখন নিজের বক্তব্য খুব খুশী মনে বলে যেতুম। সব সময়ে যে এটা আমার পক্ষে ভালো হয়নি, পরে সেটা বুঝেছি। তখন মহা আনন্দেই ছিলুম। যতটুকু সাহায্য করতে পারি বলে রাত্রেও কমার্স ক্লাশ করতুম—সামান্যই টাকা পেতুম, তবুও। আর, তখন অনেক প্রাইভেট টিউশানিও করেছি অতি সামান্য টাকার জন্য। একবার, একটি বয়স্কা মহিলাকে তিন মাসের মধ্যে এম-এ পরীক্ষার জন্য তৈরী করে দিয়েছিলুম, তিনি পাসও করেছিলেন। এসবই সংসারের সাহায্যে লেগেছিলো। কিন্তু বাবার শরীর ভেঙে গেলো। আমরা দক্ষিণ কলকাতায় এসেছিলুম ১৯৩৪-এর নভেমবরে, বাবা ১৯৩৮-এর ১লা ডিসেমবর মারা যান মাস ছয়েক ভুগে। ওঁদের আপিসটা ভেঙে গিয়েছিলো বলে ওঁর মনটাও ভেঙে গিয়েছিলো। আমার মনে হয়েছিলো শেষ দিকে ওঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে যে ওঁর বাঁচবার ইচ্ছেটাই যেন ছিলো না।

আমি যা কিছু হতে পেরেছি, যা আমার মনে ইচ্ছে ছিল হবার—সবটা নিজের জীবনে সফল হয়নি নিশ্চয়—কারুর কখনই তা হয় না—তবু যতটুকু আমি করতে চেষ্টা করেছি এবং সফল হতে পেরেছি সেটা বাবা আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন বলেই। এখন তাঁর কথা বারবার মনে হয়, এবং আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করি।

## কাব্যপরিচয়

**নাম রেখেছি কোমল গান্ধার**

আশ্বিন ১৩৬০ (১৯৫৩)-এ সিগনেট প্রেস থেকে দিলীপকুমার গুপ্ত প্রকাশ করেন। কবিতার রচনাকাল পৃথকভাবে দেওয়া নাই, তবে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫৩ পর্যন্ত সময়ে লেখা ৪১টি কবিতা সংকলিত। উৎসর্গ করা হয় "জন আরউইন, মার্টিন কর্কম্যান, পার্সি ও এপ্রিল মার্শালকে (২২শে জুন, ১৯৫৩)"। প্রচ্ছদ সত্যজিৎ রায়ের আঁকা।
পরের সংস্করণগুলি মূলত মুদ্রণ।

[জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২, জুন ১৯৫৫-তে নাভানা থেকে গোপালচন্দ্র রায় যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদযুক্ত 'বিষ্ণু দে-র শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশ করেন। প্রথম সংস্করণে ১৯২৬ থেকে ১৯৫৫ পর্যন্ত কবিতা অন্তর্গত হয়েছিল। এর পরে আষাঢ় ১৩৬৯-এ দ্বিতীয়, কার্তিক ১৩৭৫-এ তৃতীয়, আশ্বিন ১৩৮৮-তে চতুর্থ এবং পৌষ ১৩৯২-এ পঞ্চম 'পরিবর্ধিত সংস্করণ' বেরোয়।]

[আশ্বিন ১৩৬৩ (সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)-তে বেরোয় অনুবাদ কবিতার বই 'হে বিদেশী ফুল'। প্রকাশক বাক্-এর পক্ষে তারাভূষণ মুখোপাধ্যায়।]

**আলেখ্য**

১৩৬৫ বৈশাখে এম· সি· সরকার অ্যাণ্ড সন্স থেকে সুপ্রিয় সরকার প্রকাশ করেন; ১৯৫২ থেকে ১৯৫৮-র মধ্যে রচিত ৪৭টি কবিতার এই বই "শ্রীযুক্ত প্রশান্তচন্দ্র ও শ্রীযুক্তা নির্মলকুমারী মহলানবীশকে" উৎসর্গীকৃত। বোর্ড বাঁধাই, দাম ছিল ২·৫০ টাকা। কবিতার পৃথক রচনাসময় অনুল্লেখিত। পরে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বিশ্ববাণী প্রকাশনীর প্রকাশনা 'বছর পঁচিশ' (পৌষ, ১৩৮০) কাব্যসংগ্রহে স্থাপিত।

**তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ**

২৫ বৈশাখ ১৩৬৫ তারিখে বাক্-এর (কলকাতা ৯) পক্ষে তারাভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেন। ১৯৫৫ থেকে ১৯৬০-এর মধ্যে রচিত ৫৫ কবিতায় গ্রন্থনা। "শ্রীমান চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান কমলকুমার মজুমদার"কে উৎসর্গীকৃত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮+৮২। দাম ২ টাকা ৭৫ প·। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন যামিনী রায়। পরে 'একুশ বাইশ' ও 'বছর পঁচিশ' সংকলনদ্বয়ের অন্তর্ভূত।

**স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত**

১৯৫৫-৬১ সময়খণ্ডের ১০২টি কবিতা নিয়ে বৈশাখ ১৩৬০-এ প্রথম প্রকাশিত। প্রকাশ করেন সম্বোধি পাবলিকেশন্‌স (কলকাতা ১) থেকে রমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। উৎসর্গ "শ্রীযুক্ত অন্নদাশংকর রায়কে/তাই পরালাম রাখী"। যামিনী রায়ের আঁকা প্রচ্ছদ। সম্বোধি থেকেই দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয়, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণ "প্রথম বি· সংস্করণ" হিসাবে প্রকাশ করেন ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলকাতা ৯। এ সংস্করণে মলাটের নামলিপি পূর্ববৎ, কিন্তু প্রচ্ছদে যামিনী রায়েরই আঁকা একটি অন্য ছবি। সম্ভবত যামিনী রায়ের আঁকা নামলিপির সম্মানেই 'ভবিষ্যৎ' কথাটি 'ভবিষ্যত' বানানে গৃহীত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৮+১৫২, দাম ৫ টাকা।

[১৯৬৫-র ১ মে, বৈশাখ ১৩৭২-এ, এম্· সি· সরকারের হয়ে সুপ্রিয় সরকার প্রকাশ করলেন 'একুশ বাইশ' কাব্যসংকলন। এতে প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন সত্যজিৎ রায়। কবির মুখবন্ধে ছিল "শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের দীর্ঘপরিচিত সাহিত্য-সৌহার্দ্যের জন্যই এই পাঁচটি কবিতার বই একত্রে পুনর্প্রকাশিত হল—প্রায় একুশ বছরের লেখা।" এবং পরের প্যারাগ্রাফে—"বন্ধুবর শ্রীমান সত্যজিৎ রায় কর্মব্যস্ততার মধ্যেও প্রচ্ছদচিত্রটি এঁকে দিয়ে নন্দিত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ আমার পক্ষে বাহুল্য মাত্র।" শেষ অনুচ্ছেদে "মুদ্রণ-বিভ্রাট"-এর জন্য কুণ্ঠা প্রকাশ। এ সংকলনে গৃহীত কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'পূর্বলেখ', 'সাত ভাই চম্পা', 'সন্দ্বীপের চর' (কিন্তু এ গ্রন্থের 'সাঁওতাল কবিতা', 'ছত্তিশগড়ী গান' 'উরাঁও গান' বর্জিত), 'অম্বিষ্ট' ও 'তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ'।]

**সেই অন্ধকার চাই**

বৈশাখ ১৩৭৩, এপ্রিল ১৯৬৬-তে ভারবি, কলকাতা ১২ থেকে গোপীমোহন সিংহরায় প্রকাশ করেন। উৎসর্গ "জন-গণক ও পরিকল্পনাবিদ্ শ্রীমান অশোক মিত্রের করকমলে"। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদ। কবিতা মোট ৫৩টি, দাম ৩·৫০টা, পৃষ্ঠা ৮+৬৪। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৮৩, সেপ্টেম্বর ১৯৭৬-এ প্রকাশিত হয় বিশ্ববাণী প্রকাশনী থেকে। এতে প্রচ্ছদশিল্পী গৌতম রায়, মুদ্রিত যদিও হয়েছে পূর্ণেন্দু পত্রীর নাম।

[নভেম্বর বিপ্লবের "পঞ্চাশৎ বার্ষিক উৎসবে" মনীষা, কলকাতা ৭৩ পুরানো পঞ্চাশটি কবিতা নিয়ে প্রকাশ করেন 'রুশতী পঞ্চাশতী' কাব্যসংগ্রহ। প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬৭-তে।]

## পরিশিষ্ট

**ছড়ানো এই জীবন**

মূলত কবির মুখে বলে-যাওয়া আত্মজীবনীমূলক রচনা, 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র রবিবাসরীয় পৃষ্ঠায় ২২ ও ২৯ জুলাই, ৫, ১২, ১৯, ২৬ আগস্ট এবং ২ ও ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মোট আটটি কিস্তিতে প্রকাশিত হয়। শৈশব, বংশ ও পরিবার এবং ছাত্রজীবনের স্মৃতিতেই এই কথন সমাপ্ত হয়। কবির কণ্ঠস্বরের ক্যাসেট থেকে অনুলিখন করেন প্রণতি দে ও রুচিরা চক্রবর্তী। বর্তমান সংস্করণে ক্যাসেটের সঙ্গে আর-একবার মিলিয়ে নেওয়া হয়েছে।

## প্রথম খণ্ডের দু একটি ভ্রম সংশোধন ও তথ্য

১· ২৬৩ পৃষ্ঠায় উপরে স্থূলাক্ষরে মুদ্রিত "দেখেছি মেলায় এক" ভ্রমক্রমে কবিতার শিরোনাম হিসেবে বসানো হয়েছে। ওটি আসলে '১৪ই অগস্টে' কবিতারই পঙ্‌ক্তি।

২· 'সাহিত্যপত্র'-এ (মাঘ ১৩৫৬) 'অম্বিষ্ট' কবিতার (কবিতাসমগ্র ১, ২৪৩-৬১) প্রথম দুই অংশ প্রকাশের সময় প্রথমে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-এর 'The Prelude' কবিতা থেকে, এবং তারপর মার্কস-এঙ্গেল্‌স-এর সংকলিত রচনাবলী থেকে দুটি উদ্ধৃতি ছিল—

"An auxiliar light
Came from my mind, which on the setting sun
Bestowed much splendour.....
Extrinsic differences,the outward marks
Whereby society has parted man
From men, neglect the universal heart."

"Hence man also creates beauty according to
the laws of beauty."

পরে গ্রন্থে বর্জিত হলেও এই উদ্ধৃতিদুটি কবিতার আরম্ভটিকে বুঝতে সাহায্য করে। এই দুটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমরা অধ্যাপক সুজিৎ ঘোষের কাছে কৃতজ্ঞ।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, পবিত্র সরকার

# কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তির বর্ণানুক্রমিক সূচি

(প্রথম পঙ্‌ক্তি, কবিতার নাম, পৃষ্ঠা)